গল্প গল্প

নবকুমার বসু

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশকাল ঃ
সেপ্টেম্বর—১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১/এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ গৌতম রায়

দাম ঃ পনেরো টাকা

শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরীকে—

হাসপাতালের সেই রাত্রিগুলির স্মরণে,

—নবকুমার বসু।

নিবেদন

এই প্রথম দুই মলাটের মধ্যে আমার কয়েকটি ছোট গল্প একত্রিত করা গেল। ইদানীং বিভিন্ন ধরনের প্যাঁচ আর কায়দার যাঁতাকলে প'ড়ে গল্প পড়ার আনন্দ মাঝে-মধ্যেই উবে যায়। পাঠক হতাশ হ'ন। তার মধ্যেই লেখালিখি চলছে, চলবে। আমার সাহিত্যচর্চা অনেক-খানি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো। না লিখে পারি না, তাই লিখি। লিখে থাকি। যেমন মনে হয়, যেমন পারি। আমার এসবেরই উদ্দেশ্য আনন্দ পাওয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপন। আর একটি কথা; খুব কম হ'লেও এমন প্রকাশক যে দু একজন আছেন যাঁরা আমাদের মতো অকিঞ্চিতকর লেখকদের বই-ও ছাপেন—"গল্প গল্প" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে তা-ও প্রমাণিত হল। এটিও সুখের খবর।

নবকুমার বসু

গল্প গল্প

বিষয় | | পৃষ্ঠা

অসময়ের কলিংবেল শুনে নিশ্চয়ই ভাবছ, এখন আবার কে এলো। এটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই অসময়। কারণ নিখিল অফিসে চলে গেছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে—নটা নাগাদ। গোগো এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। ও আসার আগেই তুমি রান্নাবান্নার কাজ সেরে নিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই এখনও কিচেনে ব্যস্ত। গোগো এসে পড়লেই তুমি আর সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পার না, তখন ওকে নিয়ে তোমার লাগতে হয়।

আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি কিচেন থেকেই 'কে—' বলে রেসপন্স করেছ।

কিন্তু, বুলু, আমি তো রাস্তা থেকেই—'বুলু, আমি মারফি কিংবা রুথ্' বলে চেঁচিয়ে তোমাকে আমার পরিচয় জানাতে পারি না। তাছাড়া, দুপুরবেলা রাস্তা থেকে চিৎকার করে একজন মহিলার পক্ষে নিজের পরিচয় জানানটা শোভনও নয় বোধ হয়। তার ওপর আবার তোমাদের এই যাদবপুর সেণ্ট্রাল পার্কের মত জায়গায়। এই সময় এখানকার যেকোন বাড়িতে কেউ নক্ করলে, উলটো দিকের বাড়ির বারান্দা থেকে কেউ না কেউ একবার দেখে নেয়। সেটা আমার একদম ভাল লাগে না।

তুমি অবশ্য আমাকে দেখে অখুশী হবে না। কিন্তু একটু অবাক হবে। কেননা, প্রথমত এই সময়, দ্বিতীয়ত—আমি একা। আমি এতদিন তোমাদের বাড়িতে যখনই এসেছি—সন্ধ্যাবেলা এবং প্রশান্তর সঙ্গে।

একদিন বোধ হয় সানডে মর্নিং-এ এসেছিলাম। কিন্তু প্রশান্ত ছাড়া আজই আমি প্রথম এলাম। ভাব একবার, ওয়াইফ হিসাবে

আমি কিরকম ইণ্ডিয়ানাইজড্ হয়েছি। হাজব্যাণ্ড ছাড়া তোমাদের এখানে আসতেও ভাল লাগছিল না।

কিন্তু কি করব, বল। প্রশান্ত ত সেই বীরভূমের মেলায় গান গাইতে গিয়ে এখনও ফিরল না। অথচ ও ছাড়া ওর পিসীমার বাড়িতে আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। শুধু নিজের ঘরটায় বন্দী হয়ে ত আর সারা দিনটা কাটান যায় না। তারপরও স্কুলেও এখন পরীক্ষা চলছে বলে আমার পাঁচদিন ছুটি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো? তুমি দরজা খুলতে আসছ না কেন এখনও। বোধ হয় মাঝপথে কোন রান্না থামিয়ে আসতে পারছ না। ওই ত, নীচের বারান্দার দরজাটা খুলে তুমি আর একবার বললে, কে—। আমি এখন তোমার আসার পায়ের আর শাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি কি ভেতর থেকে ছোট্ট ভিউফাইণ্ডারে চোখ লাগিয়ে দেখে নিলে আমাকে?

ভেতর থেকেই কাঁচটায় চোখ লাগিয়ে বুলু দেখতে পেল রুথ্‌কে। ওর সেই ঢোলা জিনের বেলবটম আর ওপরে ঢোলা পাঞ্জাবির মত হাফহাতা টেরিকটনের শার্ট। কাঁধে ঝোলান লম্বা, শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। ওর টকটকে ফর্সা রং যেন একটু অ্যানিমিক্ একটু কটা আর রুক্ষ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা লাল্‌চে চুলগুলো সবসময়ই অবিন্যস্ত। বুলুর ধারণা, রুথ্‌এর মুখে মেমসায়েব-সুলভ গ্ল্যামারও নেই আবার বাঙালীদের মত লাবণ্যও নেই। বরং একটা রুক্ষতা বয়সের ছাপের সঙ্গে মিশে থাকে। চোখেও যেন একটা উদাসী আর দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে সব সময়।

কিন্তু স্ট্রাকচারটা সত্যিই সুন্দর। অমন ক্ষীণ কটি আর দীর্ঘাঙ্গী আমাদের এখানকার মেয়েরা হয় না। মনটাও খারাপ না, এবং রুথ্ বুদ্ধিমতী। বাংলা কথাবার্তা কিছু কিছু বুঝতে এবং বলতে পারলেও, যেখানেই ও অসুবিধা বোধ করে—একদম চুপ করে যায়। আর ওর চুপ করে যাওয়াটা দেখেই অন্যেরা বোঝে—রুথ্‌এর অসুবিধা

হচ্ছে। তখন ওকে আবার সেই জায়গাটা ইংরেজী করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রুথ্ পরিস্থিতির সঙ্গে খুব সুন্দর মানিয়ে নিতে পারে।

এই অসময়ে রুথ্‌কে একা দেখে বুলু একটু অবাকই হল। ও ভেবেছিল হয়ত পিওন এসেছে কোন রেজিস্টার্ড চিঠি নিয়ে কিংবা মা হয়ত পাঠিয়েছে কাউকে কোন খবরটবর দিয়ে।

গোগো স্কুল থেকে ফিরলে বুলু আগেই বুঝতে পারে—ওর কলিংবেল বাজান, দরজা ধাক্কা দেওয়া এবং চিৎকার করা সব একসঙ্গে শুনে।

কিন্তু রুথ এর আসাটা ও আন্দাজ করতে পারেনি। খারাপও লাগল না। কেননা, একা একা রুথ্ এর সঙ্গে ও একটু ইংরেজী বলতে পারে নিঃসংকোচে। ভাল বলতে পারে না বলে, অন্য সকলের সামনে বুলু একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া নিখিল অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত বুলুকে ত প্রায় চুপচাপই থাকতে হয়। বেরুতে ত আর পারে না। কাজ করতে করতে কথা বলার, গল্প করার একটা লোক পেলে খারাপ লাগে না। রুথ্‌ত এ বাড়িতে ভীষণ ফ্রী আর এটা-ওটা নিয়ে খুব গল্পও করতে পারে।

—কি গো, কি ব্যাপার। হঠাৎ একদম দুপুর বেলা একলা চলে এলে যে! এসো, ভেতরে এসো। বুলু দরজাটা খুলে বিস্ময়ের সঙ্গে একরাশ আন্তরিকতার হাসি ছড়িয়ে দিল।

রুথ মাথাটা নীচু করে দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল—সরি বুলু, আনটাইমলি এসে, মনে হচ্ছে তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম।

বুলু ভেতর দিকে যেতে যেতে, ওর হলুদ লাগা হাতটা কাপড়ে মুছে নিল। রুথ্ এর একটা হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে বলল—রুথ্, এটা কি ঠিক হচ্ছে? তুমি আবার সেই বিলিতি ফর্মালিটি করছ। আমার এখানে তোমার আবার টাইম্লি, আনটাইমলির কি আছে?

রুথ্ চোখ থেকে ঢাউস কালো চশমাটা খুলে ফেলল। ওটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল—অ্যাকচুয়ালি আমি বাড়িতে

বসে বসে বড্ড বোর ফিল করছিলাম। প্রশান্ত ত জানই ওর সেই সব টিম নিয়ে বীরভূম গেছে। বাড়িতে পিসীমা-পিসেমশায়ের সঙ্গে আমি আর কি গল্প করব। তারপরেই গলার স্বর পালটে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, নিখিল এর মধ্যে আর যায়নি কেন বলত ?

—ওর কথা আর বোলো না। কোথায় যায়, না যায় আমি কি আর সব জানি।

—তুমিও ত যেতে পার মাঝে মাঝে গোগোকে নিয়ে।

—আমি সংসার করছি।

বুলু রান্নাঘরের মধ্যেই একটা ছোট টুল দিল রুথ্‌কে বসতে। ওর রান্নাঘরটা বেশ প্রশস্ত আর খুব পরিচ্ছন্ন। সাংসারিক ব্যাপারে বুলু ভীষণ গোছান গৃহিণী আর রান্নাঘরটাই যেন তার প্রমাণ। সব সময়ই রান্নাঘরটা দেখে মনে হবে যেন আগে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এতটুকু বাড়তি জল কিংবা কুটনোর খোসা কিচ্ছু পড়ে নেই। ছাদে দেয়ালের কোণায় একটুও ঝুল লেগে নেই। দেয়ালের সঙ্গে লাগান আলমারিটার মধ্যে ডাল, মশলাপাতির কৌটোগুলো সুন্দরভাবে পাশাপাশি সাজান। ওগুলোর কোন্‌টার মধ্যে সরষে, কালো জিরে, কিংবা মটর ডাল আছে—সব বুলুর নখ দর্পণে। রান্নার জন্য একটা উঁচু বেদীমত করা আছে—একপাশে গ্যাস সিলিণ্ডার, কয়লা ব্যবহার করা বুলু ছেড়েই দিয়েছে। রান্নাঘরের জানালাগুলোতেও খুব মিহি জাল লাগিয়ে নিয়েছে—যাতে পোকামাকড়, মাছি ঢুকতে না পারে। কিন্তু আলো বাতাসটা আসে।

রুথ্‌-এর জন্য বুলু একটু কফির জল চাপিয়ে দিল। রান্নাবান্নার জিনিসপত্র এদিক ওদিক খুটখাট করতে করতে বলল—

—আমার কথা আর বোলো না। সংসারের সবদিক দেখতে গিয়েই আমার সময় চলে যায়। তার ওপর কাল থেকে আবার গোগোর পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। নিখিলও কয়েকদিন থেকে কি-সব অফিসের কাজে একটু বেশী ব্যস্ত। আমার আর নিঃশ্বেস ফেলার সময় নেই।

কথা বলতে বলতে বুলু কাজও করে যাচ্ছিল। ও ধনেপাতা দিয়ে

রান্না করা পাবদা মাছের ঝোলটা কাঁচের ট্রেতে তুলতে তুলতে বলল—তার চেয়ে তুমিই তো আমাদের এখানে চলে আসতে পার যে কটা দিন প্রশান্তদা না ফিরছে।

রুথ্ ওর কাজকর্ম আর রান্নাঘর খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল—তাহলে তো দারুণ হয়। গ্র্যাণ্ড! গলার স্বরটা একটু পালটে আবার বলল—তোমাদের এখানে এলে আমার আর যেতেই ইচ্ছা করে না।

বুলু কফির জলটা নামিয়ে ফেলল। রুথ্‌কে জিজ্ঞেস করল—এখন কি খাবে বল, কফির সঙ্গে। দুপুরে কিন্তু আর ফিরতে পারবে না। আমি আজ সারা দুপুর তোমার সঙ্গে ইংরেজী বলা অভ্যাস করবো।

বুলু, তোমার মনটা সত্যি ভীষণ সরল। আমাকে বড্ড বেশী আপন করে নিয়েছ। মনে হচ্ছে না নিলেই ভাল হত।

জিজ্ঞেস করছ কি খাব? কিন্তু কি করে বলব বল তো সত্যি কথাটা! কি করে তোমাকে বলব যে আমার ভয়ানক ক্ষিদে। ভীষণ খেতে ইচ্ছে করে যখন তখন। আমি তো আর তোমাকে সোজা-সুজি বলতে পারি না যে আমি খাওয়ার জন্যই এই অসময়ে তোমার এখানে এসেছি। প্রশান্ত থাকলে হয়তো একটু সুবিধে হত কিন্তু ইদানীং ওর কথা আমি ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। আমার এত ক্ষিদের কথা ওকেও আমি বলতে পারতাম না। আর সেখানে ওর পিসীমার কাছে বারবার খাওয়ার কথা বলা তো অসম্ভব। আর লুকিয়ে যে কিছু খাব, সে সাহস আমার নেই।

কিন্তু তুমি তো দেখছি শুধুমাত্র কয়েকটা সল্টেড বিস্কুট আর ঘরের তৈরী একটা সন্দেশ দিচ্ছ। সন্দেশটা নিখিলের খুব প্রিয় খাবার, তাই না? সত্যি, তোমরা পার বটে। কিন্তু বুলু, তোমাকে তো বলতে পারছি না—ওই খাবার আমার কাছে কিছুই না। খুবই সামান্য। ঐ তো তোমার আলমারির ভেতরে কয়েকটা ডিম বার করে রেখেছ

ফ্রিজ থেকে। বুঝতে পারলে না বোধ হয় তোমাকে ডিমের দাম জিজ্ঞেস করে একটা হিণ্ট দিলাম তুমি তো একটা ডিমও দিতে পারতে আমাকে ফ্রাই করে।

অবশ্য বুঝবেই বা কি করে? দিয়েছ, এই অসময়ে তাই যথেষ্ট। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে তোমরা কখনও কিছু খেতে চাও না।

কফিটা দাও বুলু, আর কতক্ষণ ওটা চিনি দিয়ে স্টার করবে? যা হয়েছে, দাও। ওটার অনেক ফুড ভ্যালু আছে। কারণ, অনেকটা দুধ ওতে দিয়েছ আমি দেখেছি। থ্যাঙ্ক য়্যু।

বুলু, এইমাত্র তুমি যখন নীচু হয়ে জাগে করে জল নিলে, আমি তোমাকে পিছন থেকে আর একবার ভাল করে দেখলাম। তুমি কি বুঝতে পারো, আজকাল আমি তোমাকে কিরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি! তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, তোমার বুক, পেট এখন কিরকম ফ্ল্যবি; কোমর আর হিপটা একদম সমান। কোন কার্ভেচার নেই। তবে, মুখটা তোমার সত্যিই সুইট। বোধ হয় আরও সুইট লাগে তোমার কপালের ওই বড় লাল টিপটার জন্য। খুব পান খাওয়া ধরেছ আজকাল। সন্ধ্যার সময় তো দেখি বেশ সেজেগুজে থাক। নিখিলের ভাল লাগে? কতদিন এরকম একটানা ভাল লাগতে পারে?

নিখিল তো দিব্যি স্লিম আর স্মার্ট। তাও কি তোমাকে ওর খুব ভাল লাগে? তোমাদের রাত্তিরে বিছানার সম্পর্কটা কি এখনও হট? তোমার মধ্যে নিখিল কি পায় বল তো? বাইরে থেকে দেখে অবশ্য তোমাদের রিলেশানটা অ্যাপারেণ্টলি ভালই মনে হয়। না হওয়ারও কারণ নেই। নিখিল তো ভালই আর্ন করে। অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার। মাত্র একটি বাচ্চা।

প্রশান্ত যদি আর একটু প্র্যাকটিক্যাল হত ভাল হত। তাহলে হয়ত আমাদের ভেতরের সত্যিকারের সম্পর্কটা এরকম জলে ভেসে থাকার মত হত না। অবশ্য আমি বুঝতে পারি, ওর টেম্পারামেণ্টটাই ওই-রকম। সম্ভবত ইংলণ্ডে একটা ফাংসনে দেখে, ওকে আমার সেই কারণেই তখন ভাল লেগেছিল। শুধু তাই বা কেন, ব্যক্তিগত ব্যাপার

সব জেনেও, আমিই ওকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়েছিলাম। আমরা বড্ড হুইমজিক্যাল।

বুলু আলমারিটা বন্ধ করে দিল। রুথ্‌কে হাত ধরে টেনে তুলল।

—এই চলো, ঘরে গিয়ে বসি। রান্নাঘরের কাজ শেষ। আচ্ছা, তুমি কি স্নান করে এসেছ? তোমার গরম জল লাগবে?

রুথ্‌ বলল, না, আমি স্নান করব না। বেটার তুমি সেরে নাও। আমি একটু ম্যাগাজিন ওলটাই আর তোমাদের অ্যালবাম দেখি।

একটু চুপ করে থেকেই ও আবার বলল, এই, তোমাদের টেলি-ফোনটা ঠিক আছে?

—দেখ, ও কখন ঠিক থাকে, কখন খারাপ হয় কেউ জানে না।

গোগোর স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। স্নানটা করে নিতে পারলে ভালই হয়। একটা কাজ সারা হয়ে যাবে।

বুলু আলমারি থেকে শাড়ি ব্লাউজ বার করে নিল। একটা অ্যালবাম রুথ্‌কে দিয়ে বলল—এটা দেখ। আমাদের বিয়ের সব ছবি আছে এটাতে।

বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে ও আবার ফিরে এলো কি মনে করে। রুথ্‌ ওদের বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল। বুলু আবার এ.স বলল—এই, তোমার যে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, গিয়েছিলে? কি বলল?

রুথ ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলল। উঠে বসে বলল—ও ইয়েস, তোমাকে বলাই হয়নি। বিশেষ কিছু না, তবে বেশ অ্যানিমিক। কয়েকটা রুটিন ইনভেসটিগেশন করতে বলেছেন আর দু একটা আয়রন, ভিটামিনস এইসব মেডিসিন দিয়েছেন।

একটু থেমে আবার বলল—আসলে আমিই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, এত মাথা ধরছিল কয়েকদিন থেকে। তুমি যাও, তাড়া-তাড়ি স্নান করে এসো।

হ্যাঁ যাই। —বুলু বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

দেখ রুথ্‌, তুমি যতই মেমসায়েব হও, আমাদের বাঙালী মেয়েদের

চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এই যে তোমার মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, আয়রন, ভিটামিনস্, রুটিন ইনভেস্টিগেশন করা…সবই কি তোমার একটা বিশেষ অসুস্থতার দিক নির্দেশ করছে না। ওটা কি আদৌ অসুস্থতা।

তোমার অবশ্য বলার উপায় নেই জানি। কেননা, ছোটবেলায় মাম্‌স হওয়ার জন্য উৎপাদন ক্ষমতা নেই আমার জানি। ডাক্তার টেস্ট করে বলেছিলেন, স্পার্ম হেলদি নয়। আরও জানি, ঐ কারণেই প্রশান্তদার আগের পক্ষের বউ—মতি, ওকে ছেড়ে এখন বিকাশ দত্তকে বিয়ে করে ডানলপে থাকে। তুমি অবশ্য এসব জেনেশুনেই প্রশান্তদাকে বিয়ে করেছিলে। কারণ তুমি কোন সময়েই ছেলেপুলে চাও না। অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিসার্চ নিয়েই তোমার কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। তাছাড়া সে বয়সও তোমার নেই যে নতুন এনার্জি নিয়ে আবার ছেলেপুলে মানুষ করবে। আমরা ভেতরের খবরগুলো জানতাম বলেই ভেবেছিলাম—যাক ভালই হল। প্রশান্তদার পাগলাটে, বাউণ্ডুলে জীবনে একটা বৈচিত্র্য এলো।

কিন্তু নাটের গুরুটি কে বল তো? তুমি তো আজকাল অনেকের সঙ্গেই মেশো। প্রশান্তদাও সে ব্যাপারে মোটে বদার করে না। আর উনি তো প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমিও এখন আর কম যাও না। তোমার তো স্কুলেরই সেক্রেটারি এবং অন্যান্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম। ওর কাছ থেকে আরও জানলাম, তুমি বেশ কয়েকবারই আশিষ দে, দীনেশ ছেত্রি, দিলীপ চক্রবর্তী, ত্রিপাঠি, তরুণ ঘোষ এদের সঙ্গেও যথেষ্ট ঘুরেছ।

প্রশান্তদা অবশ্য তাতে কিছু মনে করে না। বরং তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পরে এবং স্বল্প রোজগারের জন্য প্রশান্তদার যেটুকু অনিবার্য কমপ্লেকস গ্রো করেছে, তাতে তুমি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্তিতে থাকায়, সেটাই খানিকটা কেটে যায়। আমার তো ধারণা, প্রশান্তদা নিজের অক্ষমতার জন্য, জীবনের একটা অন্যরকম মানে আর ছক তৈরী করে নিয়েছে। কিছুতেই বিশেষ কিছু যায় আসে না।

…এতবার করে কাকে টেলিফোন করছ, রুথ্! ভাবছ, আমি শাওয়ারের জল পড়ার আওয়াজে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তাই না? লাইন পেয়েছ বুঝি? তুমি কি সেই নাটের গুরুটির সঙ্গে কথা বলছ নাকি?

কথা অবশ্য বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি বাথরুম থেকে সব কিছু শুনতে পাই। ওই তো শুনতে পাচ্ছি, গোগো এসে পড়েছে। নীচে থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কারেন্ট চলে গেছে বলে বেল বাজাতে পারছে না। তুমি রিসিভারটা রেখে দিয়ে দরজা খুলতে গেলে।

রুথ্, তুমি কিন্তু বড্ড বোকা। ভাবছ আমার স্নান সারতে অনেক দেরী হবে। মোটেই না। আমি খুব তাড়াতাড়ি করেছি, কারণ গোগো আসবে, আমি জানি।

রিসিভারটা পাশে নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেছ। গোগো তো তোমাকে দেখেই গলা জড়িয়ে ধরবে। সুতরাং তোমার ওপরে আসতে একটু দেরী হবে। আমি একবার রিসিভারে তোমার মত গলা করে ছোট্ট করে 'হ্যালো' বলে দেখি না, চেষ্টা করে নাটের গুরুটি কে?

আমাদের বাঙালী মেয়েদের কিরকম কুচুটে আর কৌতূহলী মন দেখছ?

রুথ্ সিঁড়ি দিয়ে চটি ফটফট করতে করতে নীচে নামছে। বুলু ভেজা চুলের গোছার ওপর তোয়ালেটা জড়িয়ে নিল। পাশে রাখা রিসিভারটা কানে লাগাল। মনে মনে ঠিক করে নিয়ে ঠিক রুথের মত গলা করে বলল—হ্যাল-ও-ও…!

—রুথ্ ডিয়ার। প্লিজ ফর গড সেক, ডোণ্ট বি সো মাচ ইমোশনাল। ইটস্ নাথিং, আই টেল য়্যু—জাস্ট অ্যা ম্যাটার অব ফিউ মিনিটস্ ওনলি টু ইভাকুয়েট ইট। তুমি চুপচাপ বাড়িতে থাক। ডোণ্ট কাম্ টু মাই প্লেস। আই উইল সি য়্যু ইন দ্য ইভনিং…

উত্তেজনা আর ভয়ে মেশান কতকগুলো তোতলান শব্দ। বুলুর ভীষণ চেনা। যেন চিরকালের হাড়েমজ্জার ভেতরে চেনা। বিয়ের পর থেকে বিগত এগারো বছর ধরে ঐ গলার স্বর ওর শরীরের মনের প্রতিটি কণায় ছড়িয়ে আছে। কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

বুলুর পা দুটো ভীষণ কাঁপছিল থর থর করে। ঝাপসা চোখের সামনে কিছু দেখতে পেল না। শিথিল হাত থেকে রিসিভারটা ঠক্ করে পড়ে গেল ক্যাডেলের পাশে। পায়ের কাঁপুনিতে মনে হল, নীচে মেঝে নেই।

সিঁড়িতে গোগোর বুটজুতোর ধুপধাপ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিসব কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে আসছে। বুলু শরীরটাকে অনেক কষ্ট করে বাথরুমের দিকে টেনে ঘোরাল।

প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরি মানেই ক্রিকেটের উইকেট। এই আছে ত এই নেই। সব ফাঁকা, ফিরে যাও। ঝামেলা হুজ্জুতি আন্দোলন দালালী সব সাময়িক। পাঁচমাস বন্ধ থাকলে মালিকের ঘণ্টা! রস মরবে একটু একটু করে। তখন বাপু সুড়সুড় করে আবার যেতে হবে। শ্রমমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় আপোস সূত্র ঠিক বেরুবে, চোখ কান খুলে রেখেই সম্মানজনক মীমাংসা চুক্তি সাক্ষরিত হবে। মন্ত্রীমশাইয়ের কিছুই করার উপায় নেই। কেন্দ্র স্বয়ং ভরসা। মালিকের গায়ে হাত ছোঁয়ায় কার সাধ্যি! গেটের মুখে এখন তাই রোজ দেখি রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের পোস্টার।

তা নয় হল। হবে। সেসব পরের কথা। একটা চিঠি কি এ সময় আসতে পারে না! না হয় আগে আগে বার দুই কিছু অবহেলা করেছি, তাবলে আজন্ম কাল ত আর করতে পারি না। বাবা কি বিরূপ হলেন!

কথাটা ভাবামাত্র সদ্য খাওয়া ডালভাত তরকারি মাছের ঝোল পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল।

অভয়দার ওষুধের দোকানে রোজই দাঁড়াই। বাস স্টপের ভিড়, রাস্তার ধুলো, লটারি গাড়ি থেকে মাইকের গাঁক গাঁক চিৎকার আর তারই মধ্যে কখন সখনও মুক্ত ষণ্ডের আস্ফালন থেকে যতটুকু নিরাপদে দাঁড়ান যায় অফিসে আমার বারোটায় গেলেও চলে। এগারোটার মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। আগে এ সময় বাস একটু হালকা হত। স্টীলের রড আর পা-দানী চোখে দেখা যেত। ইদানীং কোন সময়েই আর সেসব দেখি না। বাস দেখলেই কাঁঠালের কোয়ার ওপর

মাছি বসার চেহারা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। ফলে, কোম্পানীর দেওয়া ট্রাভেলিং এ্যালউন্স-টা পুরোপুরি ঐ খাতেই বেরিয়ে যায়। মিনিবাসে যাওয়ার খরচ পাই। বড় বাসে যাতায়াত করে হাতে কিছু থাকত। ছেলের ইংরেজী স্কুলের মাইনেটা অন্ততঃ উঠে আসত। কিন্তু আজকাল পুরো ধ্বস খাচ্ছি। একটুখানি সুখের কথা, সাড়ে এগারোটায় মিনিতে বসে যেতে পারি। ভাত খাওয়ার পরের সিগারেটটা যেতে যেতেই খাই। "নো স্মোকিং" ছাপ মারাটার দিকে একদম তাকাই না। ওটাকে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে তুলে দিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়।

পেটের মধ্যে গোলাচ্ছে। অভয়দার দোকানের শো-কেসের এক কোণে ব্রীফ কেসটা তুলে রাখি। কোলাপসিবল গেটের কোণ থেকে টুলটা টেনে এনে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে বসে পড়ি। একটা এনজাইম বড়ি খেলে হয়।

পিওন এসে ঘুরে গেছে কিনা কে জানে। অভয়দাকে জিজ্ঞেস করাটাও যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। অথচ যেহেতু আমার বাড়ির সামনের দিকটাই অভয়দার 'রেবতী মেডিকেল স্টোর,' মহামান্য পিওনবাবু আর কষ্ট করে আমার গেট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না। ভেতরে তিনখানা ফ্ল্যাটবাড়ি, তিনখানা ফ্যামিলির যাবতীয় চিঠি-চাপাটিও অভয়দার দোকানেই জমা ক'রে দিয়ে যান। কেন? আমার চিঠি আমার হাতেই পড়বে না কেন? কখনও সখনও দীপার কাছে যখন ওর দাদার এক আধটা মনি অর্ডার আসে, তখন ত বাবা একেবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে, সইটি করিয়ে নিয়ে, দুটাকার নোটটি বেমালুম পকেটস্থ করে ফেল। নিজের পকেট থেকে পেন বের করে দিয়ে—

আরে আসেন আসেন বৌদি হাতের হলুদ মুছতে লাগবে না। এ্যা-এ্যাইখানে একটা সই করে দ্যান আর আপনার টাকাটা শুধু গুনে নেন।

তখন ত ঠিক সময় হয়। শুধু চিঠি দেওয়ার সময়েই বাবুদের যত তাড়া। মূর্খ, কি বুঝবে একটা চিঠির মূল্য আমার···। ভগবান জানে অভয়দাও আবার ত একটা পোস্টকার্ড গাপ করে না দিলেও দিতে ভুলে

যায় কি না। অবশ্য' সেই চিঠি দেখলে অভয়দার বাপের সাধ্য হবে না চেপে যেতে। প্রাণের দায়ে হাতে তুলে দেবে তাড়াতাড়ি। নামে অভয় হলেও আসলে একটি ভীতুর ডিম। বাস্তুঘুঘু যে। দু নম্বরী মাল, ফিজিসিয়ান স্যাম্পেল বিক্রি করে। জল মেশান পেথিডিন অ্যামপুলস্ কেনে ওয়ান-থার্ড দামে। দুবেলা গণেশ আর মা কালীকে ভজায়।

একটা বাস ছেড়ে দিয়েছি। সীট খালি ছিল দু একটা, তাও একটু বসেই থাকি। পেটের গোলানিও কমবে, আর যদি পিওন এসে পড়ে এর মধ্যে···। দোকানটা একটু ফাঁকা হয়েছে। জিগ্যেস করেই ফেললাম—চিঠিপত্তর কিছু এসেছে নাকি, অভয়দা?

—আপনি কি সেইজন্যেই বসে আছেন নাকি?

অভয়দা উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন।

—না তা নয়। তাড়াহুড়ো করে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি ত। পেটটা কেমন গুলিয়ে উঠল।

—চিঠির জন্য পেট গুলিয়ে উঠল?

—কি মুশকিল, বললুম না তাড়াতাড়ি···

অভয়দা কি কিছু সন্দেহ করে নাকি? নয়ত চিঠির জন্য পেট গোলানর কথাটা···বলা যায় না, ব্যবসাদাররা—শালা সাইকোলজি বোঝে। প্রসঙ্গ পালটে নিই।

—একটা এনজাইম ট্যাবলেট দিন ত। ভাল হজম হ' '।

—আপনিও দেখছি বাতিকগ্রস্ত হ'য়ে উঠছেন।

একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে হাতে দিতে দিতে টিপ্পনী কাটেন অভয়দা। পরের মিনিটা এসে পড়েছিল। অভয়দা'র হাত থেকে ছোঁ মেরে বড়িটা নিয়ে ব্রীফকেস হাতে তুলে নিই। মনে মনে বলি—তাতে তোমার বাপের কি শালা? মুখে বলি—ওবেলা এসে পয়সা দেব।

রাগ হয় দীপার ওপরেই। পুরুষমানুষ একটু নাস্তিকটাস্তিক না হলে চলবে কেন। লোকে আনস্মার্ট ক্যাল্'স্ বলবে না! ব্যাটাছেলে মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তুমিও তাই বলে, আমি যা বলব তাতেই সায় দেবে? তোমার নিজস্বতা অ্যাপ্লাই করতে

পার না? ঘর সংসার কর, গেরস্থের বউ। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বাস কর। চোদ্দগণ্ডা বিপদ আপদ বারোমাস লেগে আছে। কি ক্ষতিটা হত তুচারখানা পোস্টকার্ড ছাড়লে। কেই বা খুঁটিয়ে দেখতে যাচ্ছে ভেতরে কি আছে?

আমি পুরুষমানুষ। পঞ্চাশটা ঝঞ্ঝাট মাথায়, সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরি। আমি ত বলবই—না না ওসব বাজে কুসংস্কারকে পাত্তা দিতে হবে না। তাবলে তুমিও মেনে নেবে?

কোম্পানীতে এখন ঝামেলা চলছে। নতুন সরকার আসার পরেই শ্রমিকদের পুরোন আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রমিকরা বলছে যে পাঁচজনকে বরখাস্ত করা হ'য়েছে তাদের আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। কোম্পানীর কাছে সেটা একটা পরাজয় এবং প্রেস্টিজ ইস্যু-ও বটে। উভয় পক্ষেই নাছোড়বান্দা। সামনের সোমবার থেকে শ্রমিকরা 'গো-স্লো' পদ্ধতিতে কাজ করবে। কোম্পানী বলছে, অসুবিধে বুঝলেই আমরা ব্যথাতুর প্রয়োজনীয়তায় ফ্যাকটারি বন্ধ করে দেব। শ্রমদফতর শ্রমিকদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু মালিকপক্ষ রাজ্যসরকারের শ্রমবিভাগে চায়ের কাপ ফেলে রেখে উঠে চলে এসেছেন। তারা কেন্দ্রের পোষ্যপুত্র। নানা খেলা শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। কোম্পানী বন্ধ হলেই আমরা গেছি। আমরা ত কোন পক্ষেই নেই। মালিকের দালালী কেউ কেউ করে। হয়ত প্রাণের দায়ে করে, কিন্তু আমি পারব না। ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করি। আবার শ্রমিকদের মতো লড়তেও পারব না। অবস্থান ধর্মঘট করলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, অনশন করলে গ্যাসট্রিক। যাহোক তাহোক কোম্পানী বন্ধ না হলেই বাঁচি।

কিন্তু অবস্থা ক্রমশই ঘোরাল হ'য়ে উঠেছে। প্রথম চিঠিটা বোধহয় মাস ছয়েক আগে এসেছিল। কারুর নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল না। কে পাঠিয়েছে, কোত্থেকে পাঠিয়েছে কিছুই জানা যায় নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উলটে পালটে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। হাতের লেখা দেখেও ধরার চেষ্টা করেছিলাম। না, একটুও বুঝতে

পারি নি। অথচ শেষের দিকে কি মারাত্মক মারাত্মক সব কথা লেখা ছিল। ভীতি প্রদর্শন! কে জানে বাবা।

আমি ত নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয় মানুষ। ছেলে বউ নিয়ে বাস করি। আনি-নিই-খাই। রাজনীতি, হেননীতি, তেননীতি ওসব কচকচির সাতে পাঁচে নেই। অন্য কেউ কেউ ওসব আলোচনা করলে আমি এড়িয়ে যাই। বুঝি না বলতে অবশ্য খারাপ লাগে। আর একবারেই যে বুঝি না, তাও সত্যি নয়। রাস্তাঘাটে বেরুই, বাজারহাট করি, বাসে ট্রামে যাতায়াত করি, খবরের কাগজ পড়ি। সুতরাং জানতে এবং বুঝতে হয়ই কিছু না কিছু। শুধু নিজেকে জড়াই না। কি হবে? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান ছাড়া।

আমার এই গত আশ্বিনে বিয়াল্লিশ পার হ'য়ে গেছে। এ জায়গা সে জায়গা, এ কোম্পানী সে কোম্পানী করে চাকরি জীবনই হয়ে গেল উনিশ বছর। ঢের দেখেছি বাবা। সব জমানাই দেখলাম। আমাদের মতো লোকদের জন্য ওমুক নীতি তমুক দল সবই এক। যে যখন আসছে, সে তখন লাঠি ঘোরাচ্ছে। আমরা মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। ওটা ফাটলেই ত চিত্তির। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, মাথাটা পিঠের কাছে কোথাও থাকলে হয়ত ওটা খানিকটা সুরক্ষিত হ'তে পারত। কি হবে ওটাকে আর সবচেয়ে উঁচুতে রেখে! শুধু বিপদের সম্ভবনাকেই নিঃশব্দে বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া! আসলে এই আমাদের মত আমি'র ত বিশেষ কোনো নীতি ফিতি কিস্যু নেই। কোনো নীতি যে আমাদের কিছু দিতে কিংবা শেখাতে পারবে তাও না। আমাদের প্রত্যেকেরই একটি আলাদা নীতি আছে। পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ হয়ত ততগুলোই নীতি। সোচ্চার হওয়ার বিপদ আছে, তাই আমরা চুপচাপ থাকি। অনেক সময় মেনে না নিলে পাঁকে পড়ার ভয় থাকে, তাই ওপর ওপর এমন ভাব দেখাই যেন সমস্তটাই শুধু মেনেই নিই নি, বিশ্বাসও করে ফেলেছি। সায় দিতে দিতে ঘাড় শালা টনটন করে ওঠে, তবু নরম রাখতে হয়, শক্ত হলেই মরেছে।

এই ত মাসচারেক আগে আমারই বড় শালা দেবদত্ত কি খেলটাই দেখাল।

বাড়িটা শুধু শুধু পড়ে আছে দেখে ভাবল, ফেলে রেখে কি হবে, দুর্গাপুর থেকে কবে বদলি হবে ভগবান জানে। ভাড়া দিয়ে দিলে যা আয় হবে, দু মেয়ের পড়ার খরচটুকু উঠে আসবে। দিল ভাড়াটে বসিয়ে। কিন্তু কপালে রয়েছে দুঃখ, খণ্ডায় কে।

চারমাস যেতে না যেতেই হয়ে গেল বদলির অর্ডার। থাকার বাড়ি চাই। ভাড়াটেরা মারমুখী হয়ে বলল—নেই ছোড়েগা। এমনিকি দু-চারমাস এদিক ওদিক বাড়ি দেখে তারপর যা। না তাও না। লড়াই শুরু হল। মামলা পর্যন্ত হল। কোর্ট বলে দিল, ভাড়াটেদের তোলা যায় এমন কোন আইন এখনও পর্যন্ত নেই।

দেবদত্ত ঝানু ছেলে। ছাড়ার পাত্র নয়। যুব মস্তানদের ধরল। মাংস-টাংস খাওয়াল। তারা দু একদিন রোখ্‌পাক করল। কিন্তু এরমধ্যেই জামানা গেল পালটে। দেবদত্ত রাজনীতি করে না। দল বদলানকে সে থোড়াই কেয়ার করে। সব দলই তার কাছে দল। পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। একরকম কেঁদেই পড়ল আবার নতুন দলের ছেলেদের কাছে। প্রথমে তারা একটু গুঁইগাঁই করাব পরে রাজী হল। দেশের নতুন ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখাব জন্য এমনিতেই তারা একটা ফয়সালা করে দিল। দেবু অবশ্য অকৃতজ্ঞ নয়, বাড়িতে ঢোকার চারদিনের মধ্যেই গৃহ প্রবেশের নাম করে পার্টির ছেলেদেব সবাইকে ডেকে ভুরিভোজ খাইয়ে দিয়েছে।

ভালই করেছে। এখন দিব্যি আছে। কিন্তু সে হল অন্য ব্যাপার। আমার ত সমস্যাটাই অন্যরকম। বলতে কি এটা একধরনের মানসিক টর্চার। শেষ চিঠিটাও পেয়েছি প্রায় মাস চারেক আগে। হাতেব লেখা আর কালিটাও সেবার আলাদা ছিল। কিন্তু মোটামুটি চিঠির বয়ান সেই একই রকম। নাম ধামও কিছু নেই। শুধু ওঁ সত্য আর বাবার নাম লিখতে হবে একশ' বার। তারপর করলে কি কি ভাল ফল পাওয়া যায় কিংবা গেছে, আর না করলে কি কি অনিষ্ট এবং ক্ষতি হতে পারে তার বিবরণ লিখে যে কোন কুড়িজনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। অর্থাৎ, তোমার গাঁটের পয়সা খরচা করে

কুড়িটা ইন্‌ল্যাণ্ড ছেড়ে দিলে, ভাল ভাল সব সম্ভাবনার রাস্তা তোমার জন্য খুলে যাবে। আর যদি না করেছ, তাহলেই তুমি পুত্রশোক পাবে, চাকরি থেকে ছাঁটাই হবে, বাসে এ্যাক্সিডেণ্টে ঠ্যাং কাটা যাবে…সেসব সাঙ্ঘাতিক শাস্তি।

কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ। এসব কুসংস্কারে নিজেকে জড়িয়ে মন দুর্বল করার কথা চিন্তা করতে পারি না। টাই বেঁধে ব্রীফ কেস নিয়ে মিনি বাসে চেপে অফিস যাই। হ্যাঁ, তোমরা বাড়ির বউ। কোথায় চিঠি দু চারটে ছাড়লে কি না ছাড়লে, সে কি আমি দেখতে যাব? দরকারটাই বা কি আমার। বারণ ত আমি করবই। এসব অযথা খরচ।

তবু দীপার ওপর আমার রাগ হয়। ওর কি দরকার আমি কি বলছি না বলছি তার ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে। যা সব কাণ্ড কারখানা ঘটছে আজকাল, লৌকিক অলৌকিক কত কিছু। ইনল্যাণ্ড না হয় না-ই দিলে, কুড়িটা পোস্টকার্ড ত ছেড়ে দিতে পারতে। আমি বেশ অনুভব করি, মনটা বড্ড খচ্‌ খচ্‌ করে। গতমাসেই কোথাও কিছু নয়, মেয়েটা পড়ল ম্যালেরিয়ায়। সে কি কাঁপুনি আর তেড়ে জ্বর! তার ওপর আবার ওষুধ পাওয়া যায় না দুদিন ধরে।

সে গেল। ভাল হতে না হতেই ছেলের হল রক্ত আমাশা। শুধু রক্ত আর রক্ত। অমন স্বাস্থ্য ছেলের, তিনদিনে একেবারে আধখানা। এখনও সে ছেলের ওষুধ চলছে। মনের আর দোষ কি? বারবারই চিঠিটার শেষদিকের কথাগুলো মনে পড়ছিল। তার ওপর এবারের ব্যাপারটা যে আরও মারাত্মক। কোম্পানী অতি কঠোর মনোভাব নিয়েছে এবার। আমার আবার ভয়ও বেশী। কোম্পানী কিংবা শ্রমিক কোনো দলের সঙ্গেই আমার পিরীত নেই। দু তরফ-ই সম্ভবতঃ আমায় খারাপ চোখে ছাখে।

মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি। এবার আর কোনো রিস্ক নেব না। দু দুবার এরকম অবহেলা করাটা খুবই অনুচিত হয়েছে। দরকার কি বাবা, কত কি-ই ত শুনি! আমারই ভুল হয়েছে, মেয়েছেলের ওপর নির্ভর করাটা।

মনটা কয়েকদিন ধরেই গাইছে—এবার একটা চিঠি আসবে নিশ্চয়ই। ওঁ সত্য আর বাবার নাম লিখব একশ'বার করে, কুড়িটা চিঠিতে। তার মানে দু হাজারবার। শালা, হাত জমে যাবে একেবারে। (ইশ্-শ্ ছি ছি! বাবার নামের সঙ্গে এসব কূটচিন্তা করাও পাপ।)

অফিস থেকে ফেরার পথে নিজেকে শাসন এবং সংশোধন করি। মন শক্ত করি। আসলে আজকে দুপুর বেলা জিপিও থেকে খামগুলো কেনার পর থেকেই মনে আমি আলাদা রকম একটা বল পাচ্ছি। অভয়দা'র হাবভাব, কথাবার্তাও কয়েকদিন ধরে আমার খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কয়েকদিনের মধ্যে বাবার চিঠি নিশ্চয়ই একটা না একটা এসেছে। সে যেই পাঠিয়ে থাক। নিশ্চয়ই ব্যাটা ওই দোকানদার মেরে দিয়েছে। তা নয়ত সকালে ও কেন বলবে, চিঠির জন্যই পেট গোলাচ্ছে? অফিসের মনোতোষবাবু এসব ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার। উনিও প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কবে চিঠি পেতেন। কথার পৃষ্ঠে কথা হতে হতেই একদিন ব্যাপারটা ওপর ওপর জানা গেল। পরে আলাদা করে ডেকে বলাতেই সব পরিষ্কার হল।

তা সেই মনোতোষবাবুও চার পাঁচদিন আগে ঠিক চিঠি পেয়ে গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে উত্তরও ছেড়ে দিয়েছেন কুড়িটা। ব্যাপারটা ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে আসে আমার কাছে। ঠিক ধরেছি। এসবই অভয়দার কেরামতি। এবার আমি ওকেই ঝোলাব।

বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। আজও অন্ধকার। মেয়েটার আবার জ্বর এসেছে। ডাক্তার ঘুরে গেছে এর মধ্যে। ম্যালেরিয়া রিলাপস্ করেছে। অসম্ভব রাগ হয় দীপার ওপর। কিছু না শুদ্ধু কয়েকটা চিঠি। যার তার ঠিকানায় ছেড়ে দিলে এতদিনে সব ঝামেলা চুকেবুকে যেত। বোঝ এখন।

অন্ধকারেই জামা কাপড় ছেড়ে নিই তাড়াতাড়ি। পুরোন হ্যারিকেনটা নিয়ে ঘরে আসি। চিঠি না আসুক। দীপা জানে না,

আগের চিঠিটা আমি শেষমেষ লুকিয়ে তুলে রেখে দিয়েছি গীতাবিতানের পাতার ভাঁজে। ওটা দেখে দেখেই একটার পর একটা…ঠিকানা পরে লেখা যাবে।

ওঁ সত্য—বাবা, ওঁ সত্য—বাবা, ওঁ সত্য…

আঙুল টনটন করে, লেখা বেঁকে যায়। হ্যারিকেনের তেল আসে ফুরিয়ে। দীপা ঘরে এসে ঢোকে।

—কি করছ বলত, সেই থেকে ফিরে?

মেজাজ খাট্টা হ'য়ে যায়! কথা বলি না, লিখে যাই। দীপা আরও কাছে আসে।

—কি ব্যাপার কি, অত কি লিখছ অন্ধকারে মশার কামড় খেতে খেতে?

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজ চাপা দিয়ে দিই পুরো চিঠিগুলোর ওপর। তার মধ্যেই একটা ছিনিয়ে নেয় দীপা। নীচু হ'য়ে আলোয় ছাখে।

—ওমা, এ আবার কি কাণ্ড! তোমার কি ভীমরতি ধরলো না কি? যত্তোসব বুজরুকি…তুমিই ত আমাকে বলেছিলে ওসব দূর করে ফেলে দিতে। পরশুও ত আর এক লম্বা চিঠি এসে হাজির।

—সে কি, আমাকে বলনি ত? কোথায় সে চিঠি?

—উনুনে ফেলে দিয়েছি তক্ষুনি।

আমার মুখে আর কথা যোগায় না অন্ধকারে, ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে ঘাম ফুটে ওঠে বুঝতে পারি। অস্ফুট স্বরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—বাবা, বাবা।

দীপা তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে—মেয়ের ওষুধটা আগে নিয়ে এসো, অভয়দার দোকানে নেই, তারপর বাবাকে ডেকো। গজ গজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—ভীতুর ডিম, বড় বড় কথা মুখে!

হ্যারিকেনটা তেল ফুরিয়ে একেবারেই নিভে গিয়েছিল। আমি নিজেই আমার হাত পা বুক পেট মাথা কিছুই আর দেখতে পেলাম না অন্ধকারে।

প্রথমে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এবং পরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শীতলবাবু নিজেই উঠে এলেন। ম্যাজিক গ্লাসে চোখ রাখলেন। হ্যাঁ ঠিক, ডাক্তারবাবু এসে পড়েছেন। সাধারণতঃ অন্যান্য ছুটির দিন সকালবেলা এ সময়টা শীতলবাবু বাড়ি থাকেন না। লেখক মানুষ, আড্ডা প্রিয়। আবার প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকা সাম্পাদনার দায়িত্বও অনেকটা তাঁর। পুরোন গাড়ি আর নতুন সারথি নিয়ে এখানে ওখানে এ আড্ডা সে আড্ডায় ঘুরে বেড়ান। কখনও বসেন, চা খান, খাওয়ান। সাহিত্য এক জিনিস আর সাহিত্যের বাজার আর এক ব্যাপার। শীতলবাবুর ভাষায়, ছুটির দিন মাছ তরকারির বাজার সেরে সাহিত্যের বাজারে যাই।

—কিনতে না বেচতে? গোঁফের তলায় হাত রেখে এক চ্যাংড়া কবি জিগ্যেস করেছিল।

কথাটা কানে গিয়েছিল শীতলবাবুর। মিষ্টি চোখ আর নতুন গুড়ের মুড়কির মতো ছোপ ধরা ছোট ছোট দাঁতে হেসে বলেছিলেন—কে রে আমার মাণিক ছেলে! কবি না গল্পকার? সন্তর্পণে চেয়ার শুদ্ধ নিয়ে দশাসই শরীরটা ঘুরিয়েছিলেন শীতলবাবু। কোণে বসা লম্বা-চুল ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—পিপুলটি তো বেশ ভালো পেকেছে খোকা। একটা লেবু-চা খাবি? আর কথা বলেন নি। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।

সুন্দর হেসে দরজা খুলে ধরলেন শীতলবাবু।

—নমস্কার ভাই ডাক্তারবাবু। আসুন, ভেতরে আসুন।

—কি ব্যাপার শীতলবাবু!—ডকটর কানুনগো ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে

বললেন—কেমন আছেন? দেবাশিস ফোন করে বললো খানিকটা সময় নিয়ে আসতে, সেইজন্য উইক ডে-গুলো বাদ দিয়ে ছুটির দিনই চলে এলাম।

ডাক্তারবাবু ব্রীফ কেস রেখে সোফায় বসলেন। কেয়াতলা রোডে শীতলবাবুর বাড়িটি চমৎকার। ওপর থেকে একটু সাবেকী আমলের দেখতে লাগলেও ভিতরে বেশ খোলামেলা। বাইরের দিকে নিজের এই বসার ঘরে শীতলবাবু একটি এয়ারকুলার-ও লাগিয়ে নিয়েছেন। দিন-রাত মাথার কাজ করেন, তার ওপর এমন এক অসুখও শরীরে রয়েছে যে গরম বাড়িয়ে রাখে সবসময়। বিস্তর ওষুধপত্র খেতে হচ্ছে। পাতানো ভাগ্নে দেবাশিসের পরামর্শেই ডাক্তার কানুনগোর সঙ্গে যোগাযোগ। শুধু কলকাতা কেন, ভারতবর্ষের মধ্যেও নাম করা এণ্ডোক্রিনলজিস্ট। ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল এডুকেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ-এর ডাইরেকটার।

সিগ্রেট প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে খাটে বসলেন শীতলবাবু। ডাক্তারবাবুর মুখোমুখি।

—খুব ভালো করেছেন। সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ডক্টর। আপনার মতো একজন ব্যস্ত গুণী মানুষ, দেশের কৃতী ছেলে যে আমার মতো একটি পাঁচ সাত হাজারী পত্রিকার লেখক-সম্পাদককে শুধু নামেই চিনেছেন এবং এতো তাড়াতাড়ি সময় নিয়ে বাড়িতে এসেছেন, এ আমার গৌরব। আপনি আমার বুকের গরম ভালোবাসা জানবেন।

ডাক্তার কানুনগো হো হো করে হেসে উঠলেন শীতলবাবুর কথা শুনে এবং তা বলার সিরিয়াস ভঙ্গি দেখে। আর ডাক্তারবাবুর হাসির মধ্যেই শীতলবাবু দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাকলেন—রঞ্জনী, রজনী। এ পাশ ফিরে আবার অবিকৃত মুখেই বললেন—না ভাই ডাক্তারবাবু, হাসি না। সত্যি বলছি, মানুষকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাতে আমি অকৃপণ অযাচিত অপর্যাপ্ত। আপনি বিশ্বাস করুন শুধুমাত্র আমার এই—

শীতলবাবুর কথা থামাতে হল। একটি কালো আর গেরুয়া রঙের কেঁদো এ্যালসেশিয়ান জিভ হ্যাল হ্যাল করে ঘরে ঢুকলো। ডাক্তার কানুনগো সিঁটিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। শীতলবাবু কুকুরটির ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন—এই যে মা রজনী, ভেতরে গিয়ে মীনাকুমারী কিংবা বৈজয়ন্তীমালাকে বলো, আমাদের চা জলখাবার দিতে।

ডাক্তার কানুনগো'র ভ্রুকুটি মুহূর্তে কাছাকাছি এসেই আবার সোজা হ'য়ে গেল। কথা বললেন না। কুকুরটি জিভ দিয়ে মুখের চারিপাশ চেটে শীতলবাবুর দিকে একবার তাকালো। একটা হাই তুললো। তারপর ফোঁস শব্দে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে শীতলবাবুর পায়ের কাছেই বসে পড়লো।

—কি রে মুখপুড়ি, যেতে ইচ্ছে করছে না? ধীর শান্ত গলায় একটু হেসে স্নেহের চোখে শীতলবাবু কুকুরের দিকে তাকালেন। —আচ্ছা থাক, আমিই বলছি। ডাক্তার কানুনগো'র দিকে তাকিয়ে বললেন—ও এই রকমই। যখন যা মর্জি মেয়ের।

আবার গলা উঁচু করে ডাকলেন—নার্গিস, নার্গিস, আমাকে আর ডাক্তারবাবুকে চা জলখাবার দাও।

ডাক্তার কানুনগো একটু উসখুস করলেন। বললেন—তারপর বলুন শীতলবাবু—।

—আমি খুব দুঃখিত, ডাক্তারবাবু। শীতলবাবু নড়েচড়ে বসলেন। একটা ভারি পা বিছানায় টেনে নিয়ে বললেন—আমি জানি, আপনার সময় কতো মূল্যবান। এভাবে আপনার সময় হাতিয়ে নেওয়া আমার অপরাধ। আসলে কি জানেন ভাই, মনের মতো একটা লোকের কাছে দু মিনিট বসে যদি দুটো মনের কথা বলতে পারি, যদি একটু বুকটা খুলে দেখাতে পারি, মনে হয় যেন আমি কতো পেয়েছি।

—ঠিক আছে বলুন না। আমি তো সময় নিয়েই এসেছি আজ। বলুন। —ডাক্তার কানুনগো যেন অভয় দিয়ে বললেন।

শীতলবাবুর গায়ে গভীর লাল রঙের পাঞ্জাবি। গোলগাল চেহারার তুলনায় মাথাটা যেন একটু ছোট। চোখ দুটি শান্ত; দীর্ঘ এবং ভাসা

ভাসা হওয়া সত্ত্বেও. মুখের অন্যান্য জায়গা যথেষ্ট ফুলো হওয়ায়, একটু যেন ভিতরে ঢোকা। নিচে পাউচ্। ভ্রু দুটি সংক্ষিপ্ত এবং পাতলা। দুই রগে চশমা এঁটে বসার স্পষ্ট দাগ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কোঁচকানো এবং কালো। বেশি মোটা হ'য়ে যাওয়ার জন্যই কি না, কে জানে, ঘাড়টা, ডাক্তার কানুনগো'র মনে হল, বেশ ছোট। বুক আর মাথার দূরত্ব সামান্য। একসময় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সুপুরুষ ছিলেন।

—জীবনে আমার কোনো লোভ-ক্ষোভ নেই জানেন ডাক্তারবাবু। উদাসী চোখে সোজাসুজি তাকালেন শীতলবাবু ডাক্তার কানুনগো'র দিকে। বললেন—কেনই বা থাকবে বলুন। নাম যশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুন্দরী স্ত্রী বড় বাড়ি ছোট গাড়ি, জীবন দিয়ে দেওয়ার মতো বন্ধু. প্রভুভক্ত কুকুর, বাসমতী চালের ভাত তেল-কই পদ্মার ভাপানো ইলিশ ··সবই আমি পেয়েছি। —একটু ঠোঁটের কোণে হাসলেন শীতলবাবু। নিজের হাতের তালুতে চোখ রেখে বললেন—আর অর্থ! আমি জানি না, ডাক্তার, আপনি বিশ্বাস করবেন কি না, জীবনে আমি যে জিনিসেই হাত দিয়েছি, তা-ই আমায় অর্থ দিয়েছে, টাকার মুখ দেখিয়েছে। এমন কি জানেন, একবার দখনের দিকে পড়ে থাকা কিছু হেলে জমি···

—ছি ছি ছি, আয়াম একসট্রিমলি. অফুলি সরি। —হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন শীতলবাবু। আপনাকে রোগ বালাইয়ের কথা বলার জন্য ডেকে এনে···ছি ছি! আসলে এটাই আমার রোগ কিনা জানি না।

ডাক্তার কানুনগো'র চোখে ঠোঁটে সামান্য হাসির ছোঁয়া লেগেই ছিল। হয়তো একটু কৌতূহলও। বললেন—লেখকমশাই, আপনার যা যা বলার আছে বলুন না। আপনার কথা বলা, আমার দেখাকেই সাহায্য করবে। একটু থেমে আবার বললেন—আপনি আপাততঃ আমাকে আপনার পারিবারিক বন্ধু বলেই মনে করতে পারেন।

—ডাক্তারবাবু—। শীতলবাবুর কণ্ঠস্বর যেন ফ্রিজের ভিতর থেকে

ঠাণ্ডা বাতাসের মতো বেরিয়ে এলো।—লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। আস্তে আস্তে মাথা দোলালেন। বললেন—বড় বড় ডাক্তার বাবুদের সত্যি সত্যি আমার ঠিক ভগবান মনে হয়। আপনাদের কি সুন্দর দেখতে, কি চমৎকার হাসেন আপনারা।

ডাক্তার কানুনগো'র মিটিমিটি হাসি হঠাৎ ফেটে গেল। হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। স্বগতোক্তির মতো খুব আস্তে বললেন—সুপার্ব!

—আপনি হাসছেন ডক্টর কানুনগো। গম্ভীর মুখে খুব টেনে টেনে বললেন শীতলবাবু। —জানেন, আমার প্রথম মেয়ে মীনাকুমারী যখন হল, আমার স্ত্রীর পেট কাটতে হয়েছিল। আমি তো দুঃখে দুর্ভাবনায় প্রায় আধমরা। অমন স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী স্ত্রীর ফর্সা পেটটা দোফালা করে কেটে ফেলবে। ভাবতেই আমার চোখে জল আসছিল। অপারেশনের দিন সকাল থেকে নার্সিংহোমে বসে আমি কুলকুল করে ঘামছি আর বুকে হাত বোলাচ্ছি।

শীতলবাবু থামলেন। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে আবার বললেন —দুপুর ঠিক আড়াইটের সময় অপারেশন থিয়েটার থেকে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। আমার পিঠে হাত রাখলেন। প্রায় ওজন করা কয়েক গ্রাম মিষ্টি হেসে বললেন—শীতলবাবু, আপনার স্ত্রী খুব ভাল আছেন। আপনি বাড়ি যান। ঝোলভাত দুটি খেয়ে একটু ঘুমোন। আমি জানি ভাই আপনার ওপর দিয়ে কি টেনশন···কি বলবো ডাক্তারবাবু. আমি এমন মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে মনে হচ্ছিল দৈববাণী শুনছিলাম। উনি ডাক্তার নন, সাক্ষাৎ ভগবান! কি অসাধারণ চোখ, কি রং চামড়ার! গলার স্বর যেন খাদে বাজা জার্মান রীডের পিয়ানো···মুহূর্তে আমার সমস্ত দুর্ভাবনা যে কোথায় উবে গেল, আর কোনদিন স্ত্রীর ছেলেপিলে হওয়ার সময় তাদের দেখি নি।

মোলায়েম হাসলেন শীতলবাবু। ছোট ছোট দাঁতগুলো দেখা যাওয়ার সঙ্গে চোখ আধবোজা হয়ে গেল। বললেন—আপনাকে দেখেও ভাই প্রথম থেকেই আমার সেই ভগবানের ছবি মনে পড়ে গেছে। জানেন তো, যার যার ভগবান তার নিজের কাছেই সত্য।

আমি আবার বড্ড ভগবান বিশ্বাসী মানুষ, নাস্তিক ত্ব চোক্ষে দেখতে পারি না। আপনি কিন্তু আমায় একটু পায়ের ধুলো…

ডাক্তার কানুনগো গভীর উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন সামনে বসা শীতলবাবুর দিকে। দেখা এবং ভাবার সঙ্গেই যেন নিঃশব্দে মিলিয়ে চলেছেন অনেক কিছু। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন এক মহিলা। হাতে ট্রে। শীতলবাবু সেদিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা হেসে বললেন—ও, নার্গিস, তুমি এসেছো ?

ভদ্রমহিলা কথা না বলে শুধু হাসলেন। ট্রে থেকে খাবারের প্লেট চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। শীতলবাবু বললেন—বসো, নার্গিস, আলাপ করিয়ে দিই।

সপ্রতিভ মহিলা টেবিলের পাশেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। খাবারের প্লেট তুলে নিয়ে ডাক্তার কানুনগো'র হাতে দিলেন —নিন। শীতলবাবু বললেন—ডাক্তারবাবু, নার্গিস আমার স্ত্রী।

ডাক্তার কানুনগো হাতের প্লেট রেখে নমস্কার জানালেন। শুনতে পেলেন, ভদ্রমহিলা চাপা গলায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলছেন—কি হচ্ছে কি তখন থেকে! এদিক ফিরে হাসিমুখে নমস্কার জানালেন ডাক্তার কানুগোকে। —কেমন দেখছেন ?

—এখনও দেখি নি—ডাক্তার কানুনগো বললেন। —শুধু শুনছি।

শীতলবাবু নিজের প্লেট ইতিমধ্যেই হাতে তুলে নিয়েছেন। জল ভরা সন্দেশে একটা কামড় দিয়ে ডাক্তার কানুনগো'র দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা বেশ, ডাক্তারবাবু, ও যখন পছন্দ করছে না, আমিই ঠিক করে বলি। ওর আসল নাম নিরুপমা, আমি আদর করে নার্গিস বলি।

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে বিরক্তি নেই। বরং স্বাভাবিক হাসিটাই ছড়িয়ে আছে। সেই হাসি নিয়েই আস্তে বললেন—ওহ্, সত্যি! —চেয়ার ঠেলে উঠে যেতে যেতে বললেন—আপনারা কথা বলুন। আমি যাই।

শীতলবাবু প্লেট রেখে স্ত্রীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন—

নার্গিস, আমার এতোদিনের চিকিৎসা আর ইনভেস্টিগেশনের ফাইলটা পাঠিয়ে দিও। ওকে দেখাতে হবে তো।

—আচ্ছা, দিচ্ছি—বলে ভদ্রমহিলা দরজা ভেজিয়ে চলে গেলেন।

ডাক্তার কানুনগো চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন। পায়ের ওপর পা তুলে হেলান দিয়ে বসলেন। যেন পরিবেশটা সুন্দর উপভোগ করছেন। চুমুক দিয়ে বললেন—বলুন, এবার আপনার অসুখবিসুখের কথা শুনি।

একটা সিগ্রেট ধরালেন লেখকমশাই। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আমি কোন্ অসুখটার কথা আগে বলবো বলুন তো, শরীরের না মনের ?

সিগ্রেটে টান দিলেন শীতলবাবু। বুকে শ্লেষ্মার উপস্থিতি জানিয়ে বয়স্ক কাসলেন দু-বার। —আমার মনে হয় আগে মনেরটাই বলি, কেমন! কেননা মনের অসুখ না সারলে তো শরীর সারে না, তাই না ? আর আমাদের তো, আপনি জানেন, মন নিয়েই যতো কিছু। —দুপাশে মাথা দুলিয়ে শীতলবাবু নিঃশব্দে হাসলেন। —শিল্পী মানুষদের মন বড় সংবেদনশীল স্পর্শকাতর। কতো ছোট ছোট ঢেউ যে সারাদিন সারারাত ভাঙ্গে গড়ে, আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, ডাক্তারবাবু। রাতে ঘুমিয়ে শান্তি নেই। অবচেতন মনের কুচো কুচো ভাবনা, দুঃখেরা এসে অন্তরে পিন ফোটায়। অলীক ব্যথারা বাস্তব রূপ পায় আমার অশ্রুতে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুচোখ ভ'রে থাকে জলে। সিগ্রেটে টান দিলেন শীতলবাবু। বললেন—কতো আর ঘষে ঘষে মুছবো বলুন! এই দেখুন, আইল্যাশ প্রায় সব উঠে গেছে। আজকাল তাই ব্লটিং পেপারের টুকরো রেখে দিই বালিশের পাশে। জল দুঃখ সব শুষে নেয় একসাথে। কি করবো, বলুন। বালবাচ্চা সংসার নিয়ে আমাকেও বাঁচতে হবে!

ডাক্তার কানুনগো'র বেশ অবাক লাগছিল। ভদ্রলোক যে কথাগুলো বলছেন তার মধ্যে কিছু উত্তেজনা আছে, অথচ ওঁর বলার ভঙ্গির মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই। মজার কথা এমন উদাসীন আর

সিরিয়াস হয়ে কিভাবে বলা যায়, ডাক্তারবাবু ভেবে পাচ্ছিলেন না। রোগী দেখতে এসে বুঝি নিজেই এক আচ্ছন্নতার শিকার হয়েছেন। একটা হাসির দমক এসেও থমকে গেল। আস্তে আস্তে বললেন—কিসের অশান্তি, কি আপনার দুঃখ এতো ?

—কি বলবো বলুন। সিগ্রেট নিবিয়ে ফেলে দিলেন শীতলবাবু। বললেন—এতো সব ঠগ জোচ্চর দুষ্টু লোকেরা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে তাদের আইডেন্টিফাই করাই দুষ্কর।

—কেন, তাতে আপনার কি হল ?

—শুনুন, তাহলে।—একটা বালিশ টেনে নিলেন সাহিত্যিক মশাই। আধবোজা চোখে স্নিগ্ধ হেসে বলতে শুরু করলেন—মাসখানেক অ গে আমাদের পত্রিকায় একটা সম্পাদকীয় লিখলাম। খুব ভেবেচিন্তে মাথা ঠাণ্ডা করে গতিময় ঝরঝরে ভাষায় আমার সব লেখক বন্ধুদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ গোছের। এঁরা সবাই শিল্পী সাহিত্যিক মানুষ, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে আর তেমন কিছু রিপ্রোডিউস করতে পারছেন না বলে, কাউকে নিয়েই তেমন হৈ চৈ নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো জানি, নিজেদের ব্যর্থতায় এঁরা কতখানি মুহ্যমান! একজন লেখকের লেখা নিয়ে যখন আর কোনো তোলপাড় হয় না, আলোচনা সমালোচনা হয় না, তখন তার বুকের মধ্যে যে কি পাথর ভাঙ্গে—আমি জানি। একজন লেখক হিসেবে আমি তা অনুভব করি। সেই অনুভূতি থেকেই আমি আমার সাধ্য আর সুযোগ ব্যবহার করে এঁদেব নিয়ে লিখলাম। আমি জানি, এঁরা আবার অত্যন্ত কনসাস্ এবং সেনসিটিভ ; সেইজন্য বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এমন একটা ভাষা আর কায়দার পাঞ্চ্ করলাম, যাতে এঁদের কথা বলাও হয়, আবার আমি যে এঁদের জন্য কিছু করছি সেটা বোঝাও না যায়। অর্থাৎ সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে থামলেন শীতলবাবু। ডাক্তার কানুনগো'র দৃষ্টি ঠায় পড়ে আছে শীতলবাবুর মুখে। পাঞ্জাবির দুটো বোতাম খুলে সিগ্রেট টেনে নিলেন প্যাকেট থেকে। একটা শ্বাস

ফেলে বললেন—কিন্তু নাহ্, হল না।—বোধহয় একটু উত্তেজিত হ'তে যাচ্ছিলেন শীতলবাবু, সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে বাঁধলেন। কোমল গলায় বললেন—আসলে না হওয়ার জন্য কিছু না। চেষ্টা করেছিলাম, হল না। এতে আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ অন্য জায়গায়। লেখাটা পুরো ব্যুমেরাং হ'য়ে গেল, ডাক্তারবাবু। আমি জানি, আমার লেখক বন্ধুরা কেউ নিজে থেকে ওই লেখার বিশেষ কোনো মানে করেন নি। কেনই বা করবেন? তাঁরা তো লেখক, মন তাঁদের পাঁকাল মাছের মতো। নোংরা গায়ে লাগে না, মন তাঁদের বিষিয়ে যেতে পারে না। অথচ তাঁদের পয়জন করা হয়েছিল।

শীতলবাবু থামলেন। সিগ্রেট ধরালেন। ডাক্তার কানুনগো তখনও একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে। ব্যাপারটা ঠিক যেন ধরতে পারছিলেন না। কোথায় খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। স্পষ্ট বলেই ফেললেন—আমি কিন্তু ঠিক বুঝলাম না, লেখকমশাই, আপনি কি বলতে চাইছেন!

—কি বলবো ডাক্তারবাবু! সিগ্রেট ধরিয়ে নিলেন শীতলবাবু।—বাইরে কি এসব কথা বলা যায়! একটা এথিক্স্ বলে ব্যাপার নেই! সংকোচ না রেখে আপনাকেই বলছি, আপনি তো আর এ লাইনের লোক নন।—সিগ্রেটে টান দিলেন শীতলবাবু। বললেন—ব্যাপারটা কি জানেন, আমার পত্রিকারই প্রতিযোগী আর একটি পত্রিকার অতি খল সম্পাদক মশাই আলাদা করে ডেকে ডেকে এইসব লেখকদের বোঝালেন, আমি নাকি সূক্ষ্ম কায়দায় আসলে ওঁদের প্রত্যেককেই হেয় করেছি, গালাগালি দিয়েছি, এমন কি আকারে ইঙ্গিতে আমি নাকি তাঁদের গণিকা পর্যন্ত বলেছি!

ডাক্তার কানুনগো'র হাত চাপা ছিল ঠোঁটের ওপর। এবার হঠাৎই একটুকরো হাসির শব্দ যেন লিক্ করে বেরিয়ে পড়লো পাশ দিয়ে। শীতলবাবু গায়ে মাখলেন না। শান্ত গলায় মুখে হাসি মেখে বললেন—লেখকরা সব আমার ওপর চটে লাল, আমি কিন্তু, ডাক্তারবাবু, রাগ করি নি। কেন করবো বলুন, বন্ধুদের আমি চিনি। একটা পত্রিকা সম্পাদনা করলেও, আসলে তো আমি লেখক! আমি জানি, লেখকরা

কানপাতলা মানুষ। আজকে তাঁরা একরকম বুঝলেও কাল তাঁরা আসল সত্য বুঝতে পারবেন। ওই বদমাইস ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্ সম্পাদক যে তাঁদের কি ক্ষতি করছেন এবং করেছেন, তা আমার বন্ধুরা নিজে থেকেই দু দিন পরে উপলব্ধি করবেন।

—সে তো ভালো কথা।—ডাক্তার কানুনগো হাসতে হাসতেই বললেন।—কিন্তু এসব নিয়ে আপনি কেন অহেতুক নিজেকে টেনশনে রাখছেন!

—বলেন কি ডাক্তারবাবু! শীতলবাবুর চোখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেই স্থির হল।—আমি কিন্তু ওই সম্পাদক মশাইকে ছাড়বো না। এই যে আপনি দেখছেন আজ আমার অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, হার্টে ইস্কিমিয়া, শরীরের সব জায়গা থেকে চুল উঠে যাওয়া—এ সবের অনেকটাই ওই সম্পাদকের জন্য। আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, জানেন!

মিটিমিটি হাসলেন শীতলবাবু। খুব ধীরস্থিরভাবে বললেন—ওঁর ব্যাপারে আমি আর কোনো লেখালিখি কিংবা মৌখিক সমালোচনায় যাবো না। এবার ঠিক করেছি, একটা শারীরিক সমালোচনা করবো।

হাসি চাপতে পারলেন না ডাক্তার কানুনগো। সশব্দে বেরিয়ে পড়লো। শীতলবাবুও হাসলেন শব্দ না করে। বললেন—অবশ্য এটা ঠিক, আমার লেখক জীবনে ওই সম্পাদক চেষ্টা করেও কোনো ক্ষতি করতে পারেন নি। পাঁচজনে আজ আমায় লেখক বলেই জানে।

ডাক্তার কানুনগো সম্ভবতঃ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাইরে থেকে মহিলা কণ্ঠে একটি পরিচিত হিন্দী গানের কলি শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ঠেলে আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। সুন্দর চেহারা সহজ ভঙ্গি। তার বাঁ কাঁধে ঝুলন্ত এবং সম্ভবতঃ ঘুমন্ত অবস্থায় একটি সাদা বেড়াল। মেয়েটির কালো শাড়ির ওপর যেন একটি জীবন্ত ডিজাইন! দুই হাতে তার উল বোনার কাঁটা, নিঃশব্দে খুট খুট করে বুনে চলেছে এক ফেত্তি লাল উলের টুকরোকে। চোখও তার সেই কাঁটার ডগাতেই স্থির নিবদ্ধ।

শীতলবাবু ডাক্তার কানুনগো'র দিকে তাকালেন।—আমার কন্যা বৈজয়ন্তীমালা।—নির্মল হাসি ছড়িয়ে পড়লো শীতলবাবুর মুখে।—বড় ভালো নাচে, গায়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—মা, ফাইল এনেছিস ?

মেয়ে কথা বললো না। কাঁটা থেকে চোখ সরালো না। ধীর পায়ে হেঁটে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এতোক্ষণ চোখে পড়ে নি ডাক্তার কানুনগো'র। দেখা গেল তার ডান কনুই আর কোমরের মাঝে চেপে ধরা রয়েছে ফিতে বাঁধা বাঁশ কাগজের ফাইল। শীতলবাবু ধরতেই যেন ফাইলটি খ'সে পড়লো তাঁর হাতের মুঠোয়। মেয়ে উল বুনতে বুনতে চোখ না সরিয়েই বললো—খুশি ?

—খুব খুশি, মা। শীতলবাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আবার বললেন—মা, বৈজয়ন্তী, আমার বন্ধু এই ডাক্তারবাবুকে একটু নাচ দেখাবি নাকি ?

—দুষ্টুমী হচ্ছে ? আমি বড়ো হই নি ?—মেয়ে দু কাঁটার মাঝখানে উল ধরে টানলো। গলায় মিষ্টি ধমকের সুর। চোখ স্থির রেখে বললো—ও বেলা কিন্তু পার্ক স্ট্রিট্-এ। ঘুরে দাঁড়ালো মেয়ে।—দরজার দিকে চলে যেতে যেতে বললো—বায় বাই !—আর তখনই শোনা গেল তার কাঁধের সাধের বেড়ালটি ডেকে উঠলো—মিউ। মেয়ে—'ছোনা আমার, পুটু আমার, বলতে বলতে বেড়ালের লোমে হাত বোলাতে বোলাতে বেরিয়ে গেল দরজা ঠেলে।

ডাক্তার কানুনগো এতোক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। চুপ করে ছিলেন। শীতলবাবু তাঁর দিকে ফাইল এগিয়ে 'নিন' বলাতে হঠাৎ যেন তাঁর ছোট্ট চমক ভাঙ্গলো। বোধহয় সামান্য অপ্রস্তুত হয়েই হাত বাড়ালেন। বললেন—ও হ্যাঁ, দিন দেখি।

শীতলবাবু ফাইল দিয়ে একটু কুণ্ঠিত হাসলেন। সোহাগী সুরে বললেন—ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে খুব বিরক্ত করছি।

—না, না বিরক্ত করবেন কেন ?—ডাক্তার কানুনগো ফিতে খুলতে খুলতে বললেন।—আমার খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। আপনার যে

অসুখ আমরা সাসপেক্ট্ করেছি, তাতে আপনাকে আমার একটু ডিটেল জানতেই হবে। আপনার শারীরিক ব্যাপার জানার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনের ব্যাপার, আপনার কথা, কথা বলার ভঙ্গি সবই আমি লক্ষ্য করছি। আপনি বলুন।

শীতলবাবু আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।—আপনি জানেন ডাক্তার-বাবু, ওই সম্পাদক মশাইয়ের শয়তানি থেকে আজ অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে? লোকে আমায় অবিশ্বাসের চোখে ছাখে, কুচো কুচো ফালতু পত্রিকার সম্পাদকরা আজ ইনডাইরেক্ট্লি আমায় ঠেস দিয়ে লেখে!

ডাক্তারবাবু ফাইল রেখে দিলেন পাশে। বললেন—তাতে কি হয়েছে! সেগুলো তো একরকমভাবে আপনার এ্যাডভারটাইমেণ্ট-ই হচ্ছে। আপনার ভেতরে কিছু আছে, যার জন্য আপনার সম্বন্ধে তারা উদাসীন হ'তে পারে না।

—তা নয়, ডাক্তারবাবু। দুঃখটা অন্য জায়গায়।—শীতলবাবু স্নেহ লাগিয়ে বললেন—আপনি জানেন না ডাক্তার, নতুন নতুন যে সব ছেলেমেয়েরা লিখছে আজকাল, তাদের লখা আাম কতো যত্ন করে পড়ি, আলোচনা কি, ছাপি। পত্রিকা অফিসে বসেও আমি তাদের চা সিঙ্গাড়া খাওয়াই। দুদিন পরে আমি এদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ছবি ছাপবো, জীবনী বের করবো।

—খুব ভালো কথা তো।

—কিন্তু কি বলবো ভাই, এদের মধ্যেও পলিটিক্স্ ঢুকেছে। তার ওপর সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভেড়ার মতো কিছু কচিবুড়ো আছে এদের তাতাবার জন্য। তারা সাহিত্যের লাইনের লোকও নয়, জীবন সম্বন্ধে তাদের কোনো বেসিক আইডিয়া নেই। অথচ তারা নানান কৌশলে আমার এ্যান্টি করছে।

—করুক না, আপনার কোনো ক্ষতি তো তারা করতে পারছে না। ডাক্তার কানুনগো বললেন।

—না, তা পারছে না। কিন্তু ওই যে বললাম—টেনশন! টেনশন

বাড়াচ্ছে, তার থেকেই অসুস্থতা…হঠাৎই একটু উৎসাহ নিয়ে শীতলবাবু বললেন—একবার জানেন ডাক্তারবাবু, এইরকম একটা লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে আমি কফি হাউসে ধরেছিলাম। ফিগরুমনি তেজবরে বুড়োর মতো চেহারা। বয়স তার আমার কাছাকাছি কিন্তু ঘোরে কিছু পাকা অল্পবয়সী ছোঁড়ার সঙ্গে। তাকে আমি অবশ্য খারাপ কথা একটাও বলি নি। শুধু বললাম—শীতলবাবু গলায় নির্লিপ্ততা ফুটিয়ে তুললেন—ভাই, তোর বয়স তো আমারই মতো। তুই তোর কাগজে আমায় গাল দিয়েছিস কিছু না জেনে। আমি তোকে পেঁদিয়ে ছাল তুলে নেবো। তুই তো লেখক না, আমি লেখক। তোর কোনো জীবন নেই। জীবন সম্বন্ধে ধারণা রাখতে গেলে সময়-মতো বিয়ে সাদী করতে হয়, পয়দা করতে হয় বাজার থেকে দরদাম করে মাছ কিনতে হয়, বাচ্চার জন্য লাইন দিয়ে বেবীফুড আনতে হয়, গাছের গোড়ায় নীড়েন দিয়ে মাটি উস্‌কে দিতে হয়। বল তো ভাই, তোর কি কোনো অধিকার আছে আমায় অসভ্য কথা বলার! আমি তোকে জাপটে ধরে রিব ফ্র্যাকচার করে দেবো।

ডাক্তার কানুনগো আর চাপতে পারলেন না। বিস্মিত কৌতূহলে এতোক্ষণ লেখক মশাইয়ের নির্লিপ্ত পেলব মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার চাপা হাসি আর কাশির দমকে প্রায় বার্স্ট করলেন। চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছলেন।

শীতলবাবু একটু সময় দিয়ে আবার বললেন—আর আমার চেহারা তো আপনি দেখেছেনই ডাক্তারবাবু। জামাকাপড় ছেড়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে আমার ওজন প্রায় নব্বই কেজি। ভাল বক্সিং আর ক্যারাটে জানি।

চোখে চশমা লাগিয়ে হাসতে হাসতেই ডাক্তার কানুনগো বললেন—আপনার এ্যাপেটাইট কেমন?

—আর বলবেন না। এক কথায় অসম্ভব। শীতলবাবু বিনীত হাসলেন।—পরশু দিন ও এক বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে খাবো না খাবো না করে, সাতাশটা লুচি আটত্রিশ টুকরো মাছ তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ

ঝোল এবং আলু, প্রায় আধ কিলো চাটনি, এক ডজন পাঁপর, রসগোল্লা পান্তুয়া মিলিয়ে গোটা চল্লিশেক, দেড় কিলোটাক জমাট দই আর সতেরো পীস লেবু বেমালুম খেয়ে ফেললাম। সবচেয়ে বড় কথা, তার পরের দিন সকালবেলা আবার বাথরুম করে হাত মুখ ধুয়ে ডিম পাঁউরুটি ছানা শশা স্যাকারিনের সন্দেশ সরবৎ সব খেয়ে ফেললাম, যেমন রোজ খাই। একবিন্দু অস্বস্তি শরীরের কোথাও নেই!

ডাক্তার কানুনগোর চোখে মুখে আগের হাসিটাই ছোঁয়াচে রোগের মতো লেগে রয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরিয়ে আসছিল। তার মধ্যেই বললেন—তা, স্বাস্থ্য কি রকম বুঝছেন এই পরিমাণ খাওয়ার সঙ্গে?

—ফুলছি, ফুলেই চলেছি।—হাত উলটে যেন একটু বিষণ্ণ হাসলেন লেখকমশাই। বললেন—তবে ইদানীং লক্ষ্য করছি, শরীর মোটা হওয়ার সঙ্গে চামড়া যেন একটু ঢিলে হচ্ছে।

বুকে হাত দিলেন শীতলবাবু। —আপনি হাত দিয়ে দেখুন, আমার বুক কিরকম মহিলাদের মতো বড় হ'য়ে উঠছে। কি লজ্জা করে ডাক্তারবাবু!—লজ্জিত হেসে একটু গুটিয়ে গেলেন শীতলবাবু। আর তাঁর সেই সলজ্জ ভঙ্গি দেখে আর একবার প্রায় আর্তনাদের মতো হেসে ফেললেন ডাক্তার কানুনগো। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ফাইল খুললেন।

—আপনি হাসছেন ডাক্তারবাবু? —শীতলবাবু সহজ মুখে নিজে না হেসে বললেন—বাড়িতে শালা শালী কিংবা আত্মীয়স্বজনরা এলে আমি গায়ের থেকে জামা খুলতে পারি না কখনও। মোটা মানুষ। গরমে লোডশেডিং-এ দরদর করে ঘামি, তাও একটা ঢোলা জামা গায়ে দিয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে সত্যি ইচ্ছে করে নাইলনের ব্রা পরি। কিন্তু সাইজ পাওয়া যাবে না অথচ এই দুখানা বাতাবীলেবুর মতো বুক নিয়ে হাঁসফাস করি। এ যে এক কি যন্ত্রণায় পড়েছি, আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

দুঃখিত মুখ করে থামলেন শীতলবাবু। ডাক্তার কানুনগো ফাইলের

কাগজপত্রে চোখ রেখেই মাঝে মাঝে হাসির দমকে কেঁপে নড়ে উঠছিলেন। শীতলবাবু সিগ্রেট ধরাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ যেন মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন—তারপর এই দেখুন—একমাত্র মাথা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে দিনকে দিন সব চুল ঝরে যাচ্ছে। আর মুখটা তো দেখতেই পাচ্ছেন, প্রায় পেঁপের মতো শেপ নিতে চলেছে। আমি যে সত্যি এককালে সুন্দর সুপুরুষ ছিলাম...

শীতলবাবুকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার কানুনগো—মিস্টার বটব্যাল, আপনাকে সবচেয়ে আগে কোন ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন?

খুব শান্ত ভঙ্গিতে শীতলবাবু বললেন—এই যে, আপনাদের ডক্টর সান্যাল। চন্দন সুবাস সান্যাল। মাস পাঁচেক আগে উনিই প্রথম ডায়াগনসিস করেন যে আমার নাকি থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের গোলমাল থেকেই যতো কিছু হচ্ছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা হাবিজাবি যা কিছু রক্ত পেচ্ছাপ থুতু পায়খানা সবই উনি করিয়েছেন। রিসে·টলি, আপনারা স্ক্যান্ না কি বলেন তাও। ওষুধপত্রও দিয়েছেন। তবু সবকিছু নিয়ে একজন গ্ল্যাণ্ড-স্পেশালিস্ট হিসেবে আপনার কাছে রেফার করেছেন। তাছাড়া আমিও শুনেছি এইসব গ্ল্যাণ্ডের অসুখে আপনিই আমাদের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তারবাবু।

—আপনাকে আমি এবার একটু দেখবো। ডাক্তার কানুনগো ফাইল পাশে রেখে দিলেন।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। শীতলবাবু আগেই মাথা গলিয়ে তাঁর সাঁইবাবা পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললেন। বললেন—শুয়ে পড়ি ডাক্তারবাবু?

—না থাক, ঠিক আছে। ডাক্তার কানুনগো উঠে পড়লেন সোফা থেকে। ব্রীফকেস থেকে ব্লাড প্রেসার মেশিন স্টেথসস্কোপ রবার লাগানো লম্বা হাতুড়ি অপ্থালমোস্কোপ আরও কি সব টুকিটাকি যন্ত্রপাতি বার করে রাখলেন টেবিলে। মাথার চুল চামড়া কান চোখ ঘাড় গলা থেকে শুরু করে বুক বগল হাত পেট কুঁচকি...পায়ের আঙুল পর্যন্ত সব খুঁটিয়ে সন্ধানী অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেন।

যন্ত্রপাতি দিয়ে এদিক ওদিক দেখলেন। হাতুড়ি দিয়ে হাতে পায়ে ঠুকলেন। ঘরের স্তব্ধতার মধ্যে অনেকক্ষণ পরীক্ষানিরীক্ষা চললো।

যন্ত্রপাতি ব্রীফকেসে রেখে সোফায় বসলেন ডাক্তার কানুনগো। হাতে ফাইল নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন—উঠে পড়ুন লেখকমশাই। জামা পরে নিন।

শীতলবাবু উঠে পড়লেন। পাঞ্জাবির হাতা গলিয়ে বললেন—পেলেন কিছু ডাক্তারবাবু ?

—পেয়েছি তো আগেই। ফাইল থেকে চোখ তুললেন ডাক্তার। —তাও নিজের চোখে সব কনফার্ম করলাম আর একবার।

—বাহ্, খুব ভালো কথা। গদগদ হয়ে জমিয়ে বসলেন শীতলবাবু।

ডাক্তার কানুনগো বললেন—শীতলবাবু, এতোক্ষণ আপনি বলেছেন, এবার আমার কিছু কথা আপনাকে শুনতে হবে।

—নিশ্চয়ই। সেইজন্যই তো অপেক্ষা করে রয়েছি।—শীতলবাবু যেন পূর্ণচ্ছেদ না দিয়ে কথা শেষ করলেন।

ডাক্তার কানুনগো বললেন—প্রথম কথা, মিস্টার বটব্যাল—ডক্টর সান্যাল আপনার যে ডায়াগনসিস করেছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। আপনার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অসুখই হয়েছে। একটু থামলেন ডাক্তারবাবু। যেন সাজিয়ে নিলেন মনে মনে কি বলবেন। আবার শুরু করলেন—থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড অসুখের বিশেষত্ব এই যে শরীরের বিভিন্ন সিস্টেমকেই এ্যাফেক্ট্ করে। একটা চেন্-এর মতন অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, শরীরের সঙ্গে মনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বলেই কি না জানি না, শরীরের সঙ্গে মনের গতি প্রকৃতি, মেণ্টাল রিঅ্যাকশনস্, কথা বলার স্টাইল, হাঁটাচলা ইত্যাদিও থাইরয়েড অসুখ থেকে একটা টাইপ পেয়ে যায় ক্রমশঃ। ধরুন এই যে আপনার ভোরেসিয়াস এ্যাপেটাইট এবং ডাইজেস্ট করার ক্যাপাসিটি, লস অব হেয়ারস, মোটা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি যে শারীরিক ব্যাপার এবং তার সঙ্গে একটা স্ট্যাটিক এ্যাটিচুড-এ কথা বলা, এক্সপ্রেশনলেস সিরিয়াসনেস ইত্যাদি যে সমস্ত আনইউজুয়াল স্টাইলস্—এগুলো কোনোটার

জন্যই ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে আপনি দায়ী নন। লোকে আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। মিছিমিছি গালাগালিও হয়তো দেয়—কিন্তু অধিকাংশ এসব ব্যাপারের জন্য আপনি লেখক শীতলবাবু একটুও রেসপনসিব্‌ল নন। দায়ী আপনার অসুখ, আপনার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড।

—কি সাঙ্ঘাতিক কথা বলুন তো! মিষ্টি হেসে আস্তে বললেন শীতলবাবু।

ব্রীফকেস গুছিয়ে হাতে তুললেন ডাক্তার কানুনগো। আবার বললেন—শীতলবাবু, আপনি অসুস্থ, আপনি রোগী। বাইরের পরিবেশে আপনার উপযুক্ত চিকিৎসা হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি আপনাকে, আপনার ঠিকমতো চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হ'তে এ্যাডভাইস করবো। নয়তো ঠিকমতো চিকিৎসা যদি না হয়, ডোণ্ট মাইণ্ড লেখকমশাই, আমার দুর্ভাবনার কথাই বলছি। আপনার লাইফ রিস্ক্ বেড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার কানুনগো সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাতে ব্রীফকেস নিয়ে। অনেকক্ষণ কথা বলার পর রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। শীতলবাবু সরলভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পকেটে হাত দিয়ে টাকা বার করতে করতে বললেন—এ কি, আপনি উঠে পড়লেন কেন?

ডাক্তার কানুনগো ওঁর হাতের দিক লক্ষ্য করেই বললেন—না, না ছি শীতলবাবু, ওটা রেখে দিন। গলার স্বর পালটে একটু থেমে আবার বললেন—শীতলবাবু, আপনি লেখক, আপনি শিল্পী। আপনিও আমাদের গর্ব। আপনাকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে সুস্থ করে তোলা তো আমাদের কর্তব্য! তাই না? চলি।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসছিলেন দরজার দিকে। শীতলবাবুও পিছনে এলেন। দরজাটা টেনে খুলে ধরলেন। বললেন—ডাক্তারবাবু, আজ আমার খুব শুভদিন। আপনাকে এতোক্ষণ কাছে পেলাম। চোখ টেনে হাসলেন শীতলবাবু। আবার বললেন—ডাক্তারবাবু, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আর একটি অনুরোধ করবো। আপনি

কিন্তু আমায় লেখা দেবেন। যে কোনো লেখা আমি ছাপবো। দেবেন তো ভাই?

বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার কানুনগো। পিছন ফিরলেন। মহাদেবের মতো শরীর আর শ্রীকৃষ্ণের মতো হাসি নিয়ে অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শীতলবাবু। ডাক্তারবাবু হাসতে যাচ্ছিলেন, হাসি বেরুলো না। বোধহয় আরও কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। শুধু ফ্যাঁসফেসে গলায় আর বিব্রত মুখে বললেন—আজ আসি। দরজার চৌকাঠে একটা ছোট্ট ঠোক্কর খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

এ ঠাকুর আগাড়ি বুঢ্‌ঢিকো পার কিজিয়ে না বাবা।

আর একবার হেঁকে উঠলো পরসাদ অর্থাৎ প্রসাদ। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ভোর রাতে সমুদ্র স্নান সেরে মাকে নিয়ে উঠে এসেছে চরে। ভব নদী পার করাবে বাছুরের ল্যাজ ধরে, বুড়ির স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটবে। অপেক্ষা করছে কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। বাছুরওয়ালা পুরোহিতের সংখ্যা এবার কম।

—আরে এ হারামজাদা তো দেখছি মহা নেইয়াকুড়ে!

উদোম গা গেরুয়া হেঁটো ধুতি পরা দখ্‌নের পুরুতমশাই ঘন ঘন দুটো টান দিয়ে নিলেন ন্যাকড়া জড়ানো মাটির কলকেয়।—শালা মাকে বৈতরণী পার করাবে, পাপ খসাবে, তার জন্যি আবার তাড়া! চুপসে বৈঠা রহো।

কড়া ধমক দিয়ে পাশ ফিরলেন পুরুতমশাই। বিশালবপু ভোঁতামুখ নাকে নাকছাবি মাঝবয়েসী এক মাড়োয়ারী মহিলা। সাগরের নোনা জলে গা ডুবিয়ে সদ্য উঠে এসেছেন। পাতলা সবুজ শাড়ি ভিজে গায়ের ওপর লেপটে বসেছে। ফুটে উঠেছে ময়দার তালের মতো বেঢপ উঁচু উঁচু শরীরের অংশ।

পরসাদ আর একবার বালির ওপর এলিয়ে পড়ে থাকা তার বুঢ্‌ঢি মাই-এর দিকে তাকালো। কুয়াশায় ঢাকা সাগরদ্বীপের ঝাপসা অন্ধকারে বোঝা গেল না বুড়ির চোখ খোলা না বন্ধ। বাতাস উঠেছে ভোরের সমুদ্র থেকে। আকাশে এখনও চাঁদের ফালি। হাতের বালি ঝেড়ে ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলালো পরসাদ। নিজের মনেই বললো—এ বুঢ্‌ঢির তো আপসে আপ ভব নদী কি পার চলে যায়েগী!

—কা ভইল, কেয়া বোলাওতানি রে পরসাদ?—বুড়ির আঁকিবুকি কাটা সহস্র দুঃখের রেখা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে নড়েচড়ে কেঁপে উঠলো।

—কুছ নেই, তু নিদ যা।

ধোঁয়ায় জ্বালা করা লাল চোখে রগড়ালো পরসাদ। লক্ষ লক্ষ থিকথিকে পুণ্যার্থীর মাথা ছাড়িয়ে তাকাবার চেষ্টা করলো অসীম সমুদ্রের দিকে। আকাশ আর সাগরের জল মিশে গেছে বহুদূরে। ভোর হয়ে আসছে। কালো জল আর খড়ি ওঠা আকাশের মাঝামাঝি একটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাঁচা কাঠ হোগলা খড়ের ছড়ানো ছিটানো রাতের আগুন প্রায় নিভে এসেছে। তারই ধোঁয়ায় ছেয়েছে সারা দ্বীপ। পাতলা অন্ধকারে ক্রমশঃ ফুটে উঠছে উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ কিম্ভূত হাজার হাজার মানুষ আকৃতি। পাঁচমিশেলি ভাষা আর কণ্ঠস্বরের সোরগোল, গরুর ব্যা ব্যা জোয়ার আসা সাগর জলের ঢেউ আছড়ে ঝপাৎ ঝপাৎ। মুহূর্তে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বালুচর। ব্রাহ্মমুহূর্ত সবে পেরিয়েছে। পৌষের শেষ দিন। মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান চলেছে সাগর সঙ্গমে পুরোদমে।

বাছুর থেকে আর একটু বড়, একটি হাফ গোরু। তাকে সাজানো হয়েছে। গলায় গাঁদা ফুলের মালা। শিং না গজানো কপালের মাঝামাঝি লোমের ওপর চওড়া সিঁদুরের রেখা (বিবাহিতা!), দুই কানের লতির ওপর হলুদ রং, ছোট ছোট চার পায়ের চেরা ক্ষুরে আলতা। তার ল্যাজে চুলের গোছার সঙ্গে আরও কিছু রঙ্গীন সুতো বাঁধা। খয়েরি রঙ গাটি বেশ চকচকে। পুণ্যার্থীদের ভব নদী পার করে একদিন সে স্বর্গে নিয়ে যাবে—তাই মেলায় এসেছে। লোকজনের ভিড়ে ঠেলা খেতে খেতে মাঝে মাঝে সে ব্যা ব্যা করে ডাকছে। কিন্তু তার নিরীহ সরল ডাগর চোখে কোনো বিরক্তি নেই। শুধু যেন একটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা—হাজার হাজার মানুষের এই মেলায় কেবল ধু ধু বালি, একবিন্দু ঘাস নেই কেন! সারারাত ঘুরে আমার ক্ষিদে পাচ্ছে, খাবো কি? সুযোগ পেলেই সে এদিক ওদিক ছড়ানো দু এক আঁটি বিচুলি মুখে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বেশি পারছে

না। ল্যাজে টান পড়ছে। বৈতরণী পার হওয়ার জন্য কেউ হয়তো তার শীর্ণ ল্যাজটি ধরে বসে আছে। পেটটা দু পাশ থেকে ঢুকে গেছে।

পুরুতমশাই বাছুরের ল্যাজে হাতে বুলিয়ে ভিজে গা বিশাল দেহিনী মাড়োয়ারী মহিলার হাতে ধরিয়ে দিলেন। লিজিয়ে মাইজী। বাছুরটিকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—আভি পূর্ব দিকমে মুখ করকে বৈঠিয়ে।

শিড়িঙ্গে পুরুতমশাই নিজেই ভদ্রমহিলাকে ধরে খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর নির্দ্বিধায় ভদ্রমহিলার খানিকটা বেরিয়ে থাকা শরীরের অংশ নিজে হাতে ভেজা কাপড় দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে দিলেন। পুরো ব্যাপারটাই যেন পুজোর কোনো ছোট্ট একটি ব্যবস্থা পুরুতমশাই নিজের হাতে সেরে নিলেন। অস্বস্তি আর সংকোচ থাকলেও ভদ্রমহিলা কিছু বলতে পারলেন না। হাতে ধরা রয়েছে বাছুরের ল্যাজ।

পুরুতমশাই বললেন—ঠিক হ্যায়, আভি মন্ত্র বলিয়ে—। স্তনের কালচে শক্ত এবং স্পষ্ট বোঁটাটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। রাত জাগা কলকে টানা লাল চোখ, কাঁচাপাকা দাড়িওলা চোয়াড়ে গাল আর ছোপ ধরা নোংরা দাঁত দেখা গেল।

পরসাদ কটিহর সে আয়া। সঙ্গে তার 'হোগা চৌয়াশি' 'ছিয়াশি' মাকে নিয়ে এসেছে। বুড়ি খুব পাপী। গঙ্গাসাগরে স্নান না করলে তার পাপ কাটবে না। গাইকে পুচ্ছি ধরে বৈতরণী পার না হলে স্বর্গেও যাবে না কোনোদিন। বহুত রোজ পহ্‌লে বুঢ়্‌ঢি টাউনে কামিনের কাজ করতো এক কণ্ট্রাক্টরের কাছে। এক সন্ধ্যায় কণ্ট্রাক্টর উনকি ইজ্জত চোরা লিয়া, আপনা তাগত সে। পরসাদও তখন মাটি কাটার কাজ করতো, ছোটা লেড়কা। তখনও সে ফিন্‌কি বাঁশীর (সাইরেন!) এবং বোমার আওয়াজ শোনে নি। কণ্ট্রাক্টরের ধুতির ওপর দিয়ে পাছায় কামড়ে দিয়েছিল। উন্‌কা খুন দর্শন কিয়া। ছুটতে ছুটতে গ্রামে পালিয়ে এসেছিল। মাকে বলেছিল—রো মত্‌। তুহরকে সগর লে যাইবু। তারপর অনেক দিন কেটে গেল। মওকা

নহি মিলি। পরসাদ এখন রেল-এর কুলি। পিটিও পায়। আউর বহুত আদমীকে সাথ কাটিহার থেকে আওয়াজ তুলে এসেছে গঙ্গা মাই কি জয়। সগর রাজা কি জয়।

অন্যান্য লোকজন সব কোথায় হারিয়ে গেছে। সঙ্গে থাকা পুঁটলিটা কাছে টেনে নিল পরসাদ। একটা নেড়ি কুকুর ভিড়ের মধ্যে থেকে মুলো দিয়ে সেটা হাঁতড়াবার চেষ্টা করছিলো। চাপা খিদেটা সেদ্ধ ছোলার গন্ধে আর একবার চাগাড় দিয়ে উঠলো পরসাদের পেটের মধ্যে। কিন্তু মা'র ভবনদী পার না হলে খেতে পারছে না। পুরুত-মশাইকে আর একবার তাগাদা দিতে গিয়েও সে চেপে গেল। অবাক চোখে দেখলো, সেই মহিলার কোমরের কাছে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। পুরুতমশাই। মন্ত্রও বলে চলেছেন সেই সঙ্গে। বাছুরটা বোধ হয় সত্যি ক্ষেপেছে এতোক্ষণে। তার ল্যাজটা মোটা তারের মতন টান হয়ে রয়েছে। পিছন থেকে ওটা উপড়ে ছিঁড়ে গেলেও সে যেন এখন পালাতে চায়। বালির মধ্যে তার আলতা রাঙানো ক্ষুর ডুবে গেছে।

পূব আকাশ আর একটু ফিকে হয়েছে। মনে হচ্ছে খড়ির সঙ্গে মিশেছে গেরিমাটি। ভিড় উপচে পড়ছে। তার মধ্যেই যেখানে গোরুর ব্যা ব্যা আর গোদান গোদান চিৎকার সেখানে চলছে ধস্তাধস্তি বাচ্চার কান্না। কাঁচা বিষ্ঠার গন্ধ। ধোঁয়া কুয়াশা আর ভিড় জটলার মধ্যে থেকে বিক্ষিপ্ত আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে. গঙ্গা মাই কি—তথ্যকেন্দ্রের মাইকের চিৎকার বেড়েছে—শিউচরণ, আপ বড়া বাজা সে আয়ে হ্যায়, আপকা ইস্ত্রি রমলা দেবী···। ঘোষণা চলেছে বা লাতেও—মায়া দেবী, আপনি সোনাগাছি থেকে এসেছেন। আপনাব জন্য সীতা-দেবী—। জোয়ারের জল বাড়ছে। হুড়োহুড়ি বাড়ছে। গাঁদাফুলের মালা ভেসে আসছে ঢেউ-এ।

পরসাদের ঠিক গায়ের কাছেই ঠেলাঠেলিতে কার ঝোলা থেকে গোটা চারেক গুড় মাখানো গোলারুটি ঝপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই এক ভিখারি সেগুলো তুলে নিয়ে তার ওপর থেকে ধুলোবালি ঝাড়তে লাগলো। আশ্চর্য সাগরদ্বীপে একটাও কাক নেই! পুরুত-

মশাই মন্ত্র বলতে বলতেই কাকে গালাগালি করে উঠলেন—এ হারামি, দেখতো কেয়া? ভাগ না হিঁয়াসে। বুড়বক কাঁহিকা। পরসাদ এই সুযোগটা ব্যবহার করলো। বললো—এ ঠাকুর, আভি লাগা দিজিয়ে না বুঢ় টিকো। উনকি হাতল তো দেখিয়ে!

বুড়ির কি হাল ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু পুরুতমশাই তাঁর কলকে থেকে মুখ সরিয়ে আড়চোখে একবার দেখলেন। লাল চোখ আর ঝোলা ঠোঁটে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন বুড়ির দিকে। চরের ওপর ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি আর চিৎকার বেড়েছে। ঠাসা ভিড়ের মধ্যে মুহূর্তে নিজের লোক হারিয়ে যাচ্ছে।

জনা পনেরোর একটি দেহাতী দল স্নান সেরে উঠে আসছিল। তারা কচু বেড়িয়ার বাস ধরার জন্য এখনই লাইন দেবে। তবে যদি দুপুর নাগাদ উঠতে পারে। পাছে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, সেই ভয়ে তাদের দলের প্রথম এবং শেষ লোকের হাতে ধরা ছিল একটি গোরুর দড়ি। বাকীরা সবাই একহাতে সেই দড়ি আঁকড়ে কোনোমতে সারি দিয়ে চলেছিল। কোথা থেকে এইসময় গলায় শিকল বাঁধা একটি কালামুখ হনুমান লাফিয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে লুটোপাটি লেগে জট পাকিয়ে গেল। ঠেলাঠেলি ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল। আর টানাটানির মধ্যে চাপে দেহাতী দলের সেই দড়িটি গেল ছিঁড়ে। হুড়মুড় করে বেশ কিছু পুরুষ এবং মহিলা টাল সামলাতে না পেরে চিৎপটাং হয়ে পড়লো এর ওর ঘাড়ে পিঠে।

পরসাদ তার বুঢ়ি মাইকে বাঁচাবার জন্য, তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লো। মার শরীরের দুপাশে তার হাত আর পা খাটিয়ার মতো রেখে উঁচু হয়ে রইলো। দু একজন তার ঘাড়ে পিঠে পড়লো। আর এই চাপের মধ্যেই একটি শিশু ছনছন করে হিসি করে ফেললো পরসাদের পিঠের ওপর। কিছু করার নেই। তার বুড়ি মা চুপচাপ পড়ে ছিলো বালির ওপর যেমন ছিল। পুরুতমশাই ইতিমধ্যে সেই বিশাল দেহিনী মহিলাকে বাঁচাবার জন্য জাপটে চেপে ধরেছেন আর সেই ফাঁকে ল্যাজ এবং দড়িতে ঢিলে পড়ায় বাছুরটি উধাও। হৈ

হল্লা গোলমালের মধ্যে শোনা যাচ্ছিল সেই মাড়োয়ারী মহিলার গলা—আরে আপ কেয়া কর রহে হো, কেয়া কর রহে হো।

ধস্তাধস্তি একটু কমলেই পুরুতমশাই এদিক ওদিক তাকালেন। বাছুরটিকে ত্রিসীমানার মধ্যে দেখতে পেলেন না। কিন্তু পরসাদের বুড়ি মাই-এর দিকে তাকাতেই তার খোলা চোখ দুটি স্থির হল। ওপর থেকে নিচে চোখ বোলালেন।

বুড়ির ফোকলা মুখে সামান্য ফাঁক। শুকনো ঠোঁটের ওপর কয়েকটা মাছি। ঢিলে দু'খানা গাল চুপসে ভিতরে ঢুকে গেছে। ফ্যাকাশে দুই চোখ আধবোজা। পিচুটি কেটেছে। দুপাশে কখন গড়িয়ে পড়েছে জলের রেখা। কণ্ঠার হাড় উঁচু। সমতল বুকের ওপর এক চিলতে কাপড়ের ফালি। পেট উন্মুক্ত স্থির, কোঁচকানো চামড়া একদিকে হেলে পড়েছে। কাপড়ের নিচে বেরিয়ে থাকা দুটি পা গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা এবং গোল। বোঝা যায় টিপলে বসে যাবে। আঙুলের ফাঁকে হাজা। রস কাটছে। তার ওপর লেগে রয়েছে বালি। সমুদ্রে স্নান করার পর জল শুকিয়েছে গায়ে। নুন ফুটে উঠেছে এখানে সেখানে।

পুরুতমশায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে পরসাদও তাকিয়েছিল তার বুড়ি মাইর দিকে, এবার সে বিস্মিত ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে উঠলো—কেয়া হো গিয়া, এ ঠাকুর?

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পুরুতমশাই। আর হেঁড়ে গলায় হঠাৎ শূন্যে দুহাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন—গঙ্গা মাই কি জয়!

একটু থেমেই আবার চিৎকার—আদমী লোগ সব দেখ যাও গঙ্গা মাই কি কিরপা, বুড়ি মাই ভব নদীর পার চলা গিয়া।

চিৎকার করতে করতেই শিড়িঙ্গে বুড়ো পুরুত যেন এক উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দিলেন। বালি ছিটকে পড়লো চারপাশে। ঠেলে ঠুলে সরিয়ে দিলেন দু একজন জায়গা ফাঁকা করার জন্য। এ্যাই সব হঠ যা। দেখ যাও ভাই, আদমী লোগ সব দেখো আউর পুণ্য করো—গঙ্গা মাই কি কৃপা ভব নদী কি পার—।

মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ের ভিতরেই জমাট বেঁধে গেল আর একটি ভিড়। চিৎকার চলছে, নৃত্য চলছে। ভিড় বাড়তে লাগলো। পড়তে লাগতে পয়সা। মুখে মুখে যতো খবর ছুটছে, মুঠো মুঠো পয়সাও ততো পড়ছে। পুরুতমশাই নিচু হয়ে পয়সা কুড়োচ্ছেন আবার হাত তুলে চিৎকার করতে করতে লোক ডাকছেন। যেন মাদারিকা খেল, আযা আযা।

দিশেহরা পরসাদ তার ভাঙ্গা গলায় এ ঠাকুর, বলে পুরুতমশাই-এর হাত ধরে কিছু চাইলো। এক ঝাঁক খুচরো পয়সা তখনই তার চোখে মুখে এসে পড়লো। সে আর কিছু বলতে পারলো না। গলা শোনা গেল পুরুতমশাইয়ের।

—আরে উল্লুক, পয়সা উঠা লে। তোর মাইজী পটল তুলেছে। দেখ যাও ভাই গঙ্গা মাই কি···। সময় নেই পুরুতমশায়ের, পরসাদের হাত ছাড়িয়ে চিৎকার শুরু করলেন আবার।

ধস্তাধস্তি চলেছে জোর। চিৎকার বেড়েছে। সাগরদ্বীপে এমন দিনে মৃত্যু মানে মোক্ষলাভ, সোজা স্বর্গ। দেখলেও পুণ্যি। ধুলো উড়তে আরম্ভ করেছে। কপিল মুনির মন্দিরে না গিয়ে লোক ভিড় করছে সেখানে। পরসাদের দো-আঁশলা ভাঙ্গা গলা শোনা যাচ্ছে। কান্নায় ডুবে যাচ্ছে। আবার নিষ্ফল আক্রোশে সে থুতু ফেলছে বালির ওপর।

হে মাইজী তু কিধর চলি গই। তু তো গাই কি পুচ্ছি নহি পাকড়ি। আভি মেরা কেয়া হোগা। ইয়ে সাগরদ্বীপ খতরনাক হই। তু ক্যায়াসে ভব নদী কি পার যায়েগী···

সূর্য ওঠার কথা এতোক্ষণে, কিন্তু ওঠে নি। ময়লা মেঘে আকাশ ঢাকা। চাপ চাপ কুয়াশা ঘিরে রেখেছে দ্বীপটা। কাতারে কাতারে মানুষ এখন চলেছে উজানে। সাগর থেকে ফেরার পথে। তিন-চার জন কনস্টেবল ভিড় ঠেলে ঢুকেছে। একটা স্ট্রেচারে পরসাদের বুঢ়্টি মাইকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় তারা পুঁটলিটাও তুলে নিয়েছে।

পুরুতমশাই কোঁচড় ভর্তি খুচরো পয়সা নিয়ে ভিড়ে মিশে গেছেন এক ফাঁকে। পরসাদ ক্ষীণ গলায় কেঁদে চলেছে তখনও। তার হাতে মায়ের লাঠিটাই এখন একমাত্র সম্পত্তি। গোটা আষ্টেক ভিখারী তার আশেপাশে বসে গেছে। তারা মুঠো মুঠো বালি তুলে অতি-পাতি করে পয়সা খুঁজছে। মাঝে মধ্যে পাচ্ছেও দু একটা।

পরসাদ উঠে পড়লো। তার চোখ লাল। সারা গায়ে বালি, উসকো খুসকো চুল। হাতে মায়ের লাঠি। সেদিকে চোখ পড়তে কান্নার দমক এলো আর একবার।

চোখ ভিজে গেল। জোয়ার শেষ হয়ে আসছে। জলের দিকে চললো পরসাদ। বুক ফাঁকা হয়ে গেছে। বালি আর লোমে জট পড়া সেই বুকটায় হাত বোলালো। সব লোক উঠে আসছে জল থেকে। তখনই পরসাদ আর একবার জলে নামলো। হাঁটু পর্যন্ত জলে ঢেউ কমে এসেছে। অনুভব করলো তার পায়ের তলা থেকে সুরসুর করে বালি সরে যাচ্ছে। ভেবে পাচ্ছিল না সে এখন কি করবে! প্রচণ্ড ক্ষোভ আর রাগ পাক খেয়ে উঠলো তার মধ্যে। এই সাগরদ্বীপ এই ভব নদী পার এই ধর্ম এ তীর্থ সব কিছু তার মনে হল, তার মাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সে তার মার লাঠি দিয়ে একটি উন্মত্ত পাগলের মতো সপাং সপাং করে মারতে লাগলো জলের উপর। তারপর একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে যতোদুর পারে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের মনে বললো—ই সব ঝুট তামাসা…এহ গঙ্গা সাগর কি পানি ভি গন্ধা!

দুপায়ে সাগরের নোনাজল ঠেলতে ঠেলতে পরসাদ উঁচু চরের দিকে উঠতে লাগলো।

মানুষ, আপনি কেমন আছেন!

অনেক আগে তুমি বলতাম। এখন আপনি বলি। শুধু আপনি? ভুলে গিয়ে মাঝে মধ্যে স্যার-ও বলে ফেলি। আপনি কি ভাল, আপনি কত্তো বড়, আপনি কি মহান সুন্দর মানুষ! আপনার গায়ে জল কাদা লাগে না। পায়ের তলায় ধুলো থাকে না। মনে কোন ক্লেদ জমে না। আপনি আমায় দেখলেন। ভ্রূর টানে চোখের পাতা অল্প তুলে হাসলেন। কি যেন ভাবতে ভাবতে শূন্যে ডান হাত ঘোরালেন। অর্থাৎ, ড্রাইভার, তুম্ আভি চলা যাও।

আপনি খুব বুদ্ধিমান, ভদ্র এবং মার্জিত। আমায় কিছু বলা উচিত। কেননা, এখন আমাকে আপনার এখানে ছ্যাখার কথা নয়। অথচ আমি হাজির। কেন, কি উদ্দেশ্যে? আপনার মাথার রঙিন তরঙ্গ আবার হাত নাড়ায় আমার দিকে।

—কি ব্যাপার, এত রাত্তিরে?

আপনার ঠোঁটের কোণায় বুদ্ধদেব কিংবা নিমাইয়ের হাসি। আঙুলে পাথুরে ঝিকিমিকি। গলায় জার্মানী পিয়ানোর মিষ্টতা। চাঁদের আলো আপনার মাথায় মুখে গায়ে পড়ে, পিছলে মুখ লুকালো মেঘের পিছনে।

এখন রাত্রি গভীর। মানুষ ঘুমিয়ে থাকে বাঁধান ফুটপাথে। নেড়াকুকুর জায়গা পায় না। শুয়ে থাকে ডাস্টবিনের পাশে ছাইগাদায়। আলস্যে অচেনা শব্দে বেসুরো দীর্ঘ গলায় ডাকে ঘেউ—। লাল বাতি জ্বেলে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ময়লা তোলে কর্পোরেশনের মেথর। ভারি ট্রাক হুসহাস ছুটে চলে যায় হেড লাইট জ্বেলে। আপনাদের এ রাস্তায় পাবলিক ভেহিক্‌ল ঢোকে না। সরকারী নিষেধ আছে।

আপনার মাথায় কঠিন জটিল মানসিক জট। তরলে নরম হয় এই বিশ্বাসে আপনি তরলসেবী। তবে তাল কাটে না। চকিতে মাথার বিদ্যুৎ, আলো ছড়ায় আপনার মুখে, আমার বুকে। আজ বুক বেঁধেই এসেছি। আপনাকে দেখব। অনেক দিন দেখিনি। আপনি কুশলী শিল্পী কর্মব্যস্ত মানুষের উদাহরণ। অনেকদিন মানুষ দেখি নি।

মানুষ, আপনি কেমন আছেন? ভয়ানক দ্যাখার সাধ হয়েছে। সময়ের হিসাব তাই গোলমাল করে ফেলেছি। তাতে কি? সব কিছু হারিয়ে ফেলে আবার ফিরে পাওয়ার দাবী নিয়েই ত এসেছি। দু চোখ ভরে দেখে, দুহাত ভরে নিয়ে চলে যাব। জানি ত. আমার এই অসময়ের দ্যাখা, আপনার কিছু সত্যের আলো ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। নিয়মের সময়ে কি আসে যায়। আমরা কেউ কি সত্যি সত্যি বুকের চেতনে তার পরোয়া করি?

আপনি এগিয়ে আসছেন। আসুন, আরও কাছে আসুন। না কোন মধ্যরাত্রির ইমোশন নেই। আমার হাতদুটো ধরবেন? ভীষণ শক্ত করে গরম করে আমাকে পুরোপুরি টলিয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে। দ্বিধা, সংকোচ আড়ষ্টতা? জানি আপনার নেই। এই মুহূর্তে আপনার-আমার শারীরিক স্পর্শ, শ্বাস প্রশ্বাসের আদান প্রদান চকিতে অন্তর্দৃষ্টির নীরব বিনিময়—সমস্ত পাথর গলিয়ে দেবে। পৃথিবীর আকাশে ফুটে ওঠা যুঁইফুল তারা আমাদের পরম সত্যের চিরন্তন সাক্ষী হয়ে মিটমিট করে জ্বলবে। আমি সার্থক হব। আপনি মহান, মানব। আরও কাছে আসুন।

আপনি কাছে এসে পড়ছেন। এবার আমিই এগিয়ে যাই আপনার কাছে। আপনাকে অপূর্ব দ্যাখাচ্ছে। আপনার কব্জিতে সবুজ রেডিয়াম জ্বলছে। আপনার ধবধবে সাদা পোশাকে অন্ধকার পরাজিত। আঙুলে নক্ষত্রেরা ঝিলিক দিচ্ছে। এখন বাতাস বহে না।

একি! আপনার স্পর্শ এত কঠিন অকরুণ কৃত্রিম কেন?

না, এ আমারই ভুল। বিশ্বাস করুন, মুহূর্তের এই অসতর্ক নোংরা ভাবালুতার জন্য আমি নিজেকে ধিক্কার জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাসে

সত্যি কোন চিড় ধরেনি। এই ত, আপনার স্পর্শ, আমার স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত আপনার গলার গন্ধ, অজান্তে আমার পা মাড়িয়ে ফেলায় আপনার শরীরের ওজন, আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট আপনার শব্দোচ্চারণের ভঙ্গি এবং তরঙ্গ …সবকিছুতে আপনি ক্রমশ উজ্জ্বল, আমার চিরসত্যের বাস্তব রূপায়ন হয়ে উঠছেন। পেয়েছি, আপনাকে পেয়েছি।

যাব আপনার সঙ্গে? হ্যাঁ, যাবই ত। শুধু ঘরেই নয়, আপনার বুকের কাছে। যতটা কাছে যাওয়া যায়। জানি ওখানে আমার জায়গা আছে। কেউ নিতে পারবে না। বেদখল হবে না। একটু হলেও ছিনিয়ে নেব। রক্তস্রোত প্রবাহিত হলেও আমি ঐ রক্তের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হব। আপনি রেখেছেন না! আজ এই অসময়ে বুক বেঁধে এসেছি। কতদিন মানুষ, আপনাকে দেখি না। মানুষ, আপনি কেমন আছেন?…কেমন আছেন?

ছি, ইমোশান! আমি বড় হয়েছি। পুরুষ্ট গোঁফ। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় পূর্ণ অধিকার। উৎপাদনে সক্ষম। চপলতা দেখিও না। এক্ষুনি এতটুকু হয়ে যাবে। আবার কোলে হিসি করবে, দুধ খাওয়া জিভ দিয়ে কানের লতি চুষবে, ঘুমিয়ে পড়বে। ফিরে এসো, এই ঘরে এই রাতে।

আপনি আমাকে এতটুকু করে দিন। খুব কাছে টেনে নিন। আজকে একসঙ্গে, এক বিছানায় শোব। এক বালিশে মাথা রাখব। আপনার রুটি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে খাব। আমি জানি, আপনি ঠিক বুঝে ফেলছেন, তাই আমি অসময়ে, কুকুর-ঘুমোন রাত্তিরে আপনার কাছে এসেছি। আজ থাকব। না, না ওভাবে নয়। ওভাবে এখন কি আর নিতে পারি? আমার কান ধরুন, চুলের মুঠি ধরে নাড়া দিন। আপনার গলা থেকে উগ্‌রে তুলে আনা ভাতের দলা আমার মুখে গুঁজে দিন। আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না, সারাদিন খাই নি? পৃথিবীর মানুষের অবয়বের ওপর যুগান্তরের অভিমান রেখে নিশুতি রাত্রে আপনার হাত থেকে ভাত কেড়ে খেতে এসেছি? সব সত্যের পরেও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্যে আরও যেন কি একটা রেশ থাকে তাই

অন্বেষণ করতে এসেছি আপনার অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসের গভীরে, কোষে কোষে। আপনি সেই মানুষ, সেই অন্য সত্য। সেই আপনাকে আমি পাব।

কিন্তু ওভাবে কেন? আপনি কি পারছেন না? মানুষের অবয়ব হ'য়ে আপনিও....

না, না তা হয় না। আপনি ভদ্রতা করছেন কেন. ফর্মালিটি করছেন কেন? এই গভীর রাত্রে কাউকে একা ছেড়ে দেয়া যায় না— এই বোধ এব· বোধ থেকে কর্তব্য করতে চাইছেন কেন?

আপনি কেন আপনার স্পর্শ গন্ধ থুতুর শক্তি দিয়ে আমাকে গামছা করে নিংড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন না আপনার বিছানায়. কিংবা মাটিতে, পায়ের তলায় ধুলোয়? মানুষ. মানুষ আপনি কেমন আছেন? কেমন আছেন···?

সাবালক স্থির হও, ধীর হও। তোমার অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করো না, কপালের ঘাম মুছে ফেল। পকেটে রুমাল আছে? খিদে পেয়েছে? ভাত ডালের খিদে? সব আছে, সব পাবে।

আপনার খাওয়া হয়ে গেল কুলকুচি করে মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেললেন আমি বেদী? এখন· রক্তের উষ্ণতার মধ্যে পুষে রাখতে চাই সেই ঘাড়শক্ত ব্যক্তিত্ব শব্দের পোষ না মানা পাখিটা!

কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। রাত্রি ত কি। ঠিক পৌঁছে যাব। আপনি কি মহান কি সুন্দর, কি গণতন্ত্রী! আমাকে অপমান করেন নি, আঘাত করেন নি। আপনার ঘামের গন্ধ শোঁকান নি, চুলের মুঠি ধরে পায়ের তলায় ধরে রাখেন নি। আপনার সামান্য চিকেন স্যুপের বাটিটা জোর করে আমার মুখে ঢালতে আসেন নি। আমার জামা নষ্ট হওয়ার দিকে আপনার লক্ষ্য ছিল। আমিই দেখতে পাই নি।

আপনি অন্ধকারের দিকে উদার হস্ত প্রসারিত করেছেন। রাত্রি গভীর। ডাস্টবিনের ছাইগাদায় অলস নেড়ী কুকুর ঘুমচোখে দীর্ঘ ডাক ছাড়ে ঘেউ— ক্লেদহীন মহাপুরুষ, মহামানব আপনি. বিশাল সত্যের

অন্ধকারে আমাকে স্বাধীনতার আলো খুঁজতে পাঠিয়ে দিলেন—যাও। রাস্তা পেয়ে যাবে। আপনার আঙুলে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি।

আমার বুকের ওপর পাহাড় কেটে আরও রাস্তা তৈরী হবে। নাকে আপনার ঘাড়ের গলার গন্ধ, জিভে আপনার কানের লতির স্বাদ। মানুষ, আপনি কেমন আছেন? কেমন আছেন?

মন্ত্রীমশাই জঙ্গলে

আজবপুরের মাননীয় অরণ্য-মন্ত্রী জঙ্গলে যাবেন। আন্তর্জাতিক পশুবর্ষ উপলক্ষে তিনি বন্যপ্রাণীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। জীবন বিপন্ন করে, ভয়ংকর সব জন্তুজানোয়ারের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন মন্ত্রী-মশাই।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছপালা ঝোপঝাড় কেটেছেঁটে খানিকটা পরিষ্কার করা হল। তৈরি হল ছোট্ট এক মঞ্চ। অনেক দূরে ফরেস্ট অফিসারের কোয়ার্টার্স থেকে বিদ্যুতের তার টেনে আনা হল। লাইট, মাইকের বন্দোবস্তও পাকা।

জঙ্গলের পশুরা এমন ঘটনা আগে ঘটতে দেখেনি। দুদিন ধরে লুকিয়ে-চুরিয়ে তারা সব কাণ্ডকারখানা লক্ষ করল। জায়গা পরিষ্কার, বাঁশ পোঁতা, ছাউনি টাঙানো, সব দেখল আড়াল-আবডাল থেকে। কিন্তু সন্ধেবেলা হঠাৎ যখন পরীক্ষা করার জন্য জোরালো আলো জ্বলল, জীবজন্তুরা সব অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল। এ আবার কী ব্যাপার রে বাবা! গাছের মাথায় পাখির ছানারা চিঁ চিঁ করে উঠল। হাতি শাঁখ বাজাল, খরগোশ বেচারা ছোটাছুটি করে পালাতে লাগল, বাঘ-সিংহের বুক টিপটিপ করতে লাগল। খুব স্বাভাবিক। জংলি জীবনে তারা সূর্যের আলো আর জ্যোৎস্না ছাড়া আলো দেখেনি। নীরবে তারা সব অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা যাক আর কী কী ঘটে! উত্তেজনা বিস্ময় আর কৌতূহলে সবাই সচকিত।

পর দিন বনে মন্ত্রী-মশাই এলেন। জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, ততদূর মোটরগাড়ি আসে। কিন্তু তারপর? মন্ত্রী-মশাই গাড়ি থেকে নেমে তাঁর লোকজনদের বললেন, "চলো হে, একটা

দিন না হয় সকলে বনের পথে হেঁটেই যাই। কতই বা দূর আর? তাছাড়া জীপগাড়ির আওয়াজে আমাদের পশু-ভাইয়েরা ভয়টয়ও পেয়ে যেতে পারে।"

সার বেঁধে সবাই তখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চললেন মিটিং করতে। মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পি. এ. আর সেক্রেটারি তো আছেনই। আরও আছেন কয়েকজন বন্দুকধারী সেপাই। বলা তো যায় না, বনজঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি কোনো গোলমাল বেধে যায়।

শীতের ছোট বেলা। তিনটের মধ্যেই সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। নিস্তেজ রোদে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে ওঁদের বেশ লাগল। খানিক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সভার মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন। মন্ত্রী-মশাই আসবেন বলে আগে থাকতেই সেখানে কিছু লোকজন ছিলেন তাঁরা ফুলের মালা পরিয়ে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর মঞ্চের ওপর বসালেন। খুব খুশি মন্ত্রী-মশাই। গভীর অরণ্যেও এমন চমৎকার সভার আয়োজন তাঁর খুব পছন্দ হল।

দিনের আলো তখনও রয়েছে। তবু স্থানীয় একজনকে ডেকে মন্ত্রী বললেন, "এক কাজ করুন; আন্তর্জাতিক পশুবর্ষে আমরা যে জঙ্গলের পশুপাখিদের জন্য সত্যই কিছু করতে চাই, এটা ওদের বোঝানোর জন্যই সব লাইটগুলো জ্বেলে দিন। তারপর বরং সভার কাজ শুরু করা যাবে।"

গাছপালার মাথায় সবে অন্ধকারের একটু ছোঁয়া লাগছে। তখনই একসঙ্গে অনেকগুলো বড় বড় আলো জ্বলে উঠল জঙ্গল উদ্ভাসিত করে। খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন মন্ত্রী। একজন তাড়াতাড়ি মঞ্চের উপর উঠে মাইক ধরে, হ্যালো মাইক টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রী·· বলে টেস্ট করলেন। গমগমে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল দিক্‌বিদিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই, হঠাৎ অনভ্যস্ত আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়ে সব পাখিরা গাছের ডালপালা ফাঁক-ফোকর ছেড়ে ডানা ঝাপটিয়ে প্রচণ্ড কিচিরমিচির করে উড়তে লাগল।

মন্ত্রী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "থাক, থাক, আর টেস্ট করতে হবে না। সব ঠিক আছে। এখনই আমি বক্তৃতা শুরু করব।"

সেক্রেটারি তখন এগিয়ে চাপা গলায় মন্ত্রীকে বললেন, "কিন্তু স্যার, বক্তৃতা যে করবেন, আমাদের শ্রোতা জীবজন্তু-ভাইয়েরা কেউই তো এখনও আসেননি।"

মন্ত্রী আবার বিরক্ত হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "এদিকে যে অন্ধকার হয়ে আসছে। সারা রাত কি এই জঙ্গলে বসে থাকব? এখনই মশা ছিড়ে খাচ্ছে।" গলার স্বর পালটে নিয়ে মন্ত্রী আবার বললেন, "আমার বক্তৃতা তো শুরু করে দিই, তারপর দেখা যাবে জীবজন্তুরা সব আস্তে আস্তে জড়ো হয়েছে। ভালবাসা দিয়ে সকলকেই কাছে টানা যায়।"

মন্ত্রী-মশাই উঠে দাঁড়ালেন। হাতের কাছে মাইক। দু চোখের সামনে খোলা ফাঁকা জায়গা। দু-একজন সেপাই এদিক-ওদিক বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বড়-বড় আলো জ্বলছে।

মন্ত্রী-মশাই আরম্ভ করলেন, আমার প্রিয় বন্য পশুপাখি বন্ধুগণ, আন্তর্জাতিক পশুবর্ষ উপলক্ষে আজকের এই উজ্জ্বল সন্ধ্যায় আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"

গমগমে আওয়াজ শুনেই আবার হাজার-হাজার পাখি ডানা ঝটপট করে উড়তে লাগল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কিচিরমিচির ডাকে কান ঝালাপালা করে দিল। পালক উড়ে এসে পড়ল সামনের ফাঁকা মাঠে।

মন্ত্রী-মশাই এবার বেশ বিরক্ত হলেন। কিন্তু তিনি দমে গেলেন না। পাখিদের ওড়াউড়ি একটু থামতেই আবার বললেন, "জীবজন্তু ভাইয়েরা, আজকের এই শুভলগ্নে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এই জঙ্গলের মধ্যে দিনের পর দিন আপনারা কীরকম কষ্ট করে…"

গলা চাপা পড়ে গেল মন্ত্রী-মশাইয়ের। কোথায় গেল পাখিদের ডানা ঝটপট, কঁ্যা কঁ্যা ছাড়াও এবার হুক্কা হুয়া, কোঁয়া কোঁয়া, ফরর-ফরর এই রকম নানা রব উঠছে। এদিক-ওদিক তাকালেন মন্ত্রী। মনে হল তাঁর বিরক্তির সঙ্গে এবার কিছু ভয় মিশেছে। তাঁর লোক-

জনেরা সজাগ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখছেন। কিন্তু বক্তৃতা থামিয়ে দিলে মন্ত্রী-মশাইয়ের মান থাকে না। একটু ইতস্তত করে তিনি গলায় মধু ঢেলে ফের শুরু করলেন। "পশু ভাইয়েরা আমরা আপনাদের জন্য ঘর বানাব। নোংরা জলপান করে আপনারা অসুস্থ হন। আমরা পরিষ্কার মিঠে জলের পুকুর কাটাব। আপনাদের চিকিৎসার জন্য..."

অসম্ভব। শত-শত বন্যপ্রাণীর গর্জন আর পাখিদের ডাকে মন্ত্রী-মশাইয়ের কথার একবর্ণও আর বোঝা গেল না। আর ক্রমশই আওয়াজ বাড়ছে এবং এগিয়ে আসছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু ছাড়া সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। মন্ত্রী-মশাইয়ের মনে হল ঐ অন্ধকারের মধ্যে লাল সবুজ বাল্‌বের মতন কিছু বন্যপ্রাণীর চোখ তিনি দেখতে পেলেন। হয়তো বন্দুকধারীদের দেখে তারা সামনে আসছে না, কিন্তু কাছে-পিঠেই ঘোরাফেরা করছে আর গর্জাচ্ছে। ভয়ার্ত চোখে মন্ত্রী দেখলেন, তাঁর দলের লোকজনেরাও আতঙ্কিত। বোধহয় পালাবার মতলব আঁটছে। বলা যায় না, তিনি বক্তৃতা না থামালে হয়তো তাঁকে ফেলে রেখেই দৌড় দেবে। শীতেও মন্ত্রী-মশাইয়ের কপালে ঘাম দেখা দিল। পা কেঁপে উঠল। আর ঠিক তখনই খুব কাছের থেকে গম্ভীর মেঘের গর্জনের মতো একটা হাড়-কাঁপানো আওয়াজ সকলের কানে এল। হালুম!

মন্ত্রী-মশাই এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। নিজের ধুতি গুটিযে পিছন ফিরেই মঞ্চ থেকে একলাফ। একেবারে মাটিতে। কোনোমতে দাঁড়িয়ে উঠে রেগে বন্দুকধারীদের বললেন, "কী করছ তোমরা অতদূরে দাঁড়িয়ে! এখনও বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে! এসো তাড়াতাড়ি এদিকে। কিস্সু নেই তোমাদের মাথায়!"

অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, "চলো হে, চলো সব তাড়াতাড়ি। কাছে-কাছে থাকো" ভয় রাগ আর ঘেন্না একসঙ্গে মিশিয়ে মন্ত্রী-মশাই বললেন, "জন্তু-জানোয়ারগুলো আর মানুষ হল না। যত্তসব অশিক্ষিত, মূর্খ! কে এদের ভাল করবে!"

বিকার কিংবা এই সত্য-দর্শন

জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম কেউ এসে আমার কপালে একটা ঠাণ্ডা হাত রাখুক। জানি, তা কেউ রাখবে না এই মুহূর্তে। তবু ঐটুকু ভাবতে পেরেই আমার বেশ আরাম বোধ হল। চোখের পাতা আপনি বুজে এলো। গলা দিয়ে অজান্তেই শব্দ বেরিয়ে গেল—আহ্।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। '-একবার বৃষ্টি পড়েছে টিপটিপ করে। এখনো মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উড়ে আসছে জানালা দিয়ে। তাও বন্ধ করি নি। তা হলে আর রাস্তা দেখতে পাব না। লোক-চলাচল দেখতে পাব না। তুমি যদি আস, আগে থেকে তোমাকেও দেখতে পাব না।

পাখা চালাই নি। একবার ভেবেছিলাম কাঁথাটা গায়ে টেনে নিয়ে আস্তে পাখাটা চালিয়ে দেব। তাও দিই নি। পাখার হাওয়ার কথা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। বেশি জ্বর থাকলেই হয়তো ওরকম হয়। হোক্‌গে। বেশি জ্বরের আরামটাও নেহাত কম নয়। ম্যালেরিয়া হলে আরো ভালো। আজকাল ও কেবলই হচ্ছে!

হরিকে দিয়ে ওয়ার্ডেন অবশ্য এর মধ্যেই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। জাহান্নামে যাক। ওষুধ আমি ছোঁবও না। তবে আমি জানি, আমাকে সুস্থ করার পেছনে ওর নিজেরও একটা দুরভিসন্ধি আছে। ও নিজে না যাতে আক্রান্ত হয় সেই জন্যই এত দরদ, এত প্রম্প্‌ট্। কেননা, আগের যে তিনজনের হয়েছিল, তাদের ও বাড়ি পাঠাতে পেরেছিল। কিন্তু আমি যে কিছুতেই কোথাও যাব না, তা ও জানে। ওর ধারণা আমার বাড়ি অনেক দূরে। যেতে হলে শেষপর্যন্ত খানিকটা গোরুর

গাড়ি কিংবা হেঁটে যেতে হয়। এখন সেখানে বন্যা হয়েছে। তাই বাকী অনেক ছেলে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি চলে গেলেও আমার যাওয়ার উপায় নেই।

ওয়ার্ডেন তো জানে না, আমার একটা বাড়ি কত কাছে। বোধ হয় ভুল বললাম। আমারই বাড়ি কি? কিন্তু ওখানে খবর পৌঁছে গেলে আমার একটা যাহোক ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। কিন্তু কে করবে। একমাত্র আমি ছাড়া এখানকার আর কেউ সে ঠিকানা জানে না। আর আমি নিজেব থেকে সেখানে যাব না, কাউকে বলবও না।

তবে আর-একটা কথা আছে। আমি যে জ্বর কমার ওষুধ না খেয়ে আরাম উপভোগ করব, তাও অন্যের জানার কথা নয়। একরকম উদ্ভট খেয়াল আমার কারুর হয় নাকি?

হ্যাঁ হয়। এই যেমন আমার। বেশি করে আমি একটা অদ্ভুত আমেজ পাই। তলিয়ে যাওয়ার মাদকতা আছে। গায়ে শিরশিরিনির কাঁটা, হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙার আরাম। এমন-কিছু নিশ্চয়ই নয় যে একেবারে মরে যাচ্ছি। মরতে আমার বড়ো ভয়।

ওই যে এখনো দেখতে পাচ্ছি রাস্তায় ঠুনঠুন রিকসা চলছে। পথঘাট ভিজে ভিজে। ট্যাক্সিও চলছে দু-একটা। কী অবস্থা রাস্তার! যেন পোকায় কাটা পুরোনো লম্বা একটা কাপড় পাতা। আকাশের যা চেহারা হয়তো আবার বৃষ্টি নামবে। প্রহ্লাদের চায়ের দোকানটা আজও বন্ধ। কি করবে বেচারি! টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে ওর দোকানের সামনেও একহাঁটু জল। কালকে থেকেই মোটামুটি জল সরছিল। আজকে তো বেশ ডাঙ্গা বেরিয়েছিল।

কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে আবার ঢালবে। সত্যি, বৃষ্টি আর জলে জলে একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে ছাড়ল।

আহ্-হা রিকসাটা হড়কে গাড্ডায় পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই রেশন তুলে ফিরছিল। গেল এক সপ্তাহের পুরো চাল গম চিনি। যাকগে বাপু, আর ঝগড়া করে কি করবি। ওরও দোষ নেই। হোঁচট খেয়েছিল বলেই তো! ইচ্ছে করে ফেলে দেয় নি।

ছাখো আবার কাণ্ড! পাগলা বিশুটা এর মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। সারাদিন সময় হয় নি, এখন আকাশের অবস্থা ক্রমশঃ যত ঘোরালো হয়ে উঠেছে, ওনার তখন বেড়াতে বেরুবার সময় হল। কি আনন্দ! আবার শূন্যে আঙ্গুল তুলে চ্যাচানো হচ্ছে—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে, ধান গেল ছড়াছড়ি—

বিশুটা পাগলা হলেও, কী অসভ্য! লোকটার সারা সপ্তার রেশন উলটে পড়ে গেছে, আর উনি সেদিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসছেন। অদ্ভুত বদমাইস ছোঁড়াটা। রিকসাওয়ালাটাকে ভ্যাংচাচ্ছে। নিজের পেটের ওপর থেকে জামা তুলে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকটাকে কি যেন বলছে।

নাহ্, ওর মাথাটার একেবারেই বারোটা বেজেছে। কাঁদতে আরম্ভ করল। কি কাণ্ড, মাঠি থেকে ওগুলো তুলে খাচ্ছে। মাগো! মানুষ আর পশুতে কোনো পার্থক্য নেই!

যা ইচ্ছে কর বাবা। আমি আর ওদিকে দেখতে পারছি না।

ওই, চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। তার মানে আশপাশ থেকে আরো কিছু ছেলেমেয়ে ঝি বাচ্চা ছুটে এসে হাবড়ে পড়েছে ওই চালগমের ওপর। খেয়োখেয়ি কামড়াকামড়ি করছে শিয়াল-কুকুরের মতো। নিশ্চয়ই বিশুটাও ভিড়ে গেছে ওর মধ্যে। কি করবে, পাগলের তো আর বাড়ির খেয়ে পেট ভরে না।

না, আমি আর কিছুতেই ওদিকে দেখব না। কানও দেব না। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে। গা গুলিয়ে বমি উঠে আসতে চায়। আমি এখন খানিকক্ষণ শুধু আকাশ দেখব। বর্ষার দিনে গরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে বড়ো ভালো লাগে। ভালো ভালো কবিতা মনে আসে। একটু গুনগুন করতেও ইচ্ছে করে।

না, আমি ও-সব কিছুই করব না। আকাশটা এমন বাজে গোমড়া মুখ আর স্লেটের মতো রঙ হয়ে রয়েছে যে আমার তাকাতে ইচ্ছে করছে না। আসলে নিশ্চয়ই আমার জ্বর আরো বাড়ছে। চোখের পাতা দুটো তাই ভারী, নেমে আসতে চাইছে। যাক, জানালাটা

খোয়াই থাকু। আমি বরং কিছুক্ষণ চোখ বুজে নানা কথা ভাবি আর তৈরী করে স্বপ্ন দেখি। জ্ঞান নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। কারই-বা না লাগে ?-

আমার মামুর সেই বান্ধবীর কথা মনে পড়েছে। বান্ধবী অবশ্য শেষ পর্যন্ত মামুকে ভাঁওতা দিয়েছিলেন। তিনি মামুকে বলতেন, ইলিশমাছ আর নলেন গুড়ের সন্দেশ খেতে তিনি খুব ভালবাসেন। (এমন অখাদ্য খেতে আর কেউ ভালোবাসেন না।) আর কালক্রমে সে কথা একদিন আমার দাদামশাইয়ের কানে যেতে উনি কঠিন ব্যঙ্গে বলেছিলেন—"আমার বালু জিনিস খেতে বড্ড বালু লাগে গ।" মামুর তখন বান্ধবী-অন্ত প্রাণ। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং অপমানিত বোধ করেছিল। কেননা, আমি সেই ছোটোবেলাতেও ওদের কথার হাবভাব দেখে বুঝতাম যে ওই বান্ধবীর সঙ্গে মামুর ইণ্টুবিণ্টু আছে।

সে যাক গে। আমার স্বপ্ন দেখার সঙ্গে ও-সবের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এখন শুধু ঠিক করে নেব আগে কোন স্বপ্ন দেখব। স্বপ্নের স্টক্ আমার নেহাত কম না। বলতে কি, আমার পৃথিবীর অনেকটাই স্বপ্নের সমষ্টি। কয়েকটা দেখে আমি আবার জানালার দিকে তাকাব। রাস্তা দেখব। তখন নিশ্চয়ই রাস্তায় অন্ধকার নেমে আসবে। লোডশেডিং হলে তো বেঁচেই যাই। স্বপ্নালু পরিবেশ তৈরি হবে। ক্যাটকেটে আলো থাকলে ভালো স্বপ্ন দেখা যায় না।

ছোট্ট সুন্দর বাগানে বসেছিলাম। সবুজ তোয়ালের মতো ছাঁটা ঘাসের জমি। ছোট ছোট গাছে কত সব রঙিন ফুল। টাটকা তাজা প্রত্যেকটা ফুলের বোঁটা। আকাশের দিকে মুখ তোলা। চকচকে ধোয়া নীল রঙের আকাশ। আমি কিছুতেই সূর্য দেখতে পাচ্ছিলাম না। খুব একা লাগছিল। বোলতা মৌমাছি প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল, ফুলের ওপর বসছিল। বাতাসে ওদের ডানাগুলো তেল-কাগজের মতো কাঁপছিল। চারপাশের নিঝুম নিস্তব্ধতা আমার কানে একটানা ঝুমঝুমির শব্দ। টুকরো সাদা মেঘের নৌকার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছিল বেগুনী রঙের পাখি—কী সুন্দর, কী সুন্দর বলতে বলতে।

আমি ওপরে তাকিয়ে ছিলাম তখনই আমার কানে অন্য কি এক আওয়াজ আসতে আরম্ভ করল। অনেকে একসঙ্গে খুব আস্তে আস্তে কি সব মন্ত্র পড়ছিল। আওয়াজ বাড়ল। আমি চোখ ফিরিয়ে বাগানের গেটের কাছে ছুটে এলাম।

একটা মানুষের দল। ওদের মাথায় নানা রঙের রুমাল বাঁধা। মন্ত্র পড়তে পড়তে এগিয়ে আসছে। মুখগুলো কী করুণ আর সরল। একেবারে মাঝখানের লোকটা, যার চোখের নীচের শুকনো জলের দাগ সুর্মা ধুয়ে গড়িয়ে পড়েছিল গালের দাড়ির ওপর, তার দুহাতের ওপর কোলপাঁজা করা একটা···হয়তো কোল বালিশ। শান্তভাবে সবাই দাঁড়াল, বাগানের কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে নতজানু হয়ে বসল। তারপর অঝোরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। আমি দেখলাম, কোলের বালিশটায় ভিজে ভিজে লাল দাগ। ওরা সবাই বাগানের পিছনে ছবির বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম। তখনই তোমাকে দেখতে পেলাম। তোমার মুখে ভগবানের স্মিতহাসি। ক্রমশ তোমার সৌম্যদর্শন চেহারা বড়ো হয়ে উঠেছিল। অনেক বড়ো, আরো, আরো বড়ো। তুমি বড়ো হয়েই চললে। এক সময় তোমার মাথা গিয়ে ঠেকল আকাশে। সেই ভগবানের আকাশ। .কখনো মেঘ থাকে না, ময়লা থাকে না, শুধু নীল আর নীল।

হঠাৎ সেই নীল আকাশ হলুদবর্ণ পুড়ে যাওয়া শস্যক্ষেতের মতো হতে লাগল। তোমার গায়ে দেখি ছবির রামচন্দ্রের নীলবর্ণ। বিশাল হাত প্রসারিত হল আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে আমাদের সকলের মাথার ওপর দিয়ে। আর আমি সেই প্রসারিত হাতের দিকে তাকাতে গিয়ে, দেখে ফেললাম, একটা ধূসর সূর্য অনুজ্জ্বল, দীপ্তিহীন, অসুস্থ।

আকাশ কুচকুচে কালো। ঈশান কোণে মেঘ। আকাশ ছেয়ে ফেলছে। এখনই আবার বৃষ্টি নামবে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস লাগে আমার গায়ে। জানালার বাইরে এখন ঘুপসি অন্ধকার। নিশ্চয়ই আজও লোড শেডিং চলছে।

বিশুটা আর টিকতে দেবে না। পাড়া মাথায় করে গাঁক গাঁক করে চিৎকার করছে। বাড়ি যাচ্ছে না, এদিকে বৃষ্টি এসে পড়েছে। হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছি বৃষ্টির। শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে এল। ভুলে গেছি আকাশের রঙ, ফুটফুটে তারার জোনাকি।

চোখে আমার জল কাটছে। কত জ্বর হবে এখন? জানি না। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। রাস্তায় আর পা রাখার জায়গা থাকবে না। ঘরবাড়ি দোকানপাট সব ডুববে। আমরাও ডুবতে বসেছি আর ডুবতে ডুবতে—

…আমার ইচ্ছে করেছিল ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডুবি। কী থ্রিলিং ব্যাপার! ব্রিজের নীচে হেমন্তের টলটলে ভরা সুবর্ণরেখা। নক্ষত্র ফুটে রয়েছে আকাশের বাগানে। জঙ্গলে জ্যোৎস্না। আমরা পাঁচজন হাইওয়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। বাতাস খুশির ছড় টানছিল। আমার পিঠে ভাস্বতীর বুক ছোঁয়ানো। মাঝে মাঝে ঘসে যাচ্ছিল। আমরা কী কথা বলছিলাম জানি না। মুখ ঘুরিয়ে হঠাই দেখে ফেললাম—হ্যাঁ, ভাস্বতীই, মানে আমার প্রেমিকা। তরুণের হাতের আঙুল ধরে লুকিয়ে দুজনে ছুন্নুমুন্নু খেলছে।

আমার বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ শুরু হল। ওরা টের পেল না। চকিতে সরে দাঁড়ালাম। মুখ থমথম, মাথা ঝিমঝিম করছিল। সুনীল আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিতে চাইল।

—এই বোস। উঠছিস কেন এখনই?

—না, আমি আর বসব না। অবচেতনে নিজেকে চোখ মেরে ফেললাম।

—এই, তোমার কি হয়েছে গো?—ভাস্বতী বলল।

—আমি সুবর্ণরেখার জলে ঝাঁপ দেব।

বলেই সোজা তীরের বেগে ছুটে গেলাম ব্রিজের মাঝখানে। ওরাও ছুটল আমার পিছনে। ব্রিজের রেলিং ধরে দু পা উঠে পড়েছি। আরো তিন চার ধাপ উঠে পড়লে আমি রেলিং টপকে অনেক নীচের জলে পড়তে পারি। তার মধ্যে ওরা এসে পড়বে। পড়েছে। তরুণ আর সুনীল আমাকে টেনে ধরেছে। রীতিমত ধস্তাধস্তি। ব্রিজের ওপর

রাস্তাতেই টেনে বসিয়েছে। তিন জনেই হাঁপাচ্ছি। ভাস্বতী আর জয়াও এসে পড়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ভাস্বতী নিশ্চয়ই অনুতপ্ত।

আর আমি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করে মহান প্রেমিকের দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। একবার, শুধু একবার অবশ্য সত্যি সত্যি ভেবে ফেলেছিলাম এই সুন্দর মিথ্যুক রঙিন জোচ্চোর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না।

এখন জানি, ঐ একবার ভেবে নেওয়াটাও ছিল অসম্ভব মিথ্যে। আমি কোনোদিনই শুধুমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকে একটু ভালোবাসতে পারি না। গলা দিয়ে ডুকরে কান্না বেরিয়ে আসে কেন?

আমি চিরকাল শুধু ভালো হতে চয়েছি। দুবেবা ঘাসের ডগার মতো, কচি শিশিরের ফোঁটার মতো ভালো। সদ্যোজাত শিশুর চোখের কালো তারার মতন। একদিন আমিও ঐ শিশুর মতোই একটা রক্তমাংসের খেলনা হয়ে জন্মেছিলাম। চোখ খোলা থাকত, কিছুই দেখতাম না। কানের যন্ত্র সব ঠিক ছিল কিন্তু শুনে কিছু বুঝতাম না। সুখ দুঃখ জানতাম না। মায়ের বুক মুখে ঠেকলে আনন্দ, মশা কামড়ালে ব্যথা-যন্ত্রণার কান্না। আমিও বেঁচে থাকার ঐকান্তিক ইচ্ছা আর অদমনীয় দাবি নিয়ে কোনো এক জগৎ থেকে যেন এসেছিলাম।

তারপর আমি একটু একটু করে বড়ো হয়েছি। মায়ের হাতের স্পর্শ চিনেছি, বাবার নাকের ডগা চিনেছি, জিভ দিয়ে শব্দ তৈরি, পা দিয়ে হাঁটা, হাত দিয়ে খাওয়া, লাল রঙের জামা, ব্যাট বল, অ আ ক খ, এ বি সি বেলগাড়ি দশপয়সা এক টাকার নোট ইলেকট্রিক সুইচ ··!

আর সেই-যে সব-কিছু দেখা আর জানার স্রোতে গা ভাসিয়ে বাড়তে আরম্ভ করেছি, এখনো ভেসেই চলেছি. শুধু ভেসে যাচ্ছি। আমার সারা গায়ে জল, জলময়। আমার বিছানা ভেজা, জানালা খোলা। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, চলেছেই। কী ঠাণ্ডা! বড়ো শীত করছে আমার। এই জলের মধ্যেও আমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

তুমি এখনো আস নি। হে, আমার পরম পুরুষ, তুমি এলে না।

আমি এবার বিছানা ছেড়ে উঠব। ওষুধ খাব। বাইরের বৃষ্টি এখনো চলছে। ভেবেছিলাম আমার কপালে কেউ একটা ঠাণ্ডা হাত রাখুক। জানতাম রাখবে না। তবু ভাবতে ক্ষতি নেই। জানালাটা খোলা ছিল, বুঝতে পারি নি। বিছানা ভিজে গেছে। পাগলা বিশুটা আবার চ্যাঁচাচ্ছে—যা বৃষ্টি থেমে যা, লেবুর পাতায় করমচা। সেই কবে তোমায় দেখেছিলাম মনে নেই। আজ আমি নিজে তোমায় ডাকছি—তুমি এসো, তুমি এসো—। আসার সময় সঙ্গে কিছু আলো নিয়ে এসো। যে আলোয় আমাদের সব রাস্তা দেখা যাবে। আমরা সেই আলোয় নিজেদের ঠিকমত চিনে নেব। চারপাশে আজ বড়ো অন্ধকার।

থেকেও নেই

চোখ ছুটো ঠিকই ছিল, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তার দৃষ্টি নিজের কোনো কাজে লাগে নি। মনে মনে খুব নিখুঁত হিসেব করার চেষ্টা করলো অবনী। কতোদিন? তখন ছিল একুশ বাইশ। এখন তেতাল্লিশ চলছে। মোটমাট বিশ বছরের নিশ্চিত ওপরে। অজান্তেই বুকের কোত্থেকে একটা শ্বাস বেরিয়ে পড়লো হুস্ করে। কম দিন হল না।

স্টেশনের দিক থেকে রাস্তাটা একেবারে সোজা পশ্চিমে এসে মিশেছে গঙ্গার পাড়ে। ঢালু হয়ে নেমেছে ফেরিঘাটে। ঠিক নেমে যাওয়ার আগেই ডানদিকে মোড়। ধানকল পর্যন্ত যেতে হয় না। ডানহাতে শ্যাওলা ধরা একতলা বাড়ি। কোনো এক সময় হয়তো গেরুয়া রং ছিল দেয়ালে। মুখ বের করা বাঘমার্কা নালা দিয়ে ছাদের জল পড়তো রাস্তার ড্রেনে। নালা ভেঙ্গে গেছে। বর্ষা বাদলায় জল ছড়িয়ে যায় দেয়ালে। গুঁড়ি গুঁড়ি সবুজ শ্যাওলা গজিয়েছে নির্বিবাদে। গেরুয়া রঙ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। ঘষে উঠে গেছে টিনের পাতের ওপর লিখা "শ্রীকানাই লাল শীল, সঙ্গীত প্রভাকর।"

রাস্তার ধারেই বাড়ি। ড্রেনের ওপর দিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে সরু একফালি বারান্দা। কালো রঙ করা দরজাটা ভেজানোই থাকতো, ঘরের ভেতরে খা ল গায়ে লুঙ্গি পরে সামনে হারমোনিয়াম নিয়ে কানাই বসে থাকতো। অনেক সময় শুধু পায়ের আওয়াজেই বুঝতে পারতো, ঘরে কে এলো। অবনী ঢুকলে তো পারতোই।

আলকাতরা মাখানো কালো দরজাটা আজ ভেতর থেকে বন্ধ। একধাপ সিঁড়ি উঠেই অবনী এতোক্ষণ পরে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিঁড়ির

নিচে দিয়ে ড্রেনের নোংরা কালচে জল গঙ্গার দিকে বয়ে চলেছে। অবনীর শুধু মনে হল কানাইয়ের ঝাপসা নাম লেখা আর ক্ষয়ে যাওয়া টিনের পাতটা এবার খুলে নিতে হবে দেয়াল থেকে। বহুদিন আগে ওটার দুপাশে পেরেক ঠুকে অবনীই লাগিয়েছিল।

আগে থেকে জানায় নি কিছু। দেয়ালে পেরেক ঠোকার আওয়াজ পেয়ে হারমোনিয়াম বন্ধ করেছিলো কানাই। দরজার দিকে মুখ তুলে জিগ্যেস করেছিল—দেয়ালে কি ঠুকছো অবনী? কিছু বলতে হয়নি অবনীকে। কানাইয়ের কাছে গান শিখতে আসা ছাত্রী দুটির একটি জানিয়েছিল—আপনার নেমপ্লেট, মাস্টারমশাই।

চুপ করেছিলো কানাই। একটু পরেই হাত ঝেড়ে ভেতরে ঢুকে অবনী জিগ্যেস করেছিলো—কিছু বলছিলে নাকি কানাইদা? মাদুরের ওপর বসে ডুগি তবলাটা টেনে নিলো নিজের দিকে। হারমোনিয়ামের বেলোয় হাত রেখে বসে ছিল কানাই। অত বড় চেহারার কাছে মনে হয় যেন একটা খেলনা কাঠের বাক্স সামনে। আবলুশ কাঠের মতন গায়ের রঙ কানাইয়ের। তার ওপর অসম্ভব লোম। ছাত্রছাত্রীরা থাকলে একটা ফতুয়াগোছের কিছু গায়ে রাখে। ভ্রূর ওপর দু একটা পাকা লোম চিকচিক করে ওঠে।

আস্তে আস্তে বললো—জিগ্যেস করছিলুম দেয়ালে কি ঠুকছিলে। তা এরা বললো, তুমি নাকি আমার নেমপ্লেট লাগাচ্ছিলে।

তবলার বিঁড়েয় পাড় জড়াতে জড়াতে অবনী বললো—হ্যাঁ। ভাবছিলাম কয়েকদিন থেকেই, মানে তোমার মতন শিল্পীর ঘরের সামনে একটা—

—কই বলো নি তো আগে কিছু।

অবনীকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কানাই বললো। ঠিক বোঝা গেল না কানাই কোনদিকে তাকিয়েছিল। কোনোদিকেই অবশ্য তাকায় না কানাই। শুধু মুখ তুলে চায়। আর ঘোলা হলদেটে চোখের ওপর পাতাগুলো পিটপিট করে নড়ে বোঝা যায়। কালো মুখের মধ্যে থেকে কয়েকটা দাঁতের সাদা মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

অবনী বুঝতে পারে নি কানাই খুশি না বিরক্ত হয়েছিলো। তাই জিগ্যেস করেছিলো—কেন, কানাইদা, তোমার আপত্তি আছে নাকি?

সে কথারও উত্তর দেয় নি কানাই। বোধ হয় এক চিলতে সরু হাসি ঝুলে পড়েছিলো ঠোঁটের কোণে। হারমোনিয়ামের রীডের ওপর হাত দিয়ে আবার বলেছিলো—তা কি লেখালে নেমপ্লেট?

অবনী গড় গড় করে বলে গিয়েছিল—শ্রীকানাইলাল শীল, সঙ্গীত প্রভাকর, ব্র্যাকেটে বেতার, আর তোমার ঠিকানা। ঠিক আছে?—একটু থেমে অবনী আবার উৎসাহ নিয়ে বলেছিলো—স্বপনকে দিয়ে লিখিয়েছি। খুব যত্ন করে সুন্দর করে লিখেছে, কালোর ওপর সাদা দিয়ে।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কানাই খুব আস্তে আস্তে বলেছিলো—তা টিনের পাতে লেখালে?—বলেই অবনীকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, হারমোনিয়ামে সুর তুলে সামনের ছাত্রীদের বলেছিলো—নাও ধরো—নি ধা পা মা পা, নি ধা পা মা গা রে সা। নিজেও গেয়ে উঠেছিলো।

সিঁড়ির সেই প্রথম ধাপটাতে দাঁড়িয়েই অবনীর আজ আবার মনে হল—এতো বছরেও সেই টিনের পাতটা আর পালটানো হয়ে ওঠে নি। আর পালটাতেও হবে না। এবার ওটা খুলে ফেলতে হবে একেবারে। হয়তো অন্য কোনো লোকেরা এসে থাকবে এখানে।

কিন্তু আর কতোক্ষণ অবনী দাঁড়িয়ে থাকবে এখানে।

সরু বারান্দাটার ওপর উঠে এলো। আর তখনই জগদীশ রাস্তার ওপর থেকে ডাকলো। বাজার সেরে ফিরছিলো, হাতে চটের ব্যাগ, লুঙ্গির মতো পরা ধুতি। অবনী ঘুরে দাঁড়াতে জিগ্যেস করলো—কি করে হলো?—সিগারেট ধরাতে গিয়ে।—নেহাৎ বলতে হয় এমনভাবে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল অবনী। কোণের দিকে শান বাঁধানো জায়গাটায় বসলো। কাজ নেই, কিছু করার নেই।

জগদীশ তখনও দাঁড়িয়ে রাস্তায়। মিউনিসিপ্যালিটির ডোম একটা জঞ্জালের ঠেলাগাড়ি টানতে টানতে চলে গেল ধাঙড় পাড়ার

দিকে। একটু সরে এসে জগদীশ আবার জিগ্যেস করলো—শুনলাম তো সকালের দিকেই হয়েছে। কেউ ছিল না কাছেপিঠে?

অবনী উত্তর দিল না। শুধু ঘাড় দোলালো এপাশ ওপাশ। অর্থাৎ—না।

—আর কি করবে বলো।—জগদীশ যেন সান্ত্বনা দিতে চাইলো অবনীকে।—অন্ধ মানুষ, একলা থাকতো। এটাই বোধ হয় নিয়তি। একটু চুপ করে থেকে জগদীশ আবার বললো—তবে তোমার চাকরীটাও গেল—এই আর কি। দেখ, আবার কি করবে।

অবনী কিছু বললো না। বারন্দার কোণে বসে রইলো, যেমন ছিল। জগদীশ আরও একটু দাঁড়িয়ে আপন মনেই 'চলি' বলে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল।

বারান্দায় বসে বসেই অবনীর চোখদুটো জ্বালা করে উঠলো। না, কানাইয়ের মৃত্যুর জন্য কোনো শোক কিংবা দুঃখ নয়। যেন নিজের প্রতিই অবনীর এক ধরনের সহানুভূতি ভেতরে কাজ করে চলেছে। আজ এতোদিন পরে এখনই কেমন অদ্ভুত বেমানান লাগছে নিজের দৃষ্টিকে নিজের জন্য ব্যবহার করে। নিজের ডেরা থেকে কানাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত অবনী বেশ এসেছে, কোনো অসুবিধে হয় নি। যেমন আসে, আসতো এত বছর। কিন্তু কানাইয়ের বাড়ির সিঁড়িতে পা দেওয়ার পরেই অবনার ভূমিকা পালটাতো। প্রায় নিত্যদিনের একই ধরনের কয়েকটা কথা। পায়ের আওয়াজে কানাই বুঝতো অবনী এলো। তার একটু আগেই কানাই শুনতে পেতো পুরোন দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে আটটার একটা ঘণ্টা।

—কি অবনী এলে নাকি?

—হ্যাঁ, এলুম কানাইদা। কটায় বেরুবে আজ?

কানাই স্মৃতি হাতড়ে দিনের প্রোগ্রাম বলতে বলতেই অবনী তাকের ওপর হাত দিত। দাড়ি কামাবার সাবান ব্রাশ আর রেজর পেড়ে নিত। মাদুরের পাশে মেঝেয় সেগুলো রাখার শব্দে কানাই ধরে নিত অবনী কি করছে। ঘরের কোণে জালায় জল থাকতো। জল ঢালার

আওয়াজে কানাই বুঝতো অবনী কিসে জল নিচ্ছে—বাটিতে না গ্লাসে। গ্লাসে জল নিয়ে দাড়ি কামানো পছন্দ করতো না কানাই, খাওয়ার সময় সাবানের গন্ধ লাগতো। কিছু না দেখেও যেন নীরবে সবই দেখছে—আস্তে বলতো, বাটিটা কেষ্টর মা ধুতে নিয়ে গেছে বুঝি, অবনী?

সাদা দেয়ালের দিকে মুখ করে কানাই দাড়ি কামাতো। অবনী তেলের বাটি আনতো, কিংবা কানাইয়ের জামাকাপড় বের করতো। কলকাতা যাওয়ার থাকলে ভাল জামাকাপড়গুলো রাখতো, কাছেপিঠে চুঁচড়ো শ্যামনগর কিংবা গরিফা যাওয়ার থাকলে একটু মোটামুটি। চটিটা দরজার ডানদিকে। মিলস্ কোয়ার্টার্সের ছাত্রীকে গান শেখানোর দিন হলে অবনী পাউডারের কৌটো দিত কানাইয়ের হাতে। অবনী তানপুরার ঢাকনা ঠিক আছে কি না দেখতো, হারমোনিয়ামের রীডের মধ্যে আরশোলার নাদ ঢুকেছে কি না, তবলচি রাখাল বাঁধা তবলা নামিয়ে রেখেছে কিনা।

কানাইয়ের স্নান করতে যাওয়ার আগে ছিল একটু ধূমপানের বিলাসিতা। এই কয়েকটা মিনিটের অস্তিত্ব অন্যরকম। এতোক্ষণ যেন একটা মানুষই তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম নীরবে সেরে যাচ্ছিল দুটো আলাদা চেহারায়। যেন ঘরে আর কোনো লোক নেই, কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কথাবার্তা বলার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু তারপরেই যখন গামছায় মুখ মুছে কানাই সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে নিয়ে, একটা বাড়িয়ে দিত অবনীর দিকে আর বলতো—"নাও ধরো, অবনী"—মুহূর্তে ঘরের মধ্যে দুটো আলাদা মানুষ হ'তো। দুটো লোক কথাবার্তা বলার রীতিনীতি পদ্ধতি এবং পরিবেশ তৈরী হ'তো। একজন প্রশ্ন করতো আর একজন উত্তর দিত। খবরের কাগজের কিছু কিছু সংবাদ জানাতো অবনী কানাইকে। রেডিও প্রোগ্রাম থাকলে ছাপার অক্ষরে নাম উঠেছে কি না কানাই জিগ্যেস করতো। বেতারজগতে ছাব বেরুলে কানাই জিগ্যেস করতো অবনীকে প্রিণ্ট-এর ইমপ্রেশনটা কেমন হয়েছে। অবনীর গলা শুনে কানাই বুঝতে পারতো, ওর শরীর কেমন আছে, মন-মেজাজ ঠিক আছে কি না।

অবনীর মনমেজাজ বিশেষ খারাপ হতো না। কেননা নিজের কোনো দায় দায়িত্ব সম্পর্কে ও সচেতন হতে পারেনি। প্রয়োজনও হয় নি। ও জানে ওর দুটো চোখ আছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি আর দেখা কানাইয়ের জন্য। কানাই গাইয়ে, কানাই শিল্পী। ছাপার অক্ষরে তার নাম বেরোয়। ছবি ছাপা হয়। রেডিওতে গান গায়। টাকা রোজগার করে। কানাইয়ের নামে ব্যাংকের পাশবই আছে। এ জায়গা সে জায়গা থেকে জলসায় গান করার জন্য কানাইকে লোক বলতে আসে। টাকা পয়সাও দেয়।

দৃষ্টিহীন একটা লোক কি করে এমনও হ'তে পারে অবনী ভাবতো। প্রথমদিকে অবাক আর মুগ্ধও হ'তো। তারপর ক'বে থেকে যেন মমত্ব। আর ক্রমশ হয়তো নিজের অজান্তেই দিয়ে দিয়েছে দৃষ্টি। অবনী কিছুই নিজের জন্য দেখে না।

কানাইয়ের দৃষ্টি নেই। কিন্তু স্পর্শ গন্ধ কান আছে. অনুভূতি ক্রমশ তৈরি হয়েছে। অবনীর মতো একটা ছেলেও জুটে গেছে—হয়তো সেই জন্যই চোখের ও অনেকটা যেন পেয়ে গেছে।

পাঁচ বছর পর্যন্ত চোখ ছিল কানাইয়ের। সে রঙ চেনে। ফর্সা কালো বোঝে। বাস রেলগাড়ি মনে করতে পারে। গাছের পাতা চেনে। ধুতি পাঞ্জাবি শার্ট প্যাণ্ট কোট ফ্রক শাড়ি কিরকম বুঝতে পারে। কাকে কোঁচকানো বলে কানাই জানে। জানে গোল চৌকো কিরকম।

অবনী কানাইকে বলে তার কোন ছাত্রছাত্রী কি পরে আসে। তাদের দেখতে কেমন। কার চোখে চশমা, কার গোঁফ আছে, কার গালে তিল। আসলে অবনী হয়তো এসব কিছুই কোনদিন দেখতো না খুঁটিয়ে। কিন্তু কানাই জিগ্যেস করতো। প্রথমদিকে বারবার ভুল করতো অবনী। ক্রমশ একটু একটু করে সময়ের সঙ্গে সে তার চোখ-দুটো তৈরি করছিলো কানাইয়ের মতন করে। কানাই তার কৌতূহলের আশ মিটিয়ে দেখতো অবনীর চোখে। তার সঙ্গে অনুভূতি মিশিয়ে কানাই তৈরি করে নিতো নিজের দৃষ্টি।

কানাইয়ের চোখ নেই, দৃষ্টি তৈরি করে নিয়েছিলো। অবনীর চোখ আছে, দৃষ্টিটা একটু একটু করে দিয়ে ফেলেছিলো। আর দিতে দিতেই যেটুকু তৈরি, তার সঙ্গে নিজের কোনো যোগাযোগ হয় নি। অবনীর ভাববার দরকার হয় নি, তার যেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি, যেটুকু লেখাপড়া, যতোখানি বয়স, এখনও পর্যন্ত যতোটা তার জীবন, তার সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে তৈরি হওয়া উচিত ছিল তার দৃষ্টি। এতোসব কখনই অবনীর মাথায় খেলে নি। কানাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা না ভালোবাসা নাকি অনুকম্পা কি তার মধ্যে সেই প্রথম দিন থেকে কাজ করেছে—অবনী সঠিক ভাবতে পারে না। ছোট থেকে অবনী তার বাপ দেখে নি, মা কাঁথা সেলাই করতো। তারপর কবে থেকে মামার বাড়িতে থাকতে থাকতে সে বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিল। মাকে আর পাওয়া যায় নি। গোঁফদাড়ি গজাবার পর নিজের বোকামির জন্য হাজত খেটেছে দুবার। অন্যেরা মাথায় চাঁটি মেরে পালাতো। লতায় পাতায় কিভাবে যেন অবনীর সম্পর্ক ছিল তবলচি রাখালের। সেই একদিন অবনীকে এনে তুলেছিল কানাইয়ের কাছে। কানাইকে তখন পাড়ার লোক চিনতে শুরু করেছে। রেডিওতে গান গেয়েছে সে দুবার। ইনস্টিট্যুটের ফাংশানে ইন্দুবালা কানাইয়ের গান শুনে পিঠে হাত দিয়ে হেসে কথা বলেছে।

জড়সড় হয়ে ঘরে ঢুকছিল অবনী। অথচ তাকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে মিশকালো রোমশ অন্ধ মানুষটা বলে উঠেছিল—কে এলে, রাখাল নাকি ?

—হ্যাঁ কানাইদা, আমি রাখাল। কথাটা রাখাল বলা মাত্রই কানাই আবার প্রশ্ন করেছিল—তা সঙ্গে কাকে এনেছো ?

অবনী এবার আর শুধু অবাক নয়, সঙ্গে একটু বিস্মিত অবিশ্বাসও। কানাই কি একটু আধটু দেখতে পায় নাকি ? কিন্তু তা তো নয়, সবাই তাহলে বুঝতো। লোকটা কি ম্যাজিক জানে !

—আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্না অবনী। রাখাল বললো। তারপর একটু থেমে আবার বললো—আপনার কাছে নিয়ে এলাম, যদি কোনো কাজে লাগে। কেউ নেই ওর।

—তা বেশ করেছো। একটু ওপর দিকে মুখ তুলে কানাই বললো, বোসো, ভাই বোসো। এই এখানেই আমার কাছে এসে বোসো। পুরো নাম কি তোমার।

—আজ্ঞে অবনী কুমার পোদ্দার। অবনী বসতে বসতে বললো। আড়ষ্ট হয়েই ছিল। রাখাল ঠেলে দিয়ে বললো—আর একটু এগিয়ে বোসো—কানাইদা তোর গায়ে হাত দিয়েই অনেক কিছু বুঝে নেবে।

কানাই প্রথমে ওর হাঁটু তারপর হাতের ওপর হাত ছুঁইয়ে শেষে পিঠে হাত রেখেছিল। আর অনিবার্য ভাবেই কানাইয়ের হাতের নিচে অবনীর জামার পিঠের ছেঁড়া অংশটুকু লাগলো। কানাই সেটাও বলে দিল।

—তোমার জামাটা যে ছিঁড়ে গেছে!

—আর কোত্থেকে পাবো বলুন।—কথাটা রাখাল বলেছিল। যেন একটা ভাল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সাফাই গাইলো।

—তোমার কেউ নেই বুঝি?—কানাই মুখ ফেরালো অবনীর দিকে। আর এই প্রথম অবনী দেখতে পেল কানাইয়ের হলদেটে ঘোলা চোখ ঠিক তার দিকে নয়—যেন তার কান ঘেঁষে ঘরের কোণার দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ অবনীর মুখের অবস্থান কানাই বুঝতে পারছে না।

কোনো উত্তর দেয় নি অবনী। হাতের নখ খুঁটছিল। আর তার বোকাটে অনমুভূত মাথার মধ্যে একদিকে কিছু ঝাপসা অভাবের ওপর সহানুভূতির প্রলেপ আর একদিকে বিস্মিত জিজ্ঞাসার সঙ্গে এই অন্ধ মানুষটার প্রতি এক কৌতূহল মেশানো শ্রদ্ধা জেগে উঠছিলো। যদিও এর কোনোটাই অবনী আলাদা করে বোঝে নি, তবু, আরও খানিকক্ষণ এটা ওটা কথার পর কানাই যখন বললো—তাহলে তুমি ইচ্ছে করলে আমার কাছে থাকতে পারো। রাস্তাঘাটে তো বেরুতেই হয়, একজন সঙ্গে কেউ না থাকলে—

—আমি থাকবো আপনার কাছে।—কানাইয়ের কথার মাঝখানেই অবনী এটুকু বলতে পেরেছিলো।

সেইদিন থেকেই শুরু। অবনীকে কিছু বুঝতে বা বোঝাতে হয় নি। কানাইকে বিশেষ কিছু বলতে হয় নি। অথচ সময়ই যেন নিঃশব্দে ওদের তুজনের বোঝাপড়া। একটা স্থির বিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিলো। শুধু দেয়া আর নেওয়ার সম্পর্কই নয়, মাঝেমাঝে মিশে যাওয়া নিজেদের কাজ আর বিশ্বাসের কাছে। একজনের চোখ, আর একজনের দৃষ্টি—তুয়ে মিলে পূর্ণতা।

এভাবেই চলে এসেছে এতোদিন। কিন্তু এখন অবনী কি করবে। বারবারই ওর চোখ জ্বালা জ্বালা করে উঠছে। সবকিছুই দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে। অথচ তারা একটা নির্দিষ্ট অর্থ নিয়ে ওর মাথায় ঢুকছে না।

কালো দরজাটা নড়ে উঠলো। বাঁ দিকের পাল্লাটা খুললেই ক্যাঁচ করে শব্দ হয়। অবনী বসেছিল বারান্দার কোণে। শব্দটা তার কানে এলো। কিন্তু চোখ নড়লো না। বুঝতে পারলো দরজাটা ভেতর দিক থেকে কেউ খুললো। একটু কাশি আর তুগাছা চুড়ি সেফটিপিনের আওয়াজে অবনী দিব্যি বুঝলো কেষ্টর মা ভেতর থেকে দরজা খুললো। কানাইয়ের বাড়ির ভেতর দিকটাতেই কেষ্ট আর কেষ্টর মা থাকতো। রান্নাবান্নাও করতো।

কেষ্টর মা বারান্দায় মুখ বাড়ালো। অবনী বুঝতে পারলো কেষ্টর মা ঘর থেকে বারান্দায় গলা বের করে দেখছে। কিন্তু অবনীর চোখের তারা ঘুরলো না। বারান্দার কোণা আর উল্টো দিকের দোকানটার ছাদের পাশ দিয়ে ওর ঝাপসা চোখ কোনো এক শূন্যতায় বিঁধে রইলো।

কেষ্টর মা ঘাড় ঘুরিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে বললো—ও মা, তুমি এখানে এসে বসে রয়েছো? আমি তোমার অপেক্ষাই করছি তখন থেকে। কতোক্ষণ এসেছো?

—বেশ কিছুক্ষণ হল।—অবনীর ঘাড় ঘুরলো না। শূন্যতার দিকে চোখ আটকে রইলো।

কেষ্টর মা বোধহয় কিছু ভাবলো। তারপর বললো—সেই সকাল

থেকেই ভাবছি, তুমি এলে একটা কিছু বন্দোবস্ত হবে। জিনিসপত্তর-গুলোর মধ্যে যা রয়েছে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

অবনী বুঝলো কেষ্টর মা ঘর থেকে এক পা বারান্দায় বেরিয়েছে। ও কথা বললো না, চুপ করে রইলো। কেষ্টর মা আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়ালো। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে বললে—একটু দেখেশুনে নাও বাপু, ঘরদোর ধোয়ামোছা করতে হবে তো এবার।

দরজা বন্ধ করার কোনো আওয়াজ পেল না অবনী। অর্থাৎ দরজা খোলা আছে। আস্তে আস্তে উঠলো বারান্দার কোণে বাঁধানো শানের ওপর থেকে। ওখান থেকে ছ'পা হেঁটে দরজার সামনে এলো যেমন কানাইদা আসতো। বাঁ দিকে ঘুরে উঁচু পা ফেলে চৌকাঠ পেরুলো। তারপর আরও তিন পা'য় ঘরের প্রায় মাঝামাঝি। পায়ের তলায় ঠাণ্ডা মেঝে। আজ আর মাদুর পাতা নেই।

ঘরটা এমনিতেই স্যাঁতসেঁতে। ঝাপসা থাকে। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। আজ জ্বলে নি। অন্ধকার ঘরে রেখেছে। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নেই। একটা সোঁদা সোঁদা পোড়া পোড়া গন্ধয় ভরে রয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। অবনীর কোনো প্রয়োজনও ছিল না দেখার। একটা চড়ুই পাখি শব্দ করে উড়ে গেল। অবনী বুঝতে পারলো চড়ুই পাখিটা বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ও নির্দ্বিধায় বাঁ দিকে তাকের কাছে গেল। অন্ধকারের মধ্যেই একেবারে ওপরের তাকে হাত দিল—যেখানে তবলা ডুগি বিড়ে আর হাতুড়িটা থাকতো। কিছু নেই। মাঝের তাকে হারমোনিয়াম থাকতো কাঠের বাক্সের মধ্যে। বাক্সের ডালায় একটা লোহার আংটা আছে মাঝখানে। সেটা ধরে অবনী ঢাকনাটা তুললো ডান হাতে। বাঁ হাতে বাক্সের মধ্যে হাত দিয়ে বুঝলো বাক্সটা ফাঁকা। একটু ডানদিকে সরে গেল অবনী। ছোট কাঠের আলমারি আছে ওখানে। হাত দিতে গিয়েই বুঝলো পাল্লা দুটো হাঁ করে খোলা পড়ে রয়েছে। ভেতরে হাত দিয়ে দেখার আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না।

অবনী সরে এলো ঘরের মাঝখানে আবার। খোলা দরজা দিয়ে

একটা ধূসর আলোর আভাস বাইরে থেকে আসছে অবনী বুঝলো। ওখান দিয়ে বেরিয়ে চার পা বাঁয়ে গিয়ে তিনটে সিঁড়ির পর রাস্তা অবনী জানে। বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা চেনা গন্ধ যেন হঠাৎই আজ অবনীর নাকে পৌঁছায়। তানপুরাটার রঙ আর পালিশ হয়েছিল কদিন আগেই। সেই গন্ধটাই পেলো, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের দেয়ালের হুকে তানপুরাটা তাহলে রয়েছে এখনও। ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে অবনী।

হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। ঠিক হুকের ওপর হাত দিয়ে সন্তর্পণে খুলে নিল তানপুরাটা। তারপর পিছন ফিরলো, বেরিয়ে যাবে বলে। আর তখনই পায়ের শব্দে বুঝলো কেষ্টর মা ঘরে এসেছে। আস্তে আস্তে ঘুরলো।

—এটা নিয়ে যাচ্ছি।—অবনী বললো।

—তা তুমি আবার ওটা নিয়ে—

কেষ্টর মা কথা শেষ করতে পারলো না। তার আগেই অবনীর সন্তর্পণে পা ফেলা আর ধীরে ধীরে এগুনো দেখে বিস্ময় আর ঠাট্টা মিশিয়ে বললো—ওমা, ওকি গো, তুমিও কি চোখের মাথা খেলে নাকি!

অবনী কিছু না বলে একটু ঘাড় ঘোরালো। আন্দাজে কেষ্টর মা'র গলা লক্ষ্য করে আস্তে বললো—কানাইদার সঙ্গে সঙ্গে এ ঘরে তো আমারও চোখ পুড়ে গেছে।

আবার ফিরলো অবনী। পা ফেলে শুনতে পেলো কেষ্টর মা'র চাপা গলা। বোধ হয় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ভেতরে কাউকে হাসতে হাসতে বলছে—ওরে, অন্ধ কানাই মরে গিয়ে এবার কানা-অবনী হ'ল দেখছি।

কিছু বললো না অবনী। চৌকাঠের জায়গায় ঠিক উঁচু পা ফেলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। চোখ খোলা অথচ দৃষ্টিহীন।

অতনুর রাত্রি

অতনুর নিত্যকার ফোম রাবারের বিছানা তার আলগা শরীরটাকে আপন করে নিল। কিছুক্ষণ আগেকার সেই আওয়াজটা, যা কিনা চাপা গোঙানির মতো, যা নাকি বোঝা যাচ্ছিল না আসলে হাসি না কান্না—তা আর সত্যি বেরুচ্ছিল কি না, অতনু খেয়াল রাখল না। কিন্তু আকাশে তখন একটাও তারা নেই, বাগানে একটা ফুলও দেখা যায় না। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী সেই সব স্বপ্নেরা তখন সারাদিনে খোলশা না হওয়া মনে, ভাসা ভাসা তির্যক যাতায়াত শুরু করল।

অথচ বিশ্বাস করুন ঠেক্ খেয়ে যাচ্ছি সেইসব স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে। স্বপ্নের থেকে খুঁজে পেতে দু'চার পাতা নামাতে পারলেই তো গল্প, মানে গপ্পো। এও তো রোজকার ব্যাপার, নিত্যদিনের কথা। প্রতিদিন ঘটে, ঘটে আসছে।

কবুল করেছি না একটু আগেই, রোজ যা ঘটে তা কি গল্প?

না। তা তো গল্প নয়। অতনুর বৃষ্টি জলে ধোওয়া, না ভুল হল, জীন সোডায় চোবান, রেণু রেণু মন থেকে বেরিয়ে আসা কিছু মেঘ মেঘ ভাবনা। তার কোনো আরম্ভ নেই, নেই কোনো শেষ। মাঝপথে শুরু হয়ে খেই হারায় সমাপ্তির আগে।

কিন্তু এই রাত্রির অবশ্যম্ভাবী স্বপ্নেরা, গল্পের গরু গাছে ওঠার মতো, বলে ফেলা সারাদিনটা থেকে পুরো উল্টোমুখে উজান বেয়ে চলতে শুরু করল।

অতনু অসহায়। অসহায় অতনু বহুদিন পরে দেখল সে তার জীন সোডার অঙ্গীকার ছুঁড়ে ছিঁড়ে চিনে নিতে পারছে, বলে ফেলছে

তার মেঘ মেঘ ভাবনাদের। অতনু আজ রাত্রির অন্ধকারে আস্বাদন করতে পারছে তার মেঘ-ভাবনার নিচে কিছু মিষ্টি জলের।

কি বিপদ! কি চমৎকার, অতনুকুমার ঘোষ নামের বিত্তাসাগরী বড় মাথার এই মানুষটি বুঝতে পারছে এখন—এই সময়ে—দেরিতে অথচ উপযুক্ত সময়ে, যে এখন রাত্রি। যেটায় শুয়ে আছে এটা তার বিছানা, যেখানে রয়েছে সেটা তার বাড়ি—নিউ আলিপুর চত্বরে। শুধু তাই নয়, যে চাপা আওয়াজটা কিছু আগে বোঝা যাচ্ছিল না অট্টহাসি না উন্মাদ কান্না, তা এখন অতি স্পষ্ট। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা হাহাকারের সঙ্গে চোখ ঝাপসা করে ঝরে পড়া জলের উচ্ছ্বাসকে কান্নাই তো বলে! অতনু বুঝতে পারছে বহু বহু বছর মাস দিন ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডে জমে থাকা কান্না আজ তার দিনের শেষে মাঝরাত্রিতে বালিশ ভেজাচ্ছে।

অতনু বদ্ধ পাগল অথচ মাঝে মাঝে ইন্টেলেকচুয়াল, যেটা ও নিজেও কখনও ভাবে তুনম্বরী, শো অফ্। সেই শো অফ কান্নাকে চিনে ফেলা মাত্রই তার টুঁটি টিপে মারতে চেয়েছিল। পারল না। কেননা স্রোত আজ উল্টোমুখী। আজ একটি চেনা রাত্রিতে উদ্বেল হওয়া সরল কান্না, যা চোখে জল ঝরায়, বালিশ ভেজায়, তাকে অতনু ধরতে পেরেছে।

অনেকক্ষণ কেঁদে অতনু উঠে বসল। দিব্যি বুঝতে পারল তখনও রাত্রির অন্ধকার রয়েছে। কটা বেজেছে বুঝতে পারল না, কেননা ঘরে অথবা হাতে ঘড়ি নেই। বুক হালকা করে অতনু আর একবার ভাবল, আজ রাত্রি কি সরল, ঠিক রাত্রির মতোই। কতদিন এমন রাত্রি হয় নি, আসেনি। হঠাৎ মনে পড়ল অতনুর, রবীন্দ্রনাথ যে দিন মারা গিয়েছিলেন, সেই রাত্রিটা যেমন—একধরনের নীরব ভেসে যাওয়া শূন্যতায় কেটেছিল, দিনটা জুয়ো খেলে কেটেছিল, এলোমেলা ঘুরে ঘুরে কখন যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল, যেন সেইরকমই আর একটা রাত্রি অথবা দিন আবার শুরু হতে চললো। বোঝা যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে, অথচ সব যেন ঢিলে আলগা।

আবার অতনু রাশ টেনে ধরল। চেনা জানা ব্যাপারগুলো এলোমেলো হওয়ার আগেই, বিছানা থেকে নামল। খসে পড়া পাজামা টেনে বাঁধল কষে। ডানদিকে টেবিল। তার ওপর পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে জল। সব জানা, কি সুন্দর। সোজা হেঁটে এসে গ্লাস তুলে জল খেল। মেঘ মেঘ ভাবনা নিয়ে কোনো বাগাড়ম্বর না করে, জলের গ্লাসে চুমুক-কে, নীলা কিংবা প্রতিমার মুখের কোনো জায়গায় চুমু মনে না করে, জল খেল। অনেকটা জল খেয়ে ফেলতে পারলে, পেটের মাঝখানটা ভার হয়, অতনু তা অনুভব করল।

সুতরাং এইবার, আজই এখন অতনু টেলিফোনের সামনে এল। এটাই টেলিফোন—একদিকে কানে শোনা, আরেক দিকে মুখে বলা। নিচে তারের যোগাযোগ।

মনে মনে হাসি পেল অতনুর এবার। ঠিক জানে কোথায় ডায়রীটা আছে এবং ডায়রীর কোন্ পাতায় কি নম্বর লেখা আছে। কাউকে ফোন করার জন্য এটা বিলক্ষণ অসময়, তা কি অতনু জানে না?

কেন জানবে না। বিশেষতঃ অতনুর এই রাতে? তবু অতনু এখনই তা করবে। পরে করলে হ'তো না বা হবে না, তা নয়। তবু অতনু এখনই করবে। বহুদিনের হিসেব নিকেশ দেনাপাওনা বাতানুকূল ঘর রিভলভিং চেয়ার, অতনুর ঘাড়ে জোয়ালো হয়ে জীবনটাকেই তো অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। অতনুর দিন, অতনুর রাত্রিতে কোনো গল্প হয় নি।

সুতরাং অতনু সেই সরকারী ফোন নম্বরের ছটা নির্ভুল সংখ্যা অব্যর্থ ডায়াল করল। ওপারের ঘুমে জড়ান গলা পেয়ে লজ্জিত হেসে, ফ্যাঁসফেসে ক্ষমা চাইলো, অসময়ের জন্য। না, না, অত্যধিক জীন সোডার বেয়াদপি অথবা তিলে তিলে খতম করার জন্য ভাল রাখা যে ছোটখাট শরীরটা—তাদের কোনো দোহাই দিয়ে নয়। স্বনামে স্বকণ্ঠে অতনুকুমার ঘোষ নিজের নামোচ্চারণ করে কথা বললো।

বললো—না, আর অনুরোধ করবেন না। ওই সেলাম পাওয়া বাড়িতে, গাড়িতে, লিফটে, ঠাণ্ডা ঘরের গদি আঁটা ঘোরান চেয়ারে

আর আমি কোনোদিন বসব। না বহু বহুদিন ঘাস ধুলো মাটি গাছ রক্ত ছেলেপুলে পুকুর আকাশ বৃষ্টি থেকে আলাদা রয়েছি। কিছু মনে করবেন না। ছাড়লাম, কেমন!

অতনু ফোন ছেড়ে দিল। এবার একটা সিগ্রেট খেতে ভাল লাগবে ভেবে, ও ধরাল পাশের ঘরে এসে। দেয়ালে ঘড়ি ছিল। সময় দেখল প্রায় পাঁচটা. মানে ভোর হয়ে এসেছে। শরৎকাল বলেই আব্ছা অন্ধকারে বাইরেটা ঝাপসা।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল অতনু। বাগানে শিউলি গাছের তলাটা সাদার ওপর লাল ছিটে দেওয়া চাদর পাতা। এই সময় কোথা থেকে যেন ফুরফুরে হাওয়া আসে। অতনু অনুভব করল অপূর্ব শিরশিরে বাতাসে ওর গায়ে কাঁটা। অর্থাৎ ওর চামড়াতেও হাওয়া লাগে। পূব আকাশে অতনু দেখলো কাঁচামিঠে আমের বোঁটার রং। ওদের বাড়ির পাশের বিহারী ভাগলপুরি গাই-এর দুধ দোয়ার আগে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে খাটালে নিয়ে যাচ্ছে। আর বাছুরটা, অতনু দেখলো, মায়ের সঙ্গে সোহাগ করতে করতে দু'পা ছুটছে, আবার দাঁড়াচ্ছে, আবার ছুটছে।

অতনুর রাত কেটে গেল।

সরীসৃপ ভবন

—খবরটা শুনেছেন দাদা?

—কোন্ খবর?

—সে কি, আপনারা জানেন না এখনও! প্রশান্তবাবু, মানে আমাদের প্রশান্ত মুখার্জী···সেই যে লম্বা চওড়া চেহারা, ফর্সা রং, অনবরত সিগ্রেট খান। চারতলার ঘরের···

—কি দরকার ভাই অত সব খবরে! তুমি তোমার কাজ করো না। আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি।

একটি বড় পূর্ণচ্ছেদ—লম্বা দাঁড়ি। কাঁচা পাকা চুলসহ নিচু মাথা। বাঁ হাতের কাঁপা আঙুলে পুড়ন্ত সিগ্রেট। ডান হাতের তিন আঙ্গুলে ধরা ডট্ পেন। প্রেসের সস্তা কাগজের প্যাডে লিখে চলেছে—পুরুলিয়া'র জাউলা গ্রামের একটি নিমগাছের পাতা থেকে সূর্যের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে···।

—দেবেশবাবু কি ঘটনা জানেন নাকি কিছু?

—অ্যাঁ কোন্ ঘটনা? ওই মিস্টার পি, মুখার্জী হঠাৎ···

—দ্যাটস্ ইট। আপনি জানেন তাহলে? আমি তো বরুণদাকে জিগ্যেস করে কি রকম ফল্স পজিশনে পড়ে গিয়েছিলাম।

—যাওয়ারই কথা। সাত সকালে আপনি এখন যদি অফিসে এসে বিগ শট্-দের প্রসঙ্গে—

—তা নয়, আসলে এতো বড় একটা খবর হঠাৎ জানতে পারলে—

—বেমালুম হজম করে ফেলা উচিত।

দেবেশবাবুর প্রস্থান। ড্রপসিন ঝুপ্। অনির্বাণ দত্ত একা শ্লথ পায়ে তার এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট-এর ঘরের দিকে যেতে থাকে।

করিডোরের বাইরে সিঁড়ি আর লিফট-এর গর্তের পাশ কাটিয়ে একটি নিশ্চিন্ত ঘর। অনুজ্জ্বল আড়ম্বরহীন। চার বাই আড়াই ফুট টেবিলের ওপর বড় কাঁচ। রং তুলি পেনসিল প্যাস্টেল পেন রাবার কাগজ কাঁচি ছেঁড়া ছবি লিটিল ম্যাগাজিন সিগ্রেট প্যাকেট দেশলাই এ্যাশট্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে টেবিলের ওপর। উল্টো দিকে অযত্নে পুরনো ভাল চেয়ার। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট প্রীতম আনন্দ-এর ঘর। ক্ষ্যাপাটে গোছের লোকটি চেয়ারের ওপর পা তুলে বসা। ঝাঁকড়া পাকা চুল, বোতলের তলায় কাঁচ লাগানো হাই পাওয়ার চশমা। চেয়ারের পিছনে দেয়ালে ধুলোমাখা কালো ক্যানভাস। একটা ছবি—গলা কাটা যুবতীর খোলা সুডৌল স্তনে হাত দিতে উদ্যত একটি কঠিন রোমশ হাত।

—মিস্টার আনন্দ কি বিজি নাকি?

—ওহ না। আয়াম নেভার বিজি। কাম ইন প্লিজ।

—অফিসের খবর কিছু শুনছেন নাকি?

—রিলেটেড টু হোয়াট বলুন তো?

—আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার মিস্টার প্রশান্ত মুখার্জী নাকি কাল থেকে....

—কিপ্ ইওর মাউথ শাট্, মাই ডিয়ার। ভুলে যান ওসব কথা। আপনার কাজ কি রকম চলছে, ভাল তো? আচ্ছা।

একটি গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। স্ট্যাচু য় রইলো সব কিছু। অনির্বাণ দত্ত অফিসের লাইব্রেরির পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো তার ডিপার্টমেণ্ট-এর দিকে। মুহূর্তে একবার চোখে পড়লো তাদের অফিসের পি, আর, ও কান্তি চ্যাটার্জি লাইব্রেরির কোণের দিকে একটি খোপের মধ্যে মানসী রায় বলে সেই নাট্য সমালোচক মেয়েটির সঙ্গে—হ্যাঁ ফ্লার্ট করছেন। বড় অবাক লাগলো। মিস্টার মুখার্জির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ কান্তি চ্যাটার্জি। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা অফিসের পর একসঙ্গে ক্লাবে যান। মুখার্জির খবর চ্যাটার্জির অজানা থাকার কথা নয়।

ব্যাপারটা প্রথম দিকে ধরতে একটু অসুবিধে হবে। মানে, বিশ্বাস-

যোগ্য মনে হবে না। অথচ এটি একটি ঘটনা। এবং ঘটনাটি এই যে—আচ্ছা, তার আগে দুএকটা কথা বলে নিই। ইংরেজী 'নিউজ' শব্দটির প্রতিটি অক্ষরের আলাদা অর্থ—North East West এবং South এই শব্দ কটির আদ্যাক্ষর নিয়ে NEWS। আমরা যে অফিসের কথা বলেছি, সেটিও এই পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-এর ঘেরা দেওয়া একটি সংবাদ (পত্র) অফিস। "বহুল প্রচারিত এবং পরিচ্ছন্ন সংবাদ পরিবেশনকারী" এই মুখবন্ধ দেওয়া "মুক্তধারা" সংবাদপত্র এবং অফিসের কথা বলছি। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, না থাকলেও থাকা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি তাবৎ ব্যাপারের উন্নতি ও প্রচারকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন এই মুক্তধারা সংস্থা। দেশবাসী এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবেন, এমনই একটি বিস্তৃত সংস্থার স্থানীয় অফিস কতো বড় হতে পারে এবং কতো বহুমুখী হ'তে পারে এঁদের কর্মপদ্ধতি ও তার বিন্যাস।

এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশাল সংস্থার, ওয়ান অব দ্য ভি আই পি'জ, মার্কেটিং ম্যানেজার মিস্টার প্রশান্ত মুখার্জি। স্কচ ছাড়া খান না। অধস্তন কর্মচারীরা স্যার বলেন। একেবারে টপ্ ওপরওয়ালাদের সঙ্গে…

যাক ঠিক আছে। অত খবর জানার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। সেই অবিশ্বাস্য খবর এবং ঘটনাটি এই যে—একদিন সকালবেলা থেকে মিস্টার মুখার্জিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান মাঝবয়েসী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকটা হঠাৎ হারিয়ে গেলেন। তিনি কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, আদৌ বিশেষ কোথাও গেলেন কি না, কিছু জানা গেল না। শুধু একটি জলজ্যান্ত মানুষ 'নেই' হয়ে গেল।

এবং এই 'নেই' হয়ে যাওয়াটা কোনো নিউজ হ'ল না। হ'তে পারলো না। এমন কি হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ-এর সেই সামান্য বিজ্ঞাপনের আড়ালে চাপা পড়া জায়গাটাতেও এই হারিয়ে যাওয়া ভি আই পি—ভদ্র লোকটির কেউ খোঁজ নিল না। অনির্বাণ দত্ত নতুন লোক। মোটে বছর দেড়েক হয়েছে সে মুক্তধারা-র গ্রামীন সংবাদ

বিষয়ক বিভাগে চাকরি করছে। ওপরতলার ব্যাপারে সে বিশেষ কিছু জানে না, জানা সম্ভবও নয়। যেটুকু সে জানে তা হচ্ছে—এই বিরাট অফিসে ভি আই পি অফিসিয়্যাল স্টাফ যে কজন আছেন—মিস্টার মুখার্জি হচ্ছেন তাঁদের একজন। দেখেছেও বেশ কয়েক বার। কখনও করিডোরে, কখনও লিফ্ট-এ। মুখের দিকে কখনই স্পষ্টভাবে তাকাতে পারেনি। লিফ্ট-এর ঘেরা টোপে এ ধরনের লোকের সঙ্গে ওঠার সময়, অনির্বাণ সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। মনে হয় তার নিজের তখন সিঁড়ি ভাঙা উচিত।

ভয়ঙ্কর আত্মম্ভরিতা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পা ফেলে হাঁটতেন মিস্টার মুখার্জি। দিন দশেক আগে অনির্বাণ দেখেছে, মিস্টার মুখার্জি চার তলার করিডোরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। গত দু দিন সে ওঁকে শেষবারের মতো দেখেছে।

তাপসের সঙ্গে দেখা করে অনির্বাণ নিচেয় আসছিল। দু পাশের সারবন্দী ঘরের মাঝখানে লোডশেডিং-এ অন্ধকার করিডোর। মিস্টার মুখার্জির ঘরের দরজা খোলা। লোডশেডিং-এও ওঁর ঘরের আলো জ্বলে। কিন্তু এয়ারকুলার বন্ধ থাকে—তাই দরজা খোলা। সামনে দাঁড়িয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলছিলেন মিস্টার মুখার্জি। ঘরের আলো তেরছা এসে পড়েছিল ওঁদের গায়ে এবং করিডোরে। প্রতিদিনের মতোই সুঠাম ভদ্রলোকের পরনে ছিল হাল্কা জাম রং সাফারি স্যুট; হাতে ছিল যথারীতি সোনালি জলের গ্লাস। ঠোঁটে লাগা সিগ্রেট। অনির্বাণের দিকে ওঁরা কেউ ফিরে তাকান নি। অনির্বাণ হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে তাকিয়েছিল। মিস্টার মুখার্জি হাসতে হাসতে বাংলা ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলছিলেন। সেই ভদ্রলোক হারিয়ে গেলেন। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

নিজের চেয়ারে বসেও কাজে দেওয়ার মতো মন তৈরি করতে পারছিল না অনির্বাণ। কি আশ্চর্য, তাকে কেউ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করারই সুযোগ দিল না। সবচেয়ে তার রাগ হল আর্টিস্ট প্রাতম আনন্দ-এর ওপর। বাকী দুজন না হয় নেহাৎ ছাঁপোষা গেরস্থ টাইপের লোক।

যে কোনো কৌতূহলকেই এরা সন্দেহের চোখে দেখে, ঝামেলা মনে করে। নিজেরা আড়াল হয়ে থাকতে চায় এবং অনির্বানের ধারণা এরা অপার-চুনিস্ট কম্যুনিস্ট। ড্যাম্ ইট্। কিন্তু একটা শিল্পী, খ্যালাক্ষ্যাপা পাগলের মতন থাকেন, সেই প্রীতম কেন হঠাৎ গুটিয়ে গেলেন! এমন একটা ভাব করলেন, মনে হল, মিস্টার মুখার্জির নাম করা মাত্রই উনি চঞ্চল হয়ে একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন।

কেন, এতো ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের মনে হচ্ছে সবাই যে শুধু এড়িয়ে যাচ্ছে তাই নয়। আতঙ্কে গর্তে ঢুকে পড়ছে।

বোরো ধানে ঘুনপোকা লাগার চিকিৎসা বিষয়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখার কথা অনির্বাণের। কাগজ পত্র টেনে নিল। আর তখনই চোখে পড়লো—উল্টো দিকের টেবিলেব কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে অরূপ আর দিবাকর সমস্ত কিছু আলোচনা করছে। আড়ষ্ট চাপাভাব দুজনের। অন্যদিন হলে অনির্বাণের কিছু মনে হত না। অথচ আজ ওর মনে হল ওরা নিশ্চয়···।

—দিবাকর, কি ব্যাপার!

চমকে ফিরে তাকালো দুজন! অনির্বাণ অবাক হল ওদের চমকে ওঠা দেখে। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে ঠিক করে নিয়ে অনির্বাণ কায়দা করে জিগ্যেস করলো—কেমন আছেন, ভাল তো? ইচ্ছে করে ঠোঁট ফাঁক করে হাসলো অনির্বাণ।

বশংবদ নিয়মনিষ্ঠ এবং কোন সাতে পাঁচে না থাকা কর্মী হিসাবে দিবাকর সামন্তের খ্যাতি আছে। ভদ্রলোক ঠিক সময়ে আসেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিটও বেশি থাকেন না। "কেমন আছেন, ভাল তো"—সাধারণতঃ এর বেশি আত্মীয়তা পাতান না কারুর সঙ্গে। তবু মানুষের মন। অরূপ মিত্র এমন একটা কথা পেড়ে পাশে বসলো যে দিবাকর সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়ে দিতে পারলেন না। বরং একটু কৌতূহল আজ-ই দেখিয়ে ফেললেন। আর ঠিক তখনই···।

ভ্রূ কুঁচকে রুক্ষ মুখে তাকালেন অনির্বাণের দিকে।—তার মানে? অনির্বাণ আর একটু রহস্য করলো। লেখার কাগজ টেনে নিল।

তারপর নিস্পৃহ গলায় ওদের দিকে না তাকিয়ে আবার বললো—বলছি, ভালো আছেন তো? কাজকর্ম চলছে ঠিকমতো?

অরূপ মিত্র অধৈর্য গলায় হঠাৎ বললো—কি বলতে চাইছেন বলুন না। নিজেদেব মধ্যে আবার…

অনির্বাণ হাসি চেপে রাখলো। কিন্তু এটাও বললো একরকম সন্দেহের বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘবে। অভিনয়ের আড়চোখে নিঃশব্দে তাকালো দুজনের দিকে। ঘাড় হেলিয়ে গম্ভীব গলায় বললো—কৌতূহল ভাল না। একটু থেমে মুখ নামিয়ে আবার বললো—লেখাটা শেষ করতে হবে।

আর মুখ তুললো না অনির্বাণ। বুঝতে পারলো দিবাকর সামন্তের টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে অরূপ মিত্র। হিস হিস করে একটা শব্দ। যেন পায়ের বদলে বুকে হেঁটে চলে গেল অরূপ। দিবাকর সামন্তর চোখ প্রুফ দেখার কাগজের তাড়ায়।

অফিসের কাজকর্ম চলছে পুরোদমে। অদ্ভুত লাগলো অনির্বাণের। সবাই বড্ড বেশি মনযোগ দিয়ে কাজ করছে। একটুও কথাবার্তা কিংবা হাসি ঠাট্টাব শব্দও হচ্ছে না। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আজ তো কেবলই এ টেবিল ও টেবিলে উঠে যাওয়া এবং খানিকক্ষণ করে কথা-বার্তাটা বলে আসাটাই স্বাভাবিক 'ছল। একজন বিগশট্ ি সিং। এ নিয়ে কেউ আলোচনা করবে না! অথচ মনে তো চ্ছে—খবরটা মোটামুটি সকলেই জেনেছে। অানর্বাণ উঠে পড়লো টেবিল ছেড়ে। চেয়ারের পায়ায় রবার লাগানো থাকলেও সামান্য শব্দ হল। দিবাকর সামন্ত মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন ওর দিকে। চোখ দুটো গোল। পলক পড়ে না। অনির্বাণের ভেতরটা দেখে নিতে চাইলো।

অনির্বাণ উঠে এসে মুখ নিচু করলো সামন্তের সামনে।—ব্যাপারটা কি বলুন তো? গেল কোথায় লোকটা?

দিবাকর কথা বললো না। শরী টা সামান্য কেঁপে উঠলো। ফোঁস ফোঁস শব্দ হল কয়েকবার। আস্তে আস্তে চোখ রাখলেন কাগজে। অনির্বাণ চলে গেল।

ছটফটে মনের অবস্থা নিয়ে বসে থাকা যায় না। অনির্বাণ চারতলায় যাবে। শুভেন্দু চৌধুরি—লেখক মানুষ; গিয়ে খানিকক্ষণ বসা যাবে ওঁর ঘরে। কাগজের জন্য দু একটা বইপত্রের সমালোচনা কিংবা টুকিটাকি লেখা পত্র ছাড়া, নিজের সাহিত্য চর্চা আড্ডা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা, এগুলোও শুভেন্দুর ডিউটির অন্তর্গত। কিছুক্ষণ ঐরকম একজন লেখকের সামনে বসলে মন হাল্কা হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনির্বাণ দেখলো নিউজ এডিটর শীতল সোম টলমল পায়ে বাথরুমের দিকে চলছেন। মনে হল, অনির্বাণ নিজেই একটা অপরাধ করেছে ওঁকে দেখে। মুখ নিচু করে উঠে এলো। আচ্ছন্ন চোখ একবার তুলে শীতল সোম ওকে দেখলেন। সাধারণত এরকমভাবে এঁরা দেখেন না। অনির্বাণ হেঁটে গেল। সোম সাহেব আস্তে আস্তে এঁকেবেঁকে বাথরুমে ঢুকলেন।

মিস্টার মুখার্জির ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনা থেকেই অনির্বাণের ঘাড় ঘুরে গেল দরজার দিকে। লোডশেডিং নেই, স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ। কিছু দেখার নেই। উলটো দিক থেকে হেঁটে আসছিল অনির্বাণের গ্রামীণ সংবাদ বিভাগেরই প্রলয় নন্দী! তাকিয়েছিল অনির্বাণের দিকেই। অনির্বাণ তাকাতেই চোখ ঘুরিয়ে নিল। একটিও কথা না বলে—চাকা লাগানো পায়ে গড়িয়ে যাওয়ার মতো নিঃশব্দে পাশ দিয়ে চলে গেল। একটি সরীসৃপ।

একমাত্র শুভেন্দু চৌধুরি ঘরে গল্প করছিলেন জমিয়ে নির্মল বাগচীর সঙ্গে। হাসি কথাবার্তা চা সিগ্রেট ঘরে পরিবেশটাই আলাদা। প্রাণহীন নয়, জীবন্ত। অনির্বাণ দরজার হাতল সরিয়ে মুখ বাড়ালো।

—শুভেন্দুদা আসবো?

—কে, অনির্বাণ! আরে এসো এসো। বসো।

অনির্বাণ বসলো। পাশে বসা নির্মল বাগচীর দিকে তাকিয়ে হাসলো।—ভাল আছেন দাদা?

—এই তো চলছে। তোমার কি খবর? নির্মল হাসলেন অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে।

—খারাপ না। ভালোই। অনির্বাণ শুভেন্দুর প্যাকেট থেকে সিগ্রেট নিয়ে ধরালো।

শুভেন্দু, নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, তোকে যা বলছিলাম, ট্রেন থেকে মেয়েটা যখন নেমে এলো, সেই সময়কার ফ্রিজিং শটটা…

খানিকটা শুনে অনির্বাণ বুঝলো—ওরা ইউ এস আই এস-অডিটোরিয়ামে দেখা কোনো ছবি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছেন। শুভেন্দুর ঘরটি সুন্দর গোছানো। জায়গাও বেশি। হাত পা ছড়িয়ে ফাইবার-চেয়ারে বসা যায়। এ ঘরে আরও একজন বসেন। দীনদয়াল রাও। তিনি আজ আসেননি।

আলোচনা কথাবার্তা একটু স্তিমিত হলে অনির্বাণ জিগ্যেস করলো—শুভেন্দুদা, ঘটনা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কি ব্যাপার বলুন তো? আমি তো সকাল থেকে…

একটি রেকর্ড বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে গেল। নির্মল বাগচী অবাক হয়ে তাকালেন ওদের দিকে। শুভেন্দু আস্তে আস্তে বললেন—কোন্ ঘটনা বলো তো?

—সে কি আপনারা জানেন না? এই তো আপনাদেরই চারতলার মিস্টার মুখার্জি, মানে…

তুমি চা খাবে? শুভেন্দু জিগ্যেস করলেন।

নির্মল বাগচী তখনও অবাক। জিগ্যেস করলেন—কি হয়েছে মিস্টার মুখার্জির?

শুভেন্দু নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন—শোন, তুই কিন্তু তাহলে সুহৃদবাবুর বইয়ের সমালোচনাটা কালকেই দিয়ে দিস। আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি 'অশনি'র লেখাটা নিয়ে।

শুভেন্দু টেবিলে নিজের হাতের কাগজপত্র টেনে নিলেন। খুব দ্রুত গভীর ভাবনায় ডুবে যেতে লাগলেন।

নির্মল উঠে দাঁড়ালেন। অনির্বাণ, অপ্রস্তুত অনির্বাণও দাঁড়িয়ে পড়লো।—শুভেন্দুদা, চলি তাহলে।

অ্যাঁ, তুমি চ খাবে না? আচ্ছা এসো।

হঠাৎ সব আলো নিভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে বিন্দু বিন্দু কয়েকটা চোখের তারা জ্বলতে শুরু করলো। কয়েকটা সরু সরু চেরা জিভ হিসহিসিয়ে উঠতে লাগলো। অনির্বাণ আর নির্মল বাগচী বাইরে আলোকিত করিডোরে বেরিয়ে এলো।

—মিস্টার মুখার্জির কি হয়েছে?—নির্মল জিগ্যেস করলেন অনির্বাণকে।

—ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ হারিয়ে গেছেন। আপনি জানেন না?

—আচ্ছা, চলি। করিডোরের উলটো দিকে নির্মল অদৃশ্য হলেন। অনির্বাণ ভাবলো, শুভেন্দুদা কি নিজের ঘনিষ্ঠ লেখক বন্ধুকেও এতো বড় খবরটা বলেন নি!

ইউনিয়ন একটি থাকতে হয় তাই আছে। কথা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট গোলকেশ বর্মা জানিয়েছিলেন অনির্বাণকে—আপনি নতুন লোক, কেন উটকো ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাচ্ছেন। তাছাড়া আমাদের ইউনিয়ন তো আর রহস্য-সন্ধানী নয়। ওপরওয়ালাদের ব্যাপার আমাদের জানতে নেই।

অফিসে কাজ চলছে। সহকর্মীরা পাশাপাশি বসছেন। বাথরুমে যাচ্ছেন উঠে। চোখে চোখ পড়লে ঠাণ্ডা হাসছেন। সৌজন্য বিনিময় করছেন। হাঁটাচলা কথাবার্তায় শব্দ কম। হিস হিস সর সর করে যাতায়াত করছেন এঁকেবেঁকে বুকে হেঁটে। মাঝে মধ্যে এক আধজন লম্বা ঘাড় তুলে দুলে দুলে ঘুরে দেখছেন, আবার নেমে গিয়ে আবর্তিত হচ্ছেন নিজের পরিধিটুকুর মধ্যে।

অনির্বাণের টেবিলের ওপর কয়েকটা চিঠির মধ্যে একটি অফিসিয়াল সাদা খামের ওপর এক কোণে রোমান ছাঁদে ইংরেজী লেখা 'মুক্তধারা'। অনির্বাণের নাম লেখা। সংক্ষিপ্ত দুটি লাইন—ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উইল বি প্লিজড্ টু মিট মিস্টার অনির্বাণ ডাট এ্যাট ফোরটিন থারটি আওয়ারস্ অন···। নিচে সেক্রেটারি মিস্ প্রিয়াংকা দেব-এর মিষ্টি সই।

মুহূর্তে ডেপুটি 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শুভঙ্কর সেন-এর মুখটা ভেসে উঠলো অনির্বাণের চোখের সামনে। দু তিনবার দেখেছে আগে। বেয়ারার হাতে শ্লিপ দিয়ে তিনখানা দরজা পেরিয়ে অনির্বাণ ডেপুটির ঘরে ঢুকলো। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উলটো দিকে রিভলভিং চেয়ারে দুধসাদা সাফারি স্যুট পরা ঠাণ্ডা নায়ক। অনির্বাণকে দেখেই স্বপ্ন ভেঙ্গে হাসলেন।

—মিস্টার দত্ত? বসুন। য়ু্য আর ভেরি প্যাঙ্ক্চুয়াল!

—থ্যাঙ্কয়ু্য।

—মিস্টার দত্ত, দেয়ার ইজ্ আ গুড নিউজ ফর য়ু্য। আচ্ছা, আপনি কি সামহাউ মেণ্টালি ডিসটার্ব্ড?

—না, সেরকম কিছু—

—য়োর ওয়াইফ ইজ ক্যারিং, তাই না? আপনার বাবা অসুস্থ। ভাই নকসাল ইমোশনে জেল খেটে বেকার—ঠিক না? আপনার পদ্মপুকুরের বাড়িটা নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে প্রবলেম চলছে। মোর ওভার, আপনি আবার একটি প্রাইভেট অফিসে ক্রিকেটের উইকেটের মতো চাকরি করছেন।...টি অর কফি?

—আজ্ঞে! মানে, আপনি সব খবরই...কফি, কফি।

—আ গুড নিউজ ফর য়ু্য। জগদীশ—কফি।

মৃদু বাজনা বাজছে অনির্বাণের মাথার মধ্যে। বিন বিন ঝিঝি ডাকা কুলারের শব্দ। লম্বা সিগ্রেটের ডগায় নীলচে ধোঁয়া। জগদীশ না। মিস প্রিয়াংকা দেব-এর হাতে কফি।

—ওয়েল, মিস্টার দত্ত, য়ু্য হ্যাড আ টক উইথ্ দেবেশ আনন্দ বরুণ শুভেন্দু চৌধুরি দিবাকর এটসেট্রা। এ্যাম আই রাইট? নিন কফি খান। বাট উই ওয়ান্ট আওয়ার স্টাফ টু বি ভেরি সিনসিয়ার টু দেয়ার ওন্ পার্টিকুলার ওয়ার্ক। এ্যাণ্ড নাথিং এলস্। ডু য়ু্য স্মোক্? এ্যাম আই ক্লিয়ার টু য়ু্য? য়ু্য আর সোয়েটিং।

অনির্বাণ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সাপুড়ের সেই মোটা বেলুন বাঁশীটা দো-চেরা আওয়াজে ইনিয়ে-বিনিয়ে প্যাঁ পোঁ করে বাজছে।

আর টেন-কম্যাণ্ডমেণ্টস্ ছবির ম্যাজিসিয়ানের সেই শক্ত লাঠিটা ক্রমশঃ নরম হ'তে হ'তে এঁকে বেঁকে…

—অথরিটি আপনাকে একটা প্রোমোশন অফার করেছে। আপনি বাদলবাবুকে চেনেন? অলরাইট, মিস দেব উইল টেক য়্যু টু হিম। আই বিলিভ, দ্য প্রোমোশন উইল বি প্লেজেণ্ট টু য়্যু, অন্ততঃ আপনার পারিবারিক দিক থেকে…আচ্ছা, আপনি ওয়েটিং পার্লারে গিয়ে বসুন। গেট্ কমফর্টেবল।

দরজার বাইরে অনির্বাণ। হাঁটছে কি! কানের মধ্যে মাথার ভিতরে বাঁশীর একটানা সুর। পলকহীন চোখে দৃষ্টি উধাও। মাথা নেমে এসেছে, বুক ঘষে চলেছে করিডোরের মেঝেয়, পেটে ঠাণ্ডা দুটো পা জুড়ে গিয়ে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। সারা গায়ে ফোস্কা চক্কর। একটা নুয়ে পড়া ঠুনকো নরম কঞ্চি মেরুদণ্ড অনির্বাণকে ক্রমশঃ এপাশ ওপাশ বাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা ঘরের দিকে।

ভিজে বালুচর ছেড়ে উঠে আসতে গিয়েই সরোজের মনে হয়েছিল পা আটকে গেছে। কেন। হঠাৎ এমন হল কেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে তার শরীরে কিংবা মনে নিশ্চিত বার্ধক্য এতোখানি দখল নিতে পারে নি যে আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার সমুদ্রের ঢেউ খাওয়ার ধকল সইতে পারবে না! তবে!

মাসল ক্র্যামপ! শিরে টান! নাকি ক্রমাগত ভারি নোনা জলের ধাক্কা আর বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ায় সারা শরীরে ক্লান্তির অবসাদ। সময় কি আরও বেশি কেটে গেছে!

কিন্তু অতশত ভাবা গিয়েছিল কোথায় তখন! একটু ভাবতে না ভাবতেই সরোজ দিব্যি অনুভব করেছিল, আসলে টান ধরেছিল তার চোখে। বাঁ দিকে, স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি। নরম সৈকতের যেখানে তারা স্নানে নেমেছিল—উঠে আসার সময় সমুদ্র পিছনে রেখে বাঁ দিকেই ভিড় বেশি, আর সেদিকেই স্বর্গদ্বারের নাম দিয়ে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল নরকের প্রবেশ পথ। পথেই ভিখারী কুষ্ঠরোগী বিকলাঙ্গ সার দিয়ে পড়েছিল ইলো নো রা শালপাতা ঠোঙা পড়ে থাকা অপরিচ্ছন্ন বালুচরে। কেউ শুধু বালির ওপর, কেউ কাঠের বাক্সে, কেউ বা নোংরা কাঁথা গামছা বিছিয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল চাল ডাল খুচরো পয়সা আলু পটল। স্নান সেরে স্বর্গদ্বার পার হ'য়ে আসার সময় পুণ্যার্থীরা দরিদ্র নারায়ণের সেবায় হাত খুলছিল। চোখ টেনেছিল সেই দিকেই। শরীরে ভার মাথায় ঘোমটা গায়ে দামী রঙীন আলোয়ান জড়ান—সব মিলিয়ে অনেকখানিই ঢাকা। তবু চকিতে মুখের একটা পাশ আর পুরো মানুষটার কাঠামো যতোখানি

স্নান সারা নোনাজলে লাল চোখে ধরা পড়েছিল—হ্যাঁ, ততোখানিই হঠাৎ ভিজে বালুচরে পা আটকে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অন্য কিছু নয়। পা আটকেছিল—হঠাৎ বুঝি সরোজের মাথার মধ্যেই একটা বিশাল ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার অতর্কিত আঘাতের মতো কোনো অদৃশ্য অলৌকিক অযাচিত বিস্ফোরণে। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড সম্ভবতঃ —তবু তার মধ্যেই ফেটে পড়া নতুন সদ্য নোনাজলের ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস ছুটে এসেছিল পা-এর পাতা ভিজিয়ে। সুর্ সুর্ করে বালি স'রে সরোজ যেন ক্রমাগত অতীতের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছিল দ্রুত। আর তখনই রূপাই দূর থেকে চিৎকার করে উঠেছিল—বাবা, সরে যাও, একটা বড় ঢেউ আসছে।

চকিতে চোখ ঘুরে এসেছিল বাঁ দিকের স্বর্গদ্বারের দিক থেকে—কিন্তু বালির গর্ত থেকে অত তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে শুকনো জায়গায় উঠে আসা সহজ হয় নি। তার আগেই হাজারটা সাপের ফণা তোলা নীল ঢেউ ফেটে গিয়ে কলকল করে ছুটে এসেছিল সাদা হাঁসের দঙ্গল। জোর ছিল, তোড় ছিল। পড়ে যেতেও পারতো সরোজ। কিন্তু পড়া আর না পড়ার মাঝামাঝি অবস্থায় টালমাটাল—কি করে উঠে এসেছিল। খালি নুন ফোটা বালি বালি গায়ে, ভেজা পাজামা লটপট করতে করতে সোজা হলিডে হোম-এর দরজা। দুবার টোকা দিয়ে বসে পড়েছিল বারান্দায়। টোকা দেওয়ার দরকার ছিল না, কেননা ভিতরে কেউ ছিল না। সকলেই সমুদ্রস্নানে। বেঁচে গিয়েছিল সরোজ। মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে তখনও ক্রমাগত যে ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছিল, মুখে কি তার কোনো ছাপই ফোটে নি! নিশ্চয়ই ফুটেছিল। কিন্তু অমন করেই বা কেন! চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল কোথায়। সেই, সেই নীলাচলাবাসেই কি তবে! দেখার পরে চিনে ফেলা মাত্র ছুটতে পারলে মন্দ হ'ত না। একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে চমকে দিত। বয়স পৌঁছে গেছে নিরাপদ সময়ে। সুতরাং হাত ধরে ফেলে গালে একটা টোকা দিয়ে ফেললেও আপত্তির কিছু থাকতো না। চোখ টেরিয়ে দু একজন কেউ তাকালে তাদের অবলীলায় অগ্রাহ্য করতে পারত সরোজ।

ভিজে চুল খালি গায়ে টানটান সোজা দাঁড়িয়ে ঠিক সেইভাবে বলতে পারতো—এই যে, আবার দেখা হল।

কি বলতো ঈশানী। না, বলা তো পরে। তার আগে ওর সেই তেজী দাম্ভিক দৃষ্টি বাঁকা ভ্রু তুলে চোখের কোণ দিয়ে শুধু তাকাতো। আর তখনই দুই মেরুর দুটো মানুষের বুকের মধ্যে দুরকম ঝড় উঠতো। বিশ বাইশ বছর আগেকার ঝড়। শেষ যে ঝড় উঠেছিল মাত্র বছর পাঁচেক আগে। সরোজের রক্ত ফুটতো টগবগ করে, আর ঈশানীর শান্ত সুনীল সরোবরের জলে অদৃশ্য নীরব টানা পোড়েন শুরু হ'তো। হয়তো কথা বলতো তারও পরে।—কেমন আছো? এতো রোগা কালো হয়ে গেছ কেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে সরোজ জিগ্যেস করতো—কোথায় উঠেছো?

—জানো না, মা-র বাড়ি আছে সী-বিচ-এর শেষ দিকে, নীলাচলাবাস।

—মা-র বাড়িতে কি মা-ও আছেন নাকি এখনও। আর কে এসেছে সঙ্গে?

—কে আছে আমার সঙ্গে আসার!

হয়তো এই গোছের কিছু বলতো। তারপর পায়ে পায়ে চলতে শুরু করে দিত ঈশানী। দৃষ্টি চঞ্চল হলেও চোখ থাকতো নিচে বালির দিকে। দুলে দুলে কোমরে ভাঁজ ফেলে ভারি বুকে সামান্য ঢেউ দিয়ে ভরাট নিতম্বের ওঠানামায়···

—একি বাবা বসে বসে ধুঁকছো নাকি? শরীর খারাপ।

ইচ্ছে করেছিল টেনে চড় লাগায় একখানা। বাবা কি বুড়ো নাকি যে ধুঁকবে। রূপাইটার কথাবার্তাই ওইরকম। সব সময় ভাবে বাবার শরীর খারাপ। মামনি সে তুলনায় অনেক বেশি স্মার্ট। মেয়েমানুষ বলেই কি না কে জানে। আঠারো বছর বয়সে বাহান্নর বাবাকে দেখে বুঝতে পারে, বাবা দুর্বল প্রৌঢ় নয়। বড় জোর হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলতো—বাবা রেস্ট নিচ্ছো? আজকে হাঁপিয়ে গেছো নাকি?

কিন্তু তাও বলে নি। শুধু কাছে এসে ভাল করে সরোজকে দেখে বলেছিল—কি হয়েছে বাবা, বসে আছো কেন? এখনও বাথরুমে ঢুকে চানটা সারো নি?

ভ্রুকুটি করে তাকিয়েছিল মেয়ে। খুব খারাপ সে দৃষ্টি। কি যেন খুঁজে পেতে চাইছিল। যাই হোক না কেন, মেয়েমানুষ তো বটে। বয়সও হয়েছে, জ্ঞানগম্যিও নেহাৎ কম নয়। হুল্লোড়বাজ মেজাজী বাপকেও ভাল চেনে। বরং একটু বুড়োটে ভাব করতে হ'য়েছিল সরোজকেই। মেয়ের চোখের দিকে না তাকিয়েই বলেছিল—একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। আমার কি আর তোদের বয়স নাকি!

—ওহ্ কি কায়দা!—খিলখিল করে হেসে উঠেছিল মেয়ে। —ওই যে, মা এসে পড়েছে। চলো ওঠো। আজ যা ঘুমুবো না—!

জয়াও চলে এসেছিল। বালির ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে হেঁটে এসে হাঁপাচ্ছিল রীতিমত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে বলেছিল—বললাম তোমাকে চাবিটা নিয়ে যাও—তা নয় উঠে চলে এলে। যাও, আগে তুমি ঢোক বাথরুমে।

বড় অদ্ভুত আকস্মিক—এই আসাটা। রাজ্যের কাজকর্ম ফেলে রেখে দরকারও এমন কিছু ছিল না। ধরে বসলো রূপাইটা। ছেলেটা দেখতে শুনতে হাতে পায়ে বড় হয়েছে, জ্ঞানের কথাও বলে অনেক। হয়তো ধরেই নিয়েছে যেহেতু ও ডাক্তার, সেই কারণে উপদেশ দিয়ে কথা বলাটা ওর অধিকার। পুরীর সমুদ্রের ধারে বাবার নাকি কয়েকদিন রেস্ট-এর খুব দরকার। "একটানা এতো খাটুনি আর অমন ফাস্ট লাইফ তোমার ভাল নয়। আমি টিকেট কেটে ফেলছি এবার।" আসলে পুরোটাই হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া সরোজ খুব ভাল বোঝে এসবের পিছনে আসল সমর্থনের খুঁটি কোন্ মানুষটি। জয়া নিজে সামনা-সামনি বিশেষ কিছু বলে না। বলার ইচ্ছে থাকলেও পারে না সরোজের কাজ আর ব্যস্ততা দেখে। বড় মাঝারি ছোট যা-ই বলা হোক না কেন, যে কোন একটা ইণ্ডাস্ট্রি পুরোপুরি নিজে চালানর ধকল বড় কম নয়। লেবার ট্রাবল থেকে শুরু করে টেণ্ডার মিট করা এবং

প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য ভি আই পি-দের এন্টারটেইন করা—অনেকটাই সরোজকে একা সামলাতে হয়। তার ওপর আছে দৌড়ঝাঁপ। আজ ডিব্রুগড় কাল হায়দ্রাবাদ কিংবা জামশেদপুর। এর মধ্যে থেকে সময় বার করে পুরো পাঁচটা দিন সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া …না, ভাবা যায় না। অথচ রূপাই সেটা ঠিক করিয়ে ছাড়ল।—বাবা আমি ইংল্যাণ্ড চলে গেলে এরপর আর কবে সুযোগ হবে জানি না। তোমার কোন কথা এবার শুনছি না। মনে আছে তোমার এর আগে যখন আমরা পুরী যাই সব একসঙ্গে, তখন আমার বয়স…কত হবে বা? বছর দশেক! আর মামনি তো একেবারে দুগ্ধপোষ্য, তাই না?

—চুপ কর, চুপ কর।—মামনি ঝেঁজে উঠেছিল। দুগ্ধপোষ্য। আমার দিব্যি সব মনে আছে আগের বারের কথা।

—তোরা যা, তোরা যা।—হুইস্কির গ্লাসে বরফের টুকরো মেশাতে মেশাতে সরোজ জবাব দিয়েছিল।—তোর মা'কেও নিয়ে যা সঙ্গে। আমার সময়টা কোথায়?

উত্তর দিয়েছিল মামনি,—ইস্, সময় কোথায়! সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ক্লাবে বারে কাটানোর সময় হয়, আর ফ্যামিলির সঙ্গে কটা দিন পুরী ঘুরে আসা যায় না।

জয়া কোনো কথা বলছিল না। চুপচাপ একটা নতুন পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে শুধু সব শুনে যাচ্ছিল। মিটিমিটি হাসির ভাব ছিল মুখে। চেয়ারে এসে বসতে বসতে সরোজ আবার বলেছিল—ওরে, ক্লাবে যে রাত বারোটা পর্যন্ত থাকি, সেটাও তো আমার চাকরি!

—ওঃ, হো, কতো একেবারে চাকরি করতে হয় সাহেবকে!—মুখের কথাটা লুফে নিয়ে উত্তর দিয়েছিল মামনি।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে সরোজ বলেছিল—তবে কি! তোরা কি ভাবিস, আমি শুধু ক্লাবে মদ খেতে আর ফুর্তি করতে যাই?

—না, না, তুমি পুজো করো বসে বসে।—খর খর করে উঠেছিল মামনি।

সরোজ তাকিয়েছিল জয়ার দিকে। বলেছিল—আচ্ছা তুমি শুনছো কিছু! কিছু বলো তোমার ছেলেমেয়েদের!

—আমি কি বলবো! জয়া মুখ তোলে নি পত্রিকার পাতা থেকে। কিন্তু গলা শুনে বোঝা যাচ্ছিল, সে এক ধরনের চাপা আনন্দ উপভোগ করছিল নিঃশব্দে বাপ ছেলেমেয়ের কথায়। এবং তার এই নীরব শ্রোতার ভূমিকা যে পরোক্ষভাবে ছেলেমেয়েদেরই সমর্থনে তাও সরোজ বুঝতে পারছিল। এর মধ্যেই পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো রূপাই বলেছিল—যাকগে, আমি ওসব জানি না। সামনের শুকুরবার আমরা যাচ্ছি এটা ফাইনাল। বাবার দিকে তাকিয়ে আবার বলেছিল—তাছাড়া তোমার কয়েকটা দিন ফ্রেশ এয়ারে রেস্ট নেওয়াও খুব দরকার আমি বুঝতে পারছি।

নাহ, কোনো ওজর আপত্তিই এবার শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। বৌ ছেলেমেয়ে শুদ্ধ সরোজকে এসে পৌঁছাতে হল পুরী। হলিডে হোমটা-ও খারাপ নয়। কোন বন্ধুর বাবার কাছ থেকে আগাম লিখিয়ে রূপাই ই বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল।

কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল সরোজ। সাড়ে চারটে বাজে। ছেলে-মেয়েরা আর জয়া নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে এখনও ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে। বারান্দাটাই পছন্দ সরোজের, একেবারে সমুদ্রের মুখোমুখি। সামনের রাস্তা আর বালুচরটা ছেড়েই শুরু হ'য়ে গেছে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। বহুদূরে মেশামিশি হয়ে গেছে আকাশের সঙ্গে জল একটি আবছা রেখায়। তেজ কমে আসা হেমন্তের সোনালি রোদ সমুদ্রের অনেকখানি জায়গা নিয়ে চিকচিক করছে। ঢেউ ভাঙ্গা গর্জনের সঙ্গে এলোমেলো বাতাস উঠছে। ইতিমধ্যেই অনেকে বেরিয়ে পড়েছে বালুচরে বেড়াতে। বাচ্চারা ঝিনুক কুড়োচ্ছে। সামুদ্রিক গাম্ভীর্য আর বিশালতার মুখোমুখি বসে পড়েছে অনেকে।

বছর পাঁচেক আগে ঈশানীকে দেখে মনে হয়েছিল ভাদ্র মাসের ভরা টইটুম্বুর পুকুর যেন। সরোজের মনে হয়েছিল সাচ্ছল্য আর প্রতিষ্ঠা ওর অন্ধকার অতীতকে মুছে উজ্জ্বল করে তুলেছে একটা নতুন

মানুষকে। পপ সিঙ্গার ঈশানী দত্ত আর সরোজের কেনা সেই তলিয়ে যাওয়া ঈশানীর মধ্যে কতো তফাত! তবু ভাল লেগেছিল শেষ পর্যন্ত ঈশানী সত্যিই তলিয়ে যায় নি এটুকু দেখে। নয়তো সরোজের নিজেরও নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু থাকতো না বোধহয়। স্মাগলার গ্রুপের চক্রান্ত থেকে সরোজ তাকে হোটেল পর্যন্ত নিরাপদে আনতে পেরেছিল বটে কিন্তু তারপরে আর সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নি। হয়তো না পারাটাই স্বাভাবিক ছিল। অবাধ স্বাধীনতা উন্মত্ত যৌবনের মাত্র একটিই অনিবার্য পরিণতি। অথচ তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না সরোজের। বেলজিয়ামে গ্লাস টেকনোলজি পড়তে যাওয়ার ব্যবস্থা তখন তার পাকা। পর পর বেশ কয়েকখানা চিঠি লেখার পরে প্রায় মাস তিনেক পরে ঈশানীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিল সরোজ—"যতোটা উপকার তুমি আমার করেছো তার যেমন কোনো তুলনা হয় না, তেমনই যাওয়ার আগে যা দিয়ে গেছ—তার চেয়ে বড় প্রাপ্তিই বা আমার জীবনে কি হ'তে পারে! রাখতে পারলাম না এটাই সবচেয়ে বড় আঘাত। দেরাদুনে পিসীমার কাছে চলে যাচ্ছি, ওখানকার হাসপাতালের মেট্রন পিসীমা। তারপর কি করবো জানি না। তবে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করবো। তুমি তোমার কাজকর্ম করে যাও নিশ্চিন্তে…"

আর কোনো যোগাযোগ ছিল না ঈশানীর সঙ্গে। আড়াই বছর পরে ফিরে এসেও আর কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি ঈশানীর। ক্রমশই বিস্মৃতির আকাশে ধূসর মেঘের মতো হালকা হ'তে হ'তে ঈশানী প্রায় নিশ্চিহ্নই হ'য়ে যাচ্ছিল। গেল না, পৃথিবী গোল বলেই বোধহয়।

বাঙ্গালোরের রিজেন্ট থিয়েটার্স-এর পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় প্রায় তড়িতাহতের মতো সরোজ বলে উঠেছিল—স্টপ দ্য কার। ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাতেই সরোজ নেমে রাস্তা পার হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছিল থিয়েটারের দেওয়ালে বিরাট ছবির মুখোমুখি।

—তুমি, ঈশানী তুমি! বাঁকা সিঁথির পাশ দিয়ে ওলটানো বব্ কাট চুল, খোলা মুখের ঝকঝকে দাঁতের সারির সামনে বাঁ হাতে ধরা

মাউথ পীস। আধখানা খোলা বুকের সামনে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা রঙ্গীন ম্যাক্সি রেখায় আর ঢেউয়ে পুরো শরীরের ওপর দিয়ে ছড়ান। যেন ঘাড়ের ঝটকায় উড়ন্ত চুল, ডান হাতে পাখি উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি, আর নিতম্বে দোলা দেওয়া ভাঙ্গা কোমর—সব মিলিয়ে ধরা পড়েছে একটি লাস্যময় মুহূর্ত। ঈশানী গাইছে। না, নামও পালটায় নি ঈশানী। দেওয়াল জোড়া বিশাল পোস্টারের গায়ে ইংরেজীতেও বড় বড় করে নাম লেখা, ছিল ঈশানী ডাট। দ্য থার্ড এ্যাণ্ড লাস্ট, গ্ল্যামরাস ইভনিং ইন দ্য সিটি উইথ দ্য টপ অব দ্য পপ স।

কি এক ভাললাগার আচ্ছন্নতায় পায়ের তলার মাটি দুলেছিল সরোজের। সন্ধ্যাব প্লাইট বাতিল করতে হয়েছিল। অন্ধকার মঞ্চে তীব্র গভীব আলোক রেখায় সবুজ ঈশানী জ্যাজ-এর বাজনার সঙ্গে ফুটে উঠতে উঠতে সরোজ আবার নতুন করে নিজেকে খুঁজে পেতে শুরু করেছিল।

—আমি তোমার সব খবরই রাখি।—যেন বহুদিনের ধ্বংসাবশেষের গভীর থেকে ঈশানী বলেছিল, শো ভাঙ্গার পর ড্রেসিংরুমে বসে।

—কতোদিন থেকে ?

—তুমি ফেরার পর থেকেই।

—একবার জানালে না আমাকে !

—জানাতে চাই নি, পারিও নি। তোমাকে মিছিমিছি···

—আমি তো কোনো অপরাধ করি নি, ঈশানী !

—জানি, সেইজন্যই কোনো অপরাধের বোঝা তোমার ওপর চাপাতে চাই নি। আমার কাছে তুমি ঠিক তোমার মতই আছো। থাকবে।

—তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

ঈশানী অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল চুপচাপ। তারপর একসঙ্গে অনেক চাপা দুঃখ কষ্ট ক্ষোভ আনন্দ ভালবাসা মাত্র একটিই অভিব্যক্তিতে সন্তর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল হাসি দিয়ে। খুব আস্তে বলেছিল—এই বয়সে ব্যাপারটা এরকমভাবেই ধরা যায় না যে, তুমি আমার কাছেই রয়েছো। আমি তো তাই ভাবি।

মা দেখে যাও, বাবার ভাবসমাধি হ'য়েছে।

গভীর ঘুমের ঘোর থেকে যেন আচমকা ঠেলা খেয়ে উঠল সরোজ। মামনি দাঁড়িয়ে আছে হাতে চা-এর কাপ নিয়ে। হাই তুলে চশমা খুলে চোখ কচলাতে যাওয়ার আগেই, মেয়ে চা-এর কাপ নামিয়ে রেখে হাত চেপে ধরলো।—বল, কি ভাবছিলে!

—ভাবনার কি আর শেষ আছে রে?—চোখে মুখে হাত বোলায় সরোজ।

—ঢং! চলো, তাড়াতাড়ি ওঠো।—মামনি তাড়া দিল সরোজকে।

—কোথায় যাবো?

—বাহ, সকালে কথা হল না, এ বেলা জগন্নাথের মন্দিরে যাবো। পাণ্ডা এসে বসে আছেন চারটে থেকে।

—আমাকে আব কেন? তোরা যা, ঘুরে আয়। আমি এখানে কিংবা সী-বীচ্-এর কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করবো। একটা চাবি নিয়ে যাস।—সবোজ নিজেকে আলাদা করে রাখতে চাইলেন।

—আমি জানি না কিছু। মা-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি।—ফরফর করে নেমে গেল মামনি।

সেই সকালবেলা সমুদ্র থেকে উঠে আসার পর এলোমেলোভাবে সময় কেটে গেছে। বেশ কিছু কাল্পনিক কথাবার্তা সরোজ আপন মনে সেরে নিয়েছে সত্যমিথ্যা না ভেবে। মাত্র একটা ব্যাপারেই সে নিশ্চিত, ঈশানীকে চিনতে তার ভুল হয় নি। আব একটা ব্যাপারও তার জানা। সমুদ্র সৈকতে স্বর্গদ্বার থেকে ডানদিকে প্রায় শেষপ্রান্তের বাড়িটি ঈশানীদের। নীলাচলাবাস।

হলিডে হোম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে এই প্রথম সরোজের অনুভূতি নিঃশব্দে তাকে একটা ঝাঁকানি দিল। সকাল থেকে সমস্ত দিনটাই অবচেতনে তার একটি মানসিক প্রস্তুতি ঘটিয়েছে। সে হাপিত্যেশ করেছিল একটু সুযোগের অপেক্ষায়। শুধুমাত্র নিজের জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে নেওয়ার। বেশ অন্যরকম লাগলো

সরোজের। সংগ্রামহীন জলরাশির ওপর আঁধার নামার প্রস্তুতি। বাতাসের তীব্রতা, সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে মিশেছিল হিমেল ভাব। তার ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি হাওয়ায় উড়ছে। স্বর্গদ্বার ছেড়ে খানিকটা হেঁটে আসার রাস্তা মোটামুটি নির্জন। ঘরবাড়ি হলিডে হোম লজ এদিকটা প্রায় নেই বললেই চলে। যদিও সামুদ্রিক পরিবেশে কার্পণ্য নেই। অনবরত ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ আর অবারিত বাতাসের সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়ে দূরের কোনো বাড়ি থেকে নাম সংকীর্তনের সুর ভেসে আসছে। সরোজ হেঁটে চলেছে। ঈশানীর সঙ্গে তার আর দেখা না করলেও চলতো। তবু কৌতূহল কি নির্লজ্জ, আকাঙ্ক্ষা কত আপোসহীন, অতীত হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে কি টান বাহান্ন তিপান্ন বছর বয়সেও! ঈশানী, সরোজের অন্তরের গভীরে আটকে পড়া একটা আলগা ঘুঙুর যেন, হঠাৎ উচ্ছ্বাসে নীরব নিক্কণে ঝুমঝুম বেজে ওঠে।

তেমাথার কাছেই রাস্তা প্রায় অবরুদ্ধ। ছোট দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সরোজ। অল্পবয়েসী ছেলেটার কাছে এগিয়ে যায়।

—নীলাচলাবাস নামের বাড়িটা কোন্‌দিকে ?

—প্রায় সমুদ্রের ধারে। আপনি কাকে চান ?

—বাইরে থেকে লোকজন কেউ এসেছেন ?

—ঈশানী দিদিমণি আর দু তিনজন। আপনি কাদের খুঁজছেন ?

—ওঁদেরই। ঈশানী দিদিমণির মা আছেন ?

—না। গত বছর মারা গেছেন। এখন আমরাই থাকি। ওই যে সোজা, লাইট জ্বলছে।

—ওহ্, আচ্ছা।

পায়ে পায়ে এগোলো সরোজ। কথাটা কানে খট্‌ করেই লেগেছে। ঈশানী দিদিমণি! অবশ্য দোষ কি! তাই হবে হয়তো। অচেনা অন্য কেউ সরোজকে চিনিয়ে দিতে গেলেও সম্ভবতঃ দাদু বলে। বলতেই পারে। হাফ সেঞ্চুরি পার হলে দাদু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রাস্তার ইলেকট্রিক লাইট এদিকটা আসে নি। অন্ধকার কিছু বেশি। বড় বাড়িটার সঙ্গে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা নিয়ে বাগান।

ঘরে আলো জ্বলছে। বাগানে মোড়া নিয়ে সমুদ্রের মুখোমুখি বসে গল্প করছে কয়েকজন। সেখানটা আলো আঁধারি। সমুদ্রের একেবারে ধারে বলেই বাতাস এবং স.ুদ্র গর্জন দুইই অপেক্ষাকৃত বেশি তীব্র। একটু শব্দ করেই লোহার গেট্-এর আলগা ছিটিকিনি খোলে সরোজ। আলোছায়ার মধ্যেই বোঝা যায় কয়েক জোড়া দৃষ্টি ঘুরে এসে পড়ে সেদিকে। নারীকণ্ঠ—কে—বলা মাত্র সরোজের মনে হয় সমুদ্রের ঢেউগুলো তার বুকের মধ্যে ভাঙ্গছে।

—ঈশানী দেবী আছেন নাকি ?—একটু উচ্চকিত, তবু যথাসম্ভব পরিমিত এবং গম্ভীর উচ্চারণ করে সবোজ।

উঠে আসছে। যেটুকু বোঝা যায়, তাতেও মনে হচ্ছে—না, ঠিক ধ্বস নেমে যাওয়া যাকে বলে, তা নয়। যদিও হাঁটার ছন্দ কিছু ভারি, স্থূলতার দিকে শবীরেব টান, শ্লথ পা ফেলাব ভঙ্গি, তবু এখনও এক সময়ের সুঠাম দার্ঘ শক্ত ঈশানীই হেঁটে এগিয়ে আসছে। বোধহয় পাতলা শাল গায়ে, চুল এখনও বব্—উড়ছে হাওয়ায়। হাতে টর্চ। মুখটা বাদ দিয়ে ইতিউতি সরোজের গায়ে পড়ছে এগিয়ে আসা আলোব রেখা।

—কে ? অনেক কাছেব থেকে, হ্যাঁ এখনও প্রায় সেই গলা।

—টর্চটা মুখে ফেল। আমি সরোজ, চেনা যাচ্ছে ?

যেন ঢেউ-এব ঝাপটা খেতে খেতেও কোনোমতে সোজা দাঁড়িয়ে বললো সরোজ। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই ঈশানীর গলার শব্দ শুনে মনে হল—অতর্কিত ঢেউ-এর ছুটে আসাটা ফিরিয়ে দিয়েছে তার দিকে। শুধুমাত্র সরোজ নামটাতেই যেন কি এক চাপা শঙ্কিত ভাব হিসহিস কবে উঠলো ঈশানীর গলায়।

—সে কি তুমি ! তুমি···তুমি কি করে···কোত্থেকে এখানে এলে।

—তোমায় চমকে দিতে এলাম। আজ সকালে···সী-বীচ্-এ··· সারাটা দিনই···। নিজেও স্পষ্ট হ'তে পারছে না সরোজ। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে ঈশানীর। বাগানে বসা অন্যান্যদের দিকে ঘন ঘন কয়েকবার তাকাতে হয়েছে এটুকুর মধ্যেই। ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ না থাকলে বোধহয়

বড় বড় শ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যেত। ঠিকই তো। খুব স্বাভাবিক এই হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠার প্রতিক্রিয়া। ধূমকেতুর মতন আকস্মিক আবির্ভাবে ঈশানীকে চমকে দেওয়ার চাপা আনন্দটুকুই তো সরোজ পুষে চলেছিল সকাল থেকে। ঈশানী, সকালবেলা তোমাকে এক লহমায় দেখতে পাওয়ার পর থেকেই কি এক ছটফটানির মধ্যে···। কিন্তু ঈশানী কি করবে এখন, কি করতে চাইছে! কি বলছে যেন বিড়বিড় করে।

—তুমি···তুমি চলে যাবে···। নাহ্···কিন্তু কেন এলে···আমি কি করব এখন···তোমাকে কি বলব···আমি ঠিক···

—কি বলছো ঈশানী, আমি বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা এসো। একটুখানি। বড় ভয় করছে।—ঈশানী পিছন ফিরে এগিয়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। ধীরে অথচ ত্রস্তভাবে। যদিও রোমাঞ্চকর, তবু যথেষ্ট নিরাপদ এই সাক্ষাৎকার। কিন্তু এর মধ্যেই সরোজের ভাবনার বাতাস ঘুরে গেছে অন্যদিকে। ঈশানীর ব্যবহারে শিউরে ওঠা আনন্দের অনুভূতির সঙ্গেই কি এক অস্বাচ্ছন্দ্যের অস্বস্তি যেন। বাহান্ন বছর পার করা সরোজের সেটুকু বুঝে নিতে একটা ছুটো মুহূর্তের ভগ্নাংশই যথেষ্ট। বোধহয় অবচেতন মনে লালিত অভিসারের এই আচরণটুকু উপযুক্ত হয় নি। ভুল করে ফেলেছে সরোজ। সম্ভবতঃ বিব্রত টানাপোড়েনের দোলায় ফেলেছে ঈশানীকেও। অথচ এখনই কোনো উপায় নেই শোধরাবার। ঈশানীর পিছনে হেঁটে এসে পৌঁছেছে আলো জ্বলা ঘরের দোরগোড়ায়। সামনের খোলা জানালার বাইরে অন্ধকারে চিকচিক সামুদ্রিক ফসফোরাস, অফুরন্ত ঝোড়ো হাওয়া এলোমেলো ঘরের মধ্যে। কতোদিন পরে দেখতে পাওয়া সেই ঈশানী কত কাছাকাছি, তবু, পরিবেশ পারিপার্শ্বিক অনিবার্য পরিবর্তনের পরিণতিতে বিভ্রান্তিকর সঙ্কুচিত। বড় বেশি অ·স্তিকর, স্বাচ্ছন্দ্যহীন। ঈশানীর খুব ঘনিষ্ঠ কেউ বাইরে বসে থাকতে পারে। তাদের নিরবচ্ছিন্ন শান্ত অবসরটুকু হয়তো সরোজের অবুঝ অকস্মাৎ আগমন····

—তোমাকে খুব বিপদে ফেলে দিলাম।—সরোজের কণ্ঠস্বর নিজের থেকেই এর মধ্যে আচ্ছন্ন।

—বোসো।—একই সঙ্গে অভিভূত অথচ আশংকিত ঈশানীর গলা। চঞ্চল চোখের দৃষ্টি দ্রুত পালটে যাচ্ছে, নিঃশব্দে ঘুরছে এ জানালা সে জানালা, দরজায়। তার মধ্যেই যেন বহুদিন আগেকার পাথর চাপা পাতালের গহ্বর থেকে প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইলো—কবে এসেছো? উঠেছো কোথায়?

ইচ্ছে অনিচ্ছের মধ্যেই সরোজের চোখে পড়ে যায় ঈশানীর চেহারা। একটু বেশি ভরন্ত পুরন্ত, তবু নিশ্চয়ই বয়সের তুলনায় আঁটোসাটো। প্রসাধনহীন মুখের মোলায়েম চামড়ায় এখন মোহ আর আকুলতা একই সঙ্গে মেশামিশি। নিখুঁত টানা কালো ভ্রু জোড়া অস্থির, বারবার বেঁকে যাচ্ছে। অমার্জিত সামান্য বাঁকা নাক ঈশানীর, বোধহয় ভারসাম্য রাখতেই একটা ছোট্ট হীরে পরেছে একদিকে। ঘাড় পর্যন্ত লতানো ফুরফুরে চুল ঘন। হাওয়ায় উড়ছে। সাদা জমির তাঁতের শাড়িতে সবুজ পাড়ের ওপর কালো দাঁত। শরীরের গড়নের সঙ্গেই উঁচু নিচু ঢেউয়ে উঠেছে নেমেছে। কি কায়দা জানে ঈশানী যে এখনও বহু পুরোন স্মৃতি সরোজকে উদ্বেল করতে চাইছে। স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে বহু অতীতের ঘনিষ্ঠ ছবি! কিন্তু বড় অসময়ে যে এই দেখা। যদিও এক অন্য স্বাদের রেশ তৈরি হয়েছিল সারাদিন ধরে, কিন্তু এই মুহূর্তে বড় অস্থির ঈশানী। সরোজের অজানা কি এক অনিবার্য কারণে সে চকিত ত্রস্ত।

খুব ধীরে উত্তর দিল সরোজ।—মাত্র দুদিন। জি কে ডাব্লু হলিডে হোমে।

একটু ঢোক গেলে ঈশানী।—তোমার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা এসেছে?

—হ্যাঁ। একসঙ্গে অনেকটা হাওয়া বেরিয়ে গেল সরোজের গলা থেকে।

—ওহ্, আচ্ছা।—একটু হাসবার চেষ্টা করলো ঈশানী। —এখনও বুড়ো হও নি তুমি। আমি এসেছি জানলে কিভাবে? —ঈশানীর চোখের তারা দ্রুত ঘুরে এলো ঘরের চারধার।

—সকালে দেখলাম সমুদ্র থেকে স্নান সেরে উঠে আসছো।

—বাড়ির নামটা মনে ছিল ?

—নয়তো এলাম কি করে !

অস্থিরতার মধ্যেই কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল ঈশানী। যদিও তার মধ্যেও সে চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে যেন প্রতি সেকেণ্ডেই কোনো অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি আশংকা করে যাচ্ছিল। বললো, অন্ততঃ বলতে চাইলো—আচ্ছা, তুমি…তুমি কি বুঝতে পারছো আমি একটি ভীষণ…

—পারছি, ঈশানী। আমি উঠে পড়বো। আসলে তোমাকে সকালে দেখে ফেলার পরে…আচ্ছা…যাই।

দাঁড়িয়েছিল ঈশানীও। একই সঙ্গে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি তার মুখে। সরোজ দেখতে পাচ্ছে তার চোখে অস্থিরতার মধ্যেই চিকচিকিনি। বুক থেকে ঠেলে আসা অনেক কথাই গলার কাছে আটকান। বহুদিন বহুকাল পরেও সরোজকে চোখের সামনে পেয়েও অন্ততঃ কয়েকটা কথা না বলতে পারায় অভাবের মধ্যে তাকে ফেরাতে হচ্ছে। স্মৃতি ভাললাগা উদ্বেগ আচ্ছন্নতা সব কিছু মিলিয়ে সে শুধুমাত্র বলতে পারলো—এসো, ভাল থেকো।

কিন্তু মাত্রই সামান্য কটি শব্দোচ্চারণ। পর মুহূর্তেই সংক্ষিপ্ত অথচ চাপা একটা আর্তনাদ ঠিকরে উঠলো তার গলায়। যেন হঠাৎ একটি ছুটন্ত বুলেট এসে বিঁধেছে তার গলায়। বেরিয়ে যেতে গিয়েও দ্রুত মাথা তুলে সরোজ তাকাল মুখের দিকে। ঈশানীর দু চোখ বিস্ফারিত, যেন ফেটে পড়বে। তার হাতে জড়ানো শাড়ির আঁচল হাতশুদ্ধ মুখে চাপা। যেন আর কিছু কথা বলতে যাওয়ার ঠিক প্রাক্ মুহূর্তে সে হঠাৎ ভূত দেখার মতন চমকে উঠে স্তব্ধ নিশ্চল। স্ট্যাচু হ'য়ে গেছে। তার চমকান বিহ্বল চোখের দৃষ্টি স্থির বিদ্ধ সামনের দরজার মুখে। ঠিক যেন এই আশংকাটুকুতেই এতোক্ষণ ঈশানী চঞ্চল উৎকণ্ঠিত ছিল।

অবাক সরোজ নিজেও কম হয়নি। মুহূর্তেই তার ভ্রুজোড়া কাছাকাছি, কপালে অনিবার্য ভাঁজ। ঈশানীর দৃষ্টি অনুসরণ করে

মাথা ঘোরাল দরজার দিকে। বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন একটি আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ অনুভব করল। অবিকল তার যৌবনের চেহারা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি ভাবভোলা ঈষৎ মেদবহুল যুবক। যার চোখের দৃষ্টি শূন্য অর্থহীন বোবা শান্ত। মুখের রেখা অকম্পিত স্থির। অথচ ক্রমশঃ সেখানে ফুটে উঠতে চলেছে শিশুর সারল্যে ভরা একটি ক্ষীণ অথচ অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হাসি।

সরোজের পা-এর নিচে মাটি টালমাটাল করে উঠলো। যেন দ্রুত সে তলিয়ে যাচ্ছে কোনো পাতালপুরীর অন্ধকারে। মুখের মধ্যে কুলকুল করে ছাপিয়ে উঠছে লোনা জল। ক্রমাগত গম্ভীর মেঘের গর্জন হয়ে চলেছে বুকের মধ্যে। পেটের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে সব কিছু জমাট দলা হয়ে জমে যাচ্ছে গলার কাছে। কিন্তু তার চোখ খোলা। নির্নিমেষ দৃষ্টি পাতা যেন প্রতিবিম্বের প্রতিই।

খুব ধীর ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এলো যুবক নিঃশব্দে স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে সরোজের খুব কাছাকাছি। তারও পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি। সরোজ যেন একটি দর্শনীয় বস্তু কিংবা ভাস্কর্য। যুবক কাছে, আরও কাছে এসে স্পর্শ করল সরোজের বুক পেটের মাঝখানটা। হাসলো। তার গলা দিয়ে উৎফুল্ল পশু শাবকের মতো দো আঁশলা স্বর বেরুলো। সরোজের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে সে খুব খুঁটিয়ে দেখলো। আবার স্পর্শ করল, তার কপাল নাক ঠোঁটের কোণ, কানের লতি। তার নির্মল হাসিতে বিস্ফারিত ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা লালা। তার উচ্ছ্বাস উত্তেজনা বোঝা গেল সামান্য ঘড় ঘড় গলার শব্দে। নিঃশব্দ হাসির মধ্যেই সে ক্রমশঃ একটু একটু করে পিছিয়ে গেল। চোখের তারা ঘুরিয়ে একবার তাকালো ঈশানীর দিকে। তারপর ঠিক যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনিই নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে চলে গেল।

যেন সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সামান্য কিছুক্ষণের জন্য। বাতাস বন্ধ হয়েছিল, সমুদ্র স্থির হয়ে গিয়েছিল। কে কোথায় কেন সবই অবান্তর অচঞ্চল হয়েছিল কয়েকটা মুহূর্ত। এক অপার্থিব

নেশানীল জগতের মধ্যে প্রাণহীন দাঁড়িয়েছিল কয়েকটি অস্তিত্ব। স্তব্ধ নিশ্চল।

—আমায় ক্ষমা কোরো তুমি।—কান্না ভেজা চাপা গলা ঈশানীর। ক্রমশঃ কখন সরে এসেছে সরোজের বুকের কাছাকাছি। তার অঞ্জলি-বদ্ধ দু হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছে সরোজের একখানা হাত নিজের বুকের মধ্যে। কেঁপে কেঁপে শ্বাস পড়ছে ঈশানীর। ফুলে ফুলে উঠছে ভারি বুক। সরোজ অনুভব করলো, ঈশানীর চোখ থেকে গরম জলের ফোঁটা টুপিয়ে পড়ছে তার হাতে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা জড়ান ঈশানীর গলা তার কানে আসছে।—এ আমি কখনও চাই নি।···দেরাদুনে সেই সময় পিসীমার কাছে গিয়ে কোনো সাহায্য পাই নি। চেষ্টা করেছিলাম, ওষুধপত্র খেয়ে ওকে না রাখার। অথচ ও গেল না কিছুতেই। সময়মতো জন্মাল দেরা'নেরই আর এক হাসপাতালে। হয়তো ওষুধপত্রের জন্যেই জন্ম থেকে অপরিণত ও, কথা বলে না আজও। ফেলে দিতে পারি নি···বয়ে বেড়াচ্ছি এখনও···জানি না···শেষ পর্যন্ত···।

সময় কেটে যাচ্ছিল। পত্রহীন স্তব্ধ গাছের মতো কিভাবে যেন দাঁড়িয়েছিল সরোজ। বোধহয় জোয়ার এসেছিল সমুদ্রে। আর্দ্র বাতাস ঝড়ের মতো হু হু করে ঢুকে পড়ছিল জানালা দরজায় শব্দ তুলে। এলোমেলো করে উড়িয়ে নিচ্ছিল ঘরের জিনিসপত্র। ফুঁসে ওঠা গর্জনের সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ ঢেউ ভাঙছিল।

সরোজ কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু রুদ্ধ কণ্ঠে শব্দ বেরুল না। সামান্য কেঁপে উঠল ঠোঁট। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে তার মনে হল সমুদ্রের ঢেউ পাড় ভেঙ্গে ক্রমাগত উত্তাল হয়ে উঠতে চাইছে তারই বুকের মধ্যে। অবারিত ফেনিলজলোচ্ছ্বাস গভীর অন্তঃস্রোতে শুধু টালমাটাল করে দিচ্ছে।

রজনীর দিনকাল

এক

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সাতসকালেই আকাশ ভেজা কালচে মেঘে ছেয়ে যেতে কদমতলার রজনী চাটুয্যে কোমরে গামছা জড়িয়ে বাগানে এসে দাঁড়ালেন। পায়ের নিচে শুকনো খটখটে ফাটোফাটো মাটি। রোদে পোড়া ঘাস আর আগাছা হলদেটে খোঁচা খোঁচা হ'য়ে রয়েছে। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। নিজের পাকা বাড়ির মাঝের ঘর থেকে দিনের পর দিন চড়া রোদে সব কিছু জ্বলে যাওয়া দেখতে দেখতে রজনী ভেবেছেন, এ বছরটা কি এমনই যাবে! সেই কবে চোত-বোশেখের তু একটা দিন বিকেল সন্ধ্যে নাগাদ হুড়মুড়িয়ে ঝোড়ো হাওয়ায় শির-শিরিনি তুলে কালো মেঘ থেকে তু'এক পশলা ঢেলেছিল। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলকানি যেন ইঙ্গিতে জানিয়ে গিয়েছিল—রোসো, আসছি। ব্যস্, ওই পর্যন্তই। প্রতিটি দিন রজনী চাটুয্যে চোখ থেকে বোতলের তলার কাচওয়ালা চশমাটা খুলেছেন আর পরেছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল সব। মরে ঝুড়কুড় উঠে গেল ট্যাডোস বেগুনের চারা, ডাঁটা পালং-এর সদ্য গজানো সবুজ তোয়ালে। চোখের সামনে হলুদ হয়ে গেল বাগান চড়িয়ে, উঠতে লাগলো মাটি। নিম গাছের ফোকর থেকে ঠোঁট ফাঁক করে হাঁপাতে হাঁপাতে চোখের সামনে একটা শালিক ধপ্ করে মাটিতে প'ড়ে মরে গেল। জন্মে এমন কাণ্ড রজনী দেখেন নি তাঁর সাতষট্টি বছর বয়সের মধ্যে। ঘরের মধ্যে থেকেই ডাগর হ'য়ে ওঠা ছোট মেয়েকে ডেকেছিলেন—অ সুমি, সুমি, ত্থাখ তো বাবা, নিমগাছ থেকে একটা শালিক অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল যেন। এ তো বড় অলুক্ষুণে কাণ্ড!

—তা আমি কি করবো!—বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিয়েছিল মেয়ে। ওঠে নি।

রজনীও আর কথা বলেন নি। কোমরের কষিটা বেঁধে নিজেই তাকিয়া ছেড়ে উঠেছিলেন। হাঁটুতে কট্ কট্ শব্দ হ'য়েছিল। ঘরের কোণে রাখা মাটির কুঁজো থেকে কলাই-এর গ্লাসে খানিকটা জল গড়িয়ে নিয়ে দালান পার হ'তে হ'তে দেখেছিলেন মেয়ে আলুথালু শাড়ি জড়িয়ে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বালিশে বুক চেপে নভেল পড়ছে। চুপচাপ চলে গিয়েছিলেন রজনী। দরজা খুলে সিঁড়ি টপকে বাগানে নিমগাছের গোড়ায় আসতে আসতে পাখি ততোক্ষণে চিত্তির। তা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়েছিলেন রজনী। দুবার লম্বা করে ঠোঁট ফাঁক করার চেষ্টা করেই একেবারে এলিয়ে পড়েছিল। প্রায় নিঃশব্দে রজনী উচ্চারণ করেছিলেন—হে নারায়ণ, হে নারায়ণ।

গুটি গুটি উঠে এসেছিলেন। শিকল খুলে রান্নাঘর থেকে ছাই ফেলার ভাঙ্গা টিনের ক্যানেস্তারাখানা নিয়ে আবার বাগানে ফিরে এসেছিলেন। নিঝুম দুপুরে চড়া রোদ্দুরে পিঠ জ্বলে যাচ্ছিল। গরম হাওয়ায় শুকনো গাছের পাতা তিরতির ক'রে নড়ছিল। রজনী শুনতে পাচ্ছিলেন রেল-ইয়ার্ডে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ করে একটা মালগাড়ি সাটিং করছে।

খানিকটা মাটিশুদ্ধ মরা পাখি ক্যানেস্তারার ওপর চাপিয়ে বাগান ঘুরে সোজা পাতকুয়ো তলায় এসেছিলেন রজনী। জল পড়ে পড়ে নরম হওয়া একটা জায়গায় কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ছোট্ট গর্ত করেছিলেন। পাখিকে শুইয়ে আবার মাটি চাপা দিয়েছিলেন। তাতেও নিশ্চিন্ত হন নি। রাত-বিরেতে ছুঁচো ইঁদুর আঁচড়ে মাটি তুলে ফেলতে পারে ভেবে, দুটো থান ইঁট চাপা দিয়েছিলেন পাখির কবরের ওপর। তারপর হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। তেলচিটে মাদুরের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিতে দিতে ভেবেছিলেন—দিনকাল কি হল! ঘোর অনাচার সব শুরু হয়ে গেল বাড়িতেই! নিজের ঘরে বসে মৃত্যু দর্শন করতে হল এই বয়সে।

বড় দমে গিয়েছিলেন রজনী। দিনের পর দিন চড়চড়ে রোদ্দুর, গরম হাওয়ার হলকা, তাতে ফেটে ওঠা মাটি আর মেঘহীন চকচকে সাদা আকাশ দেখতে দেখতে নিজেও যেন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। তার ওপর সবসময় কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করছিল নিমগাছ থেকে পাখি পড়ে মরে যাওয়ার সেই অপদৃশ্য। কেন যে ঠিক সেই সময়েই রজনী বাগানের দিকে তাকিয়েছিলেন!

পায়খানা থেকে গাড়ু হাতে বেরিয়েই রজনীর মনে হল আকাশে যেন মেঘ জমেছে। চারপাশে একটু আঁধার আঁধার ভাব। সকাল ছটা সওয়া ছটায় অন্য দিন এসময় রীতিমত রোদ চড়া হয়ে যায়। গাড়ু রেখে তাড়াতাড়ি কলঘরে ঢুকে পায়খানার কাপড় ছাড়েন রজনী। পাঁচ ছেলের তিনজনই পরপর আপিসে বেরুবার জন্য তৈরী হবে এখন। বড় ছেলে সবচেয়ে পরে যায়। তাই বাজারটা সেই করে। মেজ ছেলে মন্টু পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে প্রচুর সময় নেয়, এদিকে পিওনের চাকরি বলে তাকে বেরুতেও হয় সকাল সকাল। চানটা সে সব থেকে আগে সারে। তার ওপর ভাত খাওয়ার পর তাকে আর একবার পায়খানা যেতে হয়। আমাশা'র রোগী। পেটে চাপ পড়লেই বড় বাইরের ডাক পড়ে। সেজ ছেলে অন্ত আবার বাবু গোছের। মাথায় জবা-কুসুম মাখে। চোখে চশমা লাগায়। রুমালে সেণ্ট ঢালে। বড় ছেলে কলকাতায় সরকারী আপিসের ক্যাশিয়ার। মাইনে বেশি। তার চালচলনে গম্ভীর ভাব। খাওয়ার সময় তার এক টুকরো মাছের বরাদ্দ বেশি। চতুর্থ ছেলে ন্যাড়াকে রজনী একটি অকালকুষ্মাণ্ড ভাবেন। সে বেকার। সবুজ রঙের লুঙ্গি আর গায়ে গামছা জড়িয়ে সে তার হিন্দুস্থানী বন্ধু বিশুয়ার মুদির দোকানে সারাদিন আড্ডা দেয়। মাঝে মাঝে দালদার টিনের ওপর খুচরো পয়সা দিয়ে ঠুকে গান গায়— দেখো জি চাঁদ নিক্‌লা, পিছে খেজুর হ্যায়। ছোটটির ওপর রজনীর এখনও কিছু আশা-ভরসা আছে! লেখাপড়ায় ভাল। স্কুল ফাইন্যাল দেবে। রজনী নিজে এখনও তার পড়াশুনা দেখেন।

মহিলা বলতে বাড়িতে এখনও মাত্র দুটি। এক, কনকপ্রভা,

রজনীর ন'বছর বয়সে সাত পাকের বাঁধন দিয়ে নিয়ে আসা পরিবার ; আর তুই, এখনও আইবুড়ো সবচেয়ে ছোট মেয়ে সুমি। কাজের লোক জগার মা যদিও সারা দিন থাকে, তবু সে বাইরের লোক এবং রাতে চলে যায় তার হেঁপো রুগী কত্তার কাছে। বাকী তিন মেয়ের দুটিকে রজনী পার করেছেন তাঁর সঙ্গতি থাকা অবস্থাতেই। আর একটি বড় হতে না হতেই একটু বারমুখী ছিল। রজনীরও তখন হাতে পয়সাকড়ির টানাটানি চলছিল। সোনামুখীর গাঙ্গুলী পরিবারের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা খানিকটা হতে হতেই মেয়ে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পরে শোনা গিয়েছিল রেলের কোন এক খালাসীর সঙ্গে সে নাকি জাত পালটে নিকে হয়ে পালিয়েছে। আর তার খোঁজ মেলে নি। দুশ্চিন্তা রজনীর ছোটটিকে নিয়ে। জল পেয়ে লক লক করে বেড়ে ওঠা আগাছার মতো বড় মেয়ের তের চৌদ্দতেই ডাগর মেয়ে মানুষটি। ক্লাস সিকস্‌-এ উঠে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলো। লেখাপড়ায় তার যমের অরুচি। বছর তিনেক ধরে বাড়িতেই .সে খেয়ে ঘুমিয়ে নভেল পড়ে সিনেমার পত্রিকা দেখে সময় কাটাচ্ছে। গোটা .-তিন পাকা ঝিঁকুট বন্ধু আছে তার। সব কটারই যেন ফাটো ফাটো গতর। গুজুর গুজুর ফুস্তুর ফুস্তুর করে ওদের কি কথাবার্তা হয়,—কি প্রয়োজন ওদের সবই সারাদিন বাড়ি থেকে আঁচ করতে পারেন রজনী। কিন্তু কিছুই করার নেই তাঁর। ছাত্র পড়িয়ে দু-চার টাকা হাতে পেলেও, আসলে তো তিনি অক্ষম বৃদ্ধ। নিজের বিড়ি চ্যবনপ্রাশ আর চটির হাফসোল লাগাতেই হাত ফাঁকা। সময় বয়ে যাচ্ছে বুঝলেও, মেয়ের সম্বন্ধ দেখা বিয়ের বন্দোবস্ত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ছেলেরা এক একজন এক এক তর। বয়স বয়ে যাচ্ছে তাদেরও। কে কোথায় কি করছে রজনীর জানার সুযোগ নেই। বোনের বিয়ের চেষ্টা চরিত্রের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন। মেয়ে সকাল সন্ধ্যে রান্নাঘরে থাকে মা-এর সঙ্গে। বাকী সারাটা দিন তার অখণ্ড অবসর। মাঝে মধ্যে সিনেমায় যায়। রজনী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর ভয়ে ভয়ে থাকেন।

কলঘর থেকে কাপড় ছেড়ে বেরিয়েই রজনী দেখেন ধূসর মেঘে আকাশ ছেয়েছে। ফুরফুরে হাওয়া বইতে স্বুরু করেছে। আপনা আপনি মনটা খুশি হয়ে ওঠে অনেক দিন পরে। এমনিতেও এসময়টা তাঁর বিশেষ কিছু করার থাকে না। ছাত্র পড়ানরও দিন নয় আজ। গামছাটা ভাল করে জড়িয়ে বাগানে পা দিতেই দেখেন টিপ টিপ করে দু চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে স্বুরু করেছে। চশমার কাচে জল লাগবে বলে ঘরে খুলে রেখে এসেছেন। ভাল করে দেখতে না পেলেও, অভিজ্ঞতায় রজনীর মনে হল, এ বর্ষা নামারই তোড়জোড়। পায়ে পায়ে হেঁটে তিনি নিম গাছটার কাছে এসে দাঁড়ান। খুঁজে দেখার চেষ্টা করেন ঠিক সেই জায়গাটা যেখানে শালিখ পাখিটা মরে পড়েছিল। বৃষ্টি বাড়ে একটু একটু করে, শুকনো জমি মুহূর্তে জল শুষে নেয়। তারপর এক-সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ায় মাটি ভিজতে থাকে। রজনী মনে মনে ঠিক করেন শালিখ পাখিটা মরে পড়ে যাওয়ার জায়গাটায় তিনি একটা বেলফুলের চারা পুঁতবেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাখি মরে যাওয়াটা খুবই অশুভ ঘটনা। মন থেকে রজনী কিছুতেই তাঁর এই সংস্কারটা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। একটা খুরপি আনার জন্য তিনি ভিজে গায়ে রান্নাঘরের পিছনে ডাঁই করা জিনিপসত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর ঠিক তখনই কানে আসে সেজো ছেলে খেতে খেতে মাকে বলছে—কাল রাতে আমার যে আলাদা একটা ডিম আ· ছিল সেটা গেল কোথায় ?

—অত আর পার নে বাপু।—কনকপ্রভার গলা।—তোমাদের পাঁচ জনের পাঁচ রকম ব্যবস্থা আমার আর মাথায় থাকে না। শেজ রেগে যায় আরও। চিপ্টেন কেটে বলে—তোমার বড় ছেলের একস্ট্রা এক টুকরো মাছের কথাটা তো দিব্যি মাথায় থাকে। তার বেলা তো ভুল হয় না।

কনকপ্রভার খুন্তি নাড়ার আওয়াজ পাওয়া যায় উনুনের ওপর কড়াইতে। তিনি রাগ করতে জানেন না। ধীরে সুস্থেই বলেন—নিজের নিজের ব্যবস্থা তোমরা তো এবার বাবা নিজেরাই…

হাতে খুরপি নিয়ে এগিয়ে যান রজনী। অন্য কিছু আর শুনতে চান না। ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে। দালানের সিঁড়ির পাশ থেকে এখনই একটা বেলফুলের চারা মাটিশুদ্ধ তুলে এনে নিমগাছের কাছটায় পুঁতে দিতে হবে। মনটা নয়তো তাঁর কিছুতেই আর শান্তি পাচ্ছে না দু'মাস ধরে।

দুই

খিড়কীর দরজার দিক থেকে অনেকক্ষণ ধরেই ডাকটা কানে আসছে রজনীর।

—মা—, মা—। আসলে, বলতে গেলে ডাকটা হাওয়া উচিত হাম্বা, হাম্বা। কিন্তু রজনীর কাছে মঞ্জুরীর গলার ডাক সবসময়ই মনে হয়—মা, মা। সাড়ে তিন বছর বয়সে এই প্রথম গাভিন্ হয়েছে মঞ্জুরী। বরাবরই একটু রুগ্ন গোছের চেহারা তার। মাত্র দেড় মাস বয়সেই মা-কে হারিয়ে প্রায় অনাথিনীর দশা হয়েছিল বক্না বাছুরটার। মদনের মা-রও সঙ্গতি ছিল না তাকে পালবার। কনকপ্রভা খানিকটা উপযাজক হয়েই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মাত্র পনেরো টাকায় রোগা বাছুরটাকে কিনে নিয়ে পুষতে স্থুরু করেছিলেন। ছেলেরা আপত্তি করে-ছিল প্রথম দিকে। কিন্তু টাকাটা রজনী তাঁর রোজগার থেকে দিয়ে ছিলেন বলে বিশেষ কিছু কেউ আর বলতে পারে নি। বড় ছেলে খোকা একটু ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করেছিল, তবে শেষপর্যন্ত কেউই আর মাথা ঘামায় নি। আসলে, রজনী জানেন,প্রথম দিনখোকা বাছুরটাকে অন্ধকারে বুঝতে না পেরে, ভয় পেয়েছিল খুব। সেই থেকেই রেগে গিয়েছিল।

বিকেলবেলা মদনের মা বাছুর নিয়ে আসার পর প্রথমেই সমস্যা দাঁড়াল তাকে কোথায় রাখা হবে। বাড়ির মধ্যে না আছে গোয়াল-ঘর, না আছে বাগানের দিকে চালাঘর গোছের কিছু। শেষে কি হবে কি হবে করে, সে দিনের মতো কলঘরেই তাকে একটা খুঁটির সঙ্গে ঢিলেঢালা করে বেঁধে রেখে দেওয়া হল। খোকা সে খবর জানতো না। অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে সে যথারীতি কলঘরে ঢুকেছিল স্নান করতে। অন্ধকারে সে ঠিক ঠাহর পায় নি। হঠাৎই গায়ে জল

ঢালতে গিয়ে তার চোখে পড়ে ছোট ছোট দু-খানা সবুজ টুনি বালব্। ভয়ে আঁতকে উঠে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিল কলঘর থেকে। আর তখনই ক্ষীণ হাম্বা এক ডাক শুনে বুঝেছিল আসলে ওটা একটা বাছুর। তবু সে ছুটে গিয়েছিল রান্নাঘরে মা-র কাছে।

—এসব কি সুরু করেছো তোমরা? কোত্থেকে জোটালে এ আপদকে আবার?

—ওমা, আপদ কি রে! বক্না বাছুর, ভগবতী। মদনের মা রাখতে পারল না...তোর বাবা...

—উহ, তোমরা কি আর টেঁকতে দেবে না বাড়িতে!

রজনী কিছুই বলেন নি। শুধু কান খাড়া করে শুনছিলেন সব। সেরকম বেশি গোলমাল কিছু হলে হয় তো তাঁকেও উঠে দু চার কথা বলতে হ'তো। কেননা বাছুর কেনার আসল সমর্থন তো তাঁরই। কিন্তু খোকা আর বিশেষ কিছু বলে নি। বোধহয় তার আর সময় ছিল না। শনিবার নাইট শো-য়ে সে ইংরিজী সিনেমা দেখতে যায় সপ্তায় একবার। সুবিধে হয়েছিল, বড়দা বিশেষ ঝামেলা না করায় অন্য ভায়েরা বিরক্ত হলেও আর কিছু উচ্চবাচ্য করে নি। পরদিন সকালে ছাত্র পড়িয়ে উঠে রজনী নিজেই একজন ঘরামী ডেকে বাগানের পূব কোণে পুরোন বেড়া টিন আর বাঁশ দিয়ে একখানা চালা বেঁধে দিয়েছিলেন। বাছুরের নামও দিয়েছিলেন নিজে—মঞ্জরী। বড় মায়া পড়েছিল অল্প কদিনেই। কালো ডাগর চোখে মঞ্জুরীর সবসময়ই যেন কৃতজ্ঞতা। সারা গা তার খয়েরী লোমে ঢাকা, শুধু কপালের মাঝখানটা ছাড়া। যেন সাদা বড় টিপ একখানা মঞ্জুরীর কপালে। পরে পরে কখনও বিকেলের দিকে গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে রজনী বলতেন—মঞ্জুরী আমার চাঁদ কপালী।

সেই মঞ্জুরীই এখন চ'রে এসে খিড়কীর দোর থেকে ডাক ছাড়ছে—মা, মা। কিন্তু কারুরই আর হুঁস নেই সেদিকে। মনে মনে খুব বিরক্ত বোধ করেন রজনী। সুমিটা দিন কে দিন খেয়ে ঘুময়ে পড়ে পড়ে খোদার খাসীর মতন মোটা হচ্ছে। উঠে দরজাটা পর্যন্ত খুলে দিতে তার আলিস্যি। কেন, কে জানে।

কনক একটু আগেই কাচের গ্লাসে চা দিয়ে গেছেন স্বামীকে। কিন্তু নারকোল পাতা জ্বালিয়ে জল গরম করার ফলে, সে চা-য়ে এমন বিশ্রী ধোঁয়ার গন্ধ যে রজনী মুখেও দিতে পারছেন না। কি আর বলবেন। চিরকালীন বাতের রুগী কনক। হাঁটু দুটো একেবারে গেছে। নেংচে নেংচে হাঁটে। তবু এই বয়সে ছেলেদের আপিসের ভাত আর হেঁসেল টানতে টানতেই গেল।

চা-এর গ্লাসটা দেয়ালের দিকে ঠেলে রেখে ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল রজনী। তাঁরই দায় যেন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে এখনও। ঝাপসা মেঘে আকাশ ঢাকা। নির্জন দুপুরে কিছুক্ষণ পরে পরেই মঞ্জুরীর ডাক আছড়ে আছড়ে পড়ে তাঁর কানে। পুরোন গোল হাতল-ওয়ালা ছাতাটা নিয়ে দালান পার হন রজনী। মনে মনে ভাবেন, এমন ডাক শুনেও মানুষ কি ভাবে নির্বিকার শুয়ে পড়ে থাকে! দরজার ছিটকিনি খুলতে খুলতে তিনি বলেন—দাঁড়া মা, দাঁড়া আসছি, আসছি।

ইচ্ছে করেই একটু জোরে মা মেয়ে আর কাজের লোককে শুনিয়ে বলেন কথাগুলো রজনী। কিন্তু খুবই আশ্চর্য, তিনি সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও বুঝতে পারেন না। যেন তিনি ছাড়া বাড়িতে আর কোনো প্রাণীই নেই। সামান্য একটা খটকা লাগে তাঁর। ব্যাপারটা কি, সব গেল কোথায়!

খিড়কীর দরজার হুড়কো খুলে ধরেন রজনী। মঞ্জরী ঢুকে পড়ে। এ সময়ে বাঁধাধরা নিয়মের মত একবার সে পাতকুয়ো তলায় যায়। প্রায় আধ বালতি জলপান করে। তারপর দু একবার ডাকাডাকি করে নিজের ডেরায় চলে যায়। রজনী বোঝেন, মঞ্জরীর এই আদুরে হাঁক-ডাকের অর্থ—সকলকে জানান দেওয়া যে আমি এসেছি, আমার খোলবিচুলি জাব সব মাখাটাখা আছে তো!

ঘরেই ফিরে আসতেন রজনী। কি ইচ্ছে হল, ছাতা মাথায় দিয়ে এগিয়ে যান বাগানের দিকে। উড়ো বৃষ্টি ছাতায় রাগ মানে না বিশেষ। গায়ে লেগে ঠাণ্ডা আমেজের সঙ্গে শিরশিরানির কাঁটা দেয়। বেশ ভাল লাগে রজনীর। গাছের পাতা থেকে টুপিয়ে পড়া জলের

শব্দ শুনতে পান দুপুরটা আরও নির্জন মনে হয়। বাতাবী লেবুর গাছের ওপর দুটো ঘুঘু বসে বসে ভিজছে, মাঝে মাঝে ডান ঝাপটিয়ে জল ঝাড়ছে। কানে আসে, দালানের ঘুলঘুলির মধ্যে কয়েকটা পায়রা একটানা বকম বকম করে চলেছে। কি এতো কথা বলে! একটু আগের উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেওয়ার বিরক্তিটা রজনীর কি ভাবে যেন কেটে যায়। অযাচিত একরাশ ভাললাগা শুধুমাত্র কিছু অকিঞ্চিৎকর শব্দের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে তাঁকে খুশি করে তোলে। বড় সুন্দর মনে হয় ঢিমেতালে চলা এই রিমঝিম বর্ষার দুপুর।

বুড়ো মানুষ রজনী। পার্থিব জগৎ সংসার থেকে অনেকখানিই বিচ্ছিন্ন। নিঃসঙ্গতাই তাঁর এ বয়সের সঙ্গী—এটা ধরে নিয়েই তিনি যেন এক ধরনের নির্লিপ্ত জীবনযাপন করেন। চোখে যা পড়ে দেখেন, কানে যা আসে শোনেন। প্রতিক্রিয়া তাঁর হয় না বললে ভুল হবে, কিন্তু খুবই সাময়িক তা। একদিনের বাসী খবরের কাগজ পড়েন রজনী। বড় ছেলে ট্রেনে যাতায়াতের সময় ইংরেজী কাগজ পড়ে। রাত্রে ফিরে বাবার টেবিলের ওপর রেখে দেয়। রজনী দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর মাদুরের ওপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে কাগজ পড়েন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তিনি বিশেষ কিছু মনে রাখার চেষ্টা করেন না, থাকেও না। কোনো কিছুই বেশি ভাললাগা কিংবা খারাপ লাগার ব্যাপারেও ক্রমশঃ তিনি যেন উদাসীন কিংবা খানিকটা অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছেন। নিজের এই মানসিকতার জন্য রজনী সচেতন নন, তা নয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে এ রকমটাই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত এটাই তিনি জানেন। হঠাৎ দুপুরের এই ভাল লাগাটাই তাঁকে যেন অনেকদিন পরে একটু চঞ্চল করে। ঠিক এমন ভাললাগা অনেক দিন লাগে নি। সত্তরের কাছাকাছি বয়স হতে চললো রজনীর ঘুম কমে গেছে, ছানি অপারেশন হয়ে গেছে। রাতে বার তিনেক ঘুম থেকে উঠতে হয়। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়েছে। সবকিছুর সঙ্গে বেশ মানানসই ভাবে তাঁর মানসিকতা খাপ খেয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে তিনি উত্তেজিত হন, আনন্দিত হন, রাগ করেন। কিন্তু সেসব কোনোটারই

স্থায়িত্ব এবং গভীরতা সুদূর প্রসারী হয় না। আসে যায়, আসে যায়। সেই সঙ্গে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যায়। অথচ এই মেঘলা ভাঙ্গা ঝিরঝিরে বৃষ্টির নরম নির্জন দুপুরটা কিভাবে তাঁকে যেন পেয়ে বসে। ছোটখাট এতোসব সুন্দর ব্যাপার যে পৃথিবীতে আছে, প্রতিদিন ঘটে চলেছে—আজ এখন বাগানে না এলে যেন আর কোনোদিন তাঁর জানা হ'তো না।

কদিন আগের শুকনো খটখটে বাগানটা ক'দিনের জল পেয়েই স্নিগ্ধ সবুজ হয়ে উঠেছে। মরকুটে আগাছা, প্রায় খড়ের মতো হলদেটে হয়ে যাওয়া ঘাস দিব্যি লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে নরম মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে যান রজনী। অজান্তে শুঁড় নাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া একটা শামুকের খোলের ওপর প্রায় পা দিয়ে ফেলছিলেন। কোনো রকমে টপকে যান। বাগানের ছড়ানো ছিটানো নিম বাতাবী আম কাঠ-চাঁপা বড় বড় গাছগুলোও বেশ ঝাড়ালো হয়ে উঠেছে। বাগানের দক্ষিণ দিকে আবার নতুন করে কতকগুলো বেগুনের চারা পুঁতেছেন। সেদিকে যেতে গিয়ে তাঁর কানে আসে একটা ক্লান্ত এঞ্জিন হুস্‌হাস্‌ শ্বাস ফেলতে ফেলতে ইয়ার্ড পার হচ্ছে। এই বর্ষা বাদলার মধ্যেও সিনেমার বিজ্ঞাপন নিয়ে রাস্তা দিয়ে হিন্দী গান বাজাতে বাজাতে একটা রিকসা চলে গেল। দক্ষিণ দিকে যেতে গিয়েও নিম গাছের গোড়ার কাছে বেলফুলের চারাটা একবার দেখে যান। সুন্দর লেগে গেছে গাছটা এই কয়েক দিনেই। নতুন পাতা ছেড়েছে। হঠাৎ সেদিনের শালিখটার পড়ে যাওয়ার দৃশ্য ভেসে ওঠে রজনীর চোখের সামনে। মুহূর্তে একটা নীরব কষ্ট টনটন করে ওঠে তাঁর বুকের মধ্যে। আপনাআপনি চোখ দুটো ওপরে গাছের ডালের দিকে চলে যায়। আহা, এ সময়ে একটা পাখি গাছের ওপর বসে থাকলে কি সুন্দর লাগতো। তিনি দেখতে পান, ধূসর আকাশের বুক চিরে প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে এক ঝাঁক বক ভিজতে ভিজতে উড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে তাঁর আর যাওয়া হয় না। ফিরে আসতে গিয়ে শুনতে পান, বাইরের ঘরে কেরাম বোর্ড খেলার শব্দ। দালানের সিঁড়ি দিয়ে

উঠে আসতে আসতে বোঝেন কনকপ্রভার ঘরে আরও কয়েকজন মহিলা কিসব কথাবার্তা বলছে। ছোট মেয়ে সুমিও যেন সেখানেই।

দাঁড়ান না রজনী। দালান পেরিয়ে নিজের ঘরে আসতে আসতে শুনতে পান মঞ্জরী তার ঘর থেকে আবার মা-মা বলে ডাকছে। ডাকুক, নিশ্চয়ই ওদের কানে যাবে। নিজের কিছু খুচরো কাজ পড়ে আছে তাঁর। দুটি ছাত্রের ট্রানশ্লেসনের খাতা দেখতে হবে। নাকের বাঁ দিকের ফুটো থেকে দুটো বেতো চুল লম্বা হ'য়ে কেবলই সুড়সুড় করছে আর হাঁচি পাচ্ছে। কাঁচি দিয়ে ছাঁটতে হবে দুটোকে। ঘরে এসে ছাতাটা কোণের দিকে শুকোতে দেন রজনী। পায়ে কাদা লেগেছে। ধুতিটা আরও গুটিয়ে নেন। পা ধুতে কলঘরে যাওয়ার জন্য আবার দালানে বেরিয়ে আসেন। শুনতে পান মঞ্জরীর ডাক। মা-মা হাম্বা হাম্বা ডাকে সে যেন খুব অস্থির আকুতি জানায়। ক্রমাগত সে ডেকেই চলে। কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যান রজনী। এক চুল নড়তে পারেন না তিনি। শুধু মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করেন একটু আগের ঝিরঝিরে বৃষ্টি যেন হঠাৎই ভীষণ জোরে তোড়ে এসে পড়েছে। ছাদের ওপর আকাশ ভেঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এখনই।

তিন

এমনিতেই পাতলা ঘুম রজনীর। তার ওপর বার তিনেক উঠতে হয় রাতে বাথরুম করার জন্য। বসে থাকতে হয় অনেকক্ষণ, পেচ্ছাব আর হতেই চায় না। টুপ টুপ করে ফোঁটা ফোঁটা বেরোয়, কোঁৎ পেড়ে চাপ দিতে গেলে আরও আটকে যায়। বছর কয়েক আগে হোমিওপ্যাথ শিব ভটচায্ গুহ্যদ্বারে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে বলেছিলেন— প্রস্টেটটা বড় হয়েছে, অপারেশন না করালে এ কষ্ট আর যাবে না।

উহ্, সে কি যম-যন্ত্রণা রজনীই জানেন। সন্ধ্যে থেকেই পেচ্ছাপ একেবারে বন্ধ। হবে হবে করে রাত বেড়ে গেল। এদিকে তলপেট ফুলে ঢোল। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে লাগল নাইকুণ্ডুলী থেকে পুরুষাঙ্গের ডগা পর্যন্ত। কাপড়ে-চোপড়ে দু এক ফোঁটা পড়ে গন্ধ বেরুতে লাগল।

ডাকব না ডাকব না করে শেষে ভোর রাতে আর পারলেন না থাকতে। যন্ত্রণায় ধুঁকতে ধুঁকতে কোনোমতে উঠে পাশে কনকপ্রভার দরজায় টোকা দিলেন।

কনকপ্রভা উঠলেন। ছেলেদের ডেকে তুললেন। মেজোছেলে নন্টুর বন্ধু পরিতোষ এম. বি. বি. এস. ডাক্তার হয়েছে। তাকে ডেকে আনা হল তাড়াতাড়ি। তারপর···উহ্ সে কি নিদারুণ কষ্ট ভাবা যায় না। একে তো বউ ছেলেপুলের সামনে কাপড়-চোপড় খুলে ল্যাংটো করে দেওয়ার লজ্জা; তার ওপর নারকেল তেল মাখানো একখানা লাল রক্তের রবারের নল পেচ্ছাপের রাস্তা দিয়ে একবার ঢোকাচ্ছে আর একবার বের করছে। কিছুতেই সে আর মূত্রথলির মধ্যে সেঁধোয় না। মুখ আটকে বসে আছে দু তিনবার চেষ্টা করার পরে রজনীর মনে হল, পুরো পেচ্ছাপের রাস্তাটা যেন শুকনো লঙ্কা বাটা দিয়ে ডলছে। চাপা আর্তনাদের মতন বলে উঠেছিলেন— বাবা, পরি, এর চেয়ে চিরনিদ্রায় যাওয়ার মতন একটা কিছু ব্যবস্থা কর। আর পারছি না, মেরে ফেল্ আমায়।

যা হোক শেষ পর্যন্ত তবু রক্ষা পেয়েছিলেন সে যাত্রা। কি ভাবে যেন পুট করে নলটা শেষের দিকে গলে গিয়েছিল। তোড়ে জল বেরুনর মত পেচ্ছাব বেরুতে শুরু করেছিল নলের মুখ দিয়ে। তলপেট নামছিল একটু একটু করে। মনে মনে রজনী বলেছিলেন—শত্রুরও যেন পেচ্ছাব আটকে যাওয়ার কষ্ট কখনও না হয়। পেচ্ছাব বেরিয়ে হালকা হওয়ার আরামে শেষদিকে ঘুম এসে গিয়েছিল তাঁর।

তার পর থেকে অবশ্য এখনও আর আটকায় নি। ভয়ে অপারেশনও যথারীতি করান নি। কিন্তু একটু আধটু অসুবিধে বোধ করলেই রজনী এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে সচেতন হয়ে থাকেন। কি জানি বাবা, আবার ছিপি আটকে যাবে কি না!

আজ সন্ধ্যা থেকেই শরীরটা একটু গোলমেলে লাগায় সজাগ ছিলেন রজনী। হয়তো এমন কিছু নয়, কিন্তু পেচ্ছাব আটকে যাওয়ার সেই স্মৃতি মাথায় এলেই মনটা কুঁ গাইতে থাকে। বয়সেরই দোষ বোধহয়।

কে জানে, এবার যদি আবার তেমন শুরু হয়, রজনী ধরে নেবেন, হরির ডাক পড়ল, আর রক্ষে নেই।

বোধহয় মিনিট দশেকও হয় নি। তৃতীয় দফার পেচ্ছাবটা করে এসে শুয়েছেন। কনকপ্রভার ঘর থেকে পেটা ঘড়ির তিনটি ঘণ্টা শুনে বুঝেছেন রাত তিনটে হল। আকাশ পাতাল নানারকম ভাবনা আর চোখের সামনে অন্ধকারে হাবিজাবি নানান চিত্র বিচিত্র দেখতে দেখতেই হঠাৎ রজনী শুনতে পান রাস্তা থেকে খোল করতালের আওয়াজ ভেসে আসছে। যেন দূর থেকে ক্রমশঃ কাছে আসছে। কান খাড়া করেন তিনি। হ্যাঁ, ঠিক। খোল খঞ্জনীর বাজনার সঙ্গেই কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে একটা দল যেন এগিয়ে আসছে। হরিধ্বনি পড়ছে মাঝে মাঝে। বর্ষাটা এবার দেরিতে এলো বটে, কিন্তু এসে তক্ যাওয়ার আর নাম নেই। আ োরে টিপটিপ ঝিরঝির করে পড়ছে তো পড়ছেই। এখন তেমন জোর না থাকলেও, অন্ততঃ ইলশেগুঁড়ির মতো নিশ্চয়ই ঝরছে। মশারি তুলে গাবার আস্তে আস্তে বাইরে আসেন রজনী। হরিধ্বনি দিতে দিতে দলটা অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই মুক্তোপুরের শ্মশানঘাটে যাবে। আস্তে আস্তে এসে পশ্চিম দিকের জানালাটার কাছে দাঁড়ান তিনি। ঠিক বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ানো নয়। কতোই তো অমন যায়। কিন্তু এই শ্রাবণের নিঝ্‌ঝুম বাদলা রাতে কেউ একজন পৃথিবীর মায়া কাটালো—এমন এক ভাবনাই তাঁকে জানালায় দাঁড় করিয়ে দিল। নিজের মনের মধ্যে নিঃশব্দে তাঁর এই মায়া কাটানোর ব্যাপারটা কেমন, এই গোছের এক ভাবনা পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে থাকে। সত্যিই কি মায়া কাটে! ছোট বড় ভাল মন্দ সত্যি মিথ্যে যতোরকম ব্যাপার একটা মানুষের সারা জীবনে ঘটে—সে সবই তো আসলে মায়া। সত্যি যদি সেসব কেটে যায়—তাহলেই কি একটা মানুষ মৃত! আর জীবিত অবস্থার মধ্যেই যদি সব মায়া কাটিয়ে ফেলা যায়—তবে কি বলা যাবে তাকে! সিদ্ধাবস্থা! রজনী নিজের অবস্থাটা কেমন ভাবেন। জীবিত না মৃত, সিদ্ধাবস্থা নাকি জীবন্মৃত! হঠাৎ এই রাতদুপুরে প্রায় সত্তর

বছরে পৌঁছে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রজনী চাটুয্যের মনের মধ্যে খুব নিঃশব্দে একটা ঝড় ওঠে। বুক ভার করা চাপা ঝড়। এই সুদীর্ঘকাল জীবনযাপনে তিনি কখনই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি তাঁর অবস্থাটা কেমন। কিভাবে কেন বেঁচে আছেন তিনি। অথচ নিজের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটি অন্ততঃ এই বয়সে তো তাঁর বুঝে ফেলা উচিত ছিল। কি করলেন, এই প্রায় সত্তরের দীর্ঘ জীবদ্দশায়! কোনো হিসেবটাকেই আশ্চর্য তিনি এতো দিনে মেলাবার চেষ্টা করেন নি তো। মাথাতেও তো আসে নি। এখনই বা এলো কেন, কি দরকার ছিল!

বড় বিব্রত অসহায় বোধ করেন রজনী শ্মশানযাত্রীর দলটা তাঁর সামনে দিয়েই অনেকটা দূরে চলে গেছে। তাদের খোল করতালের আওয়াজ এখনও তাঁর কানে এসে পৌঁছায়। রাতের অন্ধকারে ঝির-ঝিরে বৃষ্টিতে তাদের সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই এখন রজনীর সেই শালিখ পাখিটার মরে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে ওঠে। জীবন কি অদ্ভুত! যেন অদৃশ্য সব সরু সরু সুতো দিয়ে কোনো অলীক দণ্ড থেকে ঝোলানো। মৃত্যু নামের এক অপার্থিব নিরাকার কাঁচি যখন তখন কুচ্‌ করে সুতোটা কেটে দিতে পারে। তখনই শালিখ পাখিটার মতন ধুপ করে পড়ে যেতে হবে। ব্যস্‌, ভবলীলা সাঙ্গ।

আস্তে আস্তে ফিরে আসেন রজনী জানালার ধার থেকে। এক মোহাচ্ছন্ন বিষাদময় অবস্থায় নিজের ঘরে ফিরতে গিয়ে শুনতে পান, পাশে কনকপ্রভার ঘর থেকে ছোট মেয়ে সুমির ওয়াক তুলে বমি করার শব্দ। এগিয়ে যান কনকের ঘরের দিকে। দরজা ঠেলে ঢোকার আগেই কানে আসে স্ত্রীর গলা। মেয়েকে বলছেন—মুখপুড়ী মর, এখানেই মর তুই। গতরে তোর এমন জ্বালা যে সইতে পারলি না আর কটা দিন! ঘেন্নায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। লোকের কাছে মুখ দেখাবো কোন্‌ আক্কেলে!—বকুনির সঙ্গে ক্ষোভ, ক্ষোভের সঙ্গে শেষের দিকে কান্না মিশে যায় কনকপ্রভার গলায়। রজনী আর দাঁড়ান না। থির থির করে তাঁর দু পায়ের হাঁটু কাঁপতে থাকে। কিছুদিন

থেকেই তিনি যেন আঁচ করছিলেন কোনো এক দুর্ঘটনা ঘটার। শরীরটা ভীষণ দুর্বল মনে হয় তাঁর। কোনমতে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। নিঃশব্দে ঠোঁট নড়ে, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ!

চার

এ এক অদ্ভুত অবস্থা হ'য়ে রয়েছে। বৃষ্টি পড়লেই ঠাণ্ডা লাগে, গা শিরশির করে। না পড়লেই গরমে আর প্যাচপেচে ঘামে জীবন বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়। মনে মনে হিসেব করেন রজনী। পচা ভাদ্দর এসে গেল। অবশ্য কষ্ট হলেই এমন ভাবনা, নয়তো নয়। ভাদ্র মাস কি খারাপ! টলটলে কূল উপছানো ভরা পুকুর দেখলে, ভোরবেলা শিউলির গন্ধ পেলে ভাদ্রমাস কি আর খারাপ লাগে! রজনীর জন্মমাসও তো এই ভাদ্র। ছোটবেলায় রজনীর মনে আছে, মা বলতেন, তোর ঠিকুজীর নাম দিয়েছি রাধানাথ। কেন বলতো? শ্রীকৃষ্ণ আসলে ভাদ্রমাসেই জন্মেছিলেন, তাই। তারপর আরও কতো কৃষ্ণলীলার গল্প বলতেন মা। আহা, কোথায় গেল সেই সব দিন! মনটা বড় ভার হয়ে রয়েছে কদিন ধরেই। পাঁচদিন আগে মঞ্জরীটা অনেক হাঁকপাক করে শুয়ে দাঁড়িয়ে চিতিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা রোগা মরকুটে মরা বাছুর বিয়োলো। বেচারি বোধহয় দেখতেও পায় নি বাচ্চাটাকে। নেতিয়ে পড়েছিল নিজেই একেবারে। এদিকে মরা বাছুর নাকি গোয়ালে ফেলে রাখতে নেই। ধাঙ্গড় এসে টেনে নিয়ে গেল। যাক, সে আর কিছু করার নেই। কিন্তু রজনীর বড় মর্মান্তিক লাগলো—যখন সেই মরা বাছুরেরই ছালটা গা-এর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তুলোর বস্তার ওপর সেটাকে সেলাই করে জোড়া লাগিয়ে চারখানা বাখারী দিয়ে মঞ্জরীর সামনে এনে দাঁড় করানো হ'ল। এমন ঘটনা রজনী আগে দেখেন নি তা নয়। কিন্তু নিজের বাড়িতে এমন ঘটনাটা রজনী কিছুতেই সহজে নিতে পারছেন না। বলারও কিছু নেই। তাঁর পরিবার নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন।

রজনী বলেছিলেন—হ্যাঁ গা, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতন, কেন আর ওকে কষ্ট দিচ্ছো?

—ওমা কষ্ট কি!—কনকপ্রভা ভ্রু তুলেছিলেন।—পুতুলের মতন ওটার গা চাটে বলেই তো যেটুকুন হয় দুধ দিচ্ছে। নয়তো তাও দিত না।

বড় অবাক লেগেছিল রজনীর। ভালবাসা-টাসা আসলে কিছু নয়। নিজের স্বার্থ খানিকটা দেখতে পারলে, ঠকানোতেই বা আপত্তি কিসের—এমনই এক ব্যাখ্যা যেন। আর কিছু বলেন নি। শুধু বাগানের পুব দিকটায় তিনি আর যেতে পারেন না। মঞ্জরীর সেই কৃতজ্ঞতার মায়া জড়ানো চোখের দিকে চাইলে, তাঁর বুকে মোচড় দেয়।

দালান থেকে বাগানে যাওয়ার সিঁড়িতে বসেছিলেন রজনী। আকাশটা মোটামুটি পরিষ্কার। ঘরের মধ্যে বদ্ধ লাগলেও বাইরেটা এসময় হাওয়া দেয়। যে কোনো মুহূর্তেই হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে যেতে পারে কিন্তু যতোক্ষণ না আসে বেশ ভাল লাগে।

পিছন থেকে কনকপ্রভার গলা পেয়ে ঘাড় ঘোরান রজনী।

—তুমি একটু ভেতরের ঘরে এসো তো।

—কেন, কি হল আবার?

—এসোই না!—কনকপ্রভা যেন একটু ইতস্তত: করেন। তারপর আবার বলেন—ওই, সুমি চলে যাচ্ছে···মানে তেওয়ারী ওকে নিয়ে যাবে, তাই প্রণাম করবে তোমায়।

—কে, সুমি যাবে? কোথায়?—বলতে বলতে উঠে আসেন রজনী দালানের দিকে। ব্যাপারটা কিছুই পরিষ্কার হয় না তাঁর কাছে। যেন কনকপ্রভা কি বললেন ভাল করে শোনার জন্যই তিনি উঠে আসেন। কিন্তু হঠাৎই যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো হকচকিয়ে যান সামনে তাকিয়ে।

একেবারে বধূ সেজে সামনে দাঁড়িয়ে ছোট মেয়ে সুমি। পরনে টকটকে লাল বেনারসী, মাথায় আধখোলা ঘোমটার মধ্যে দিয়ে জ্বলজ্বল

করছে সিঁথিতে সিঁদুর। গলায় ঝিকিমিকি পাথর, হাতে এক গোছা চুড়ি। রজনীর ভাবনাচিন্তা সবই তালগোল পাকিয়ে যায়। তিনি সত্যিই জেগে রয়েছেন তো!

তাঁর চটকা ভাঙ্গে কনকপ্রভার গলায়।

—নে প্রণাম কর বাবাকে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন! দূরের যাত্রা আবার, গাড়ি লেট হয়ে যবে যে!—একটু এগিয়ে আবার সুমির পাশ দিয়ে দেখে বলেন—কই নাও, তুমিও প্রণাম করে নাও।

এতোক্ষণে সামান্য চোখ ঘোরান রজনী। একটি নাদুস নুদুস তেল চুকচুকে কালো চেহারার একরঙা প্যান্ট শার্ট পরা লোক। রজনী তাকানমাত্র সে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। নিচু হয়ে এগিয়ে প্রণাম করতে করতে সে বলে—আপনে তো হামাকে দেখেন নি বাওয়া। হামার নাম ব্রিজ নারায়ণ তেওয়াবা। স্-সুমিতাকে হামি বিয়া করেছি। আজকে দেস্-শে লিযে যাচ্ছি। আস্-সলে ইণ্টাবকাস্ট মেরেজ তো…তাই মানে একটু চুপিচুপি…

পাথরের মতো স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন রজনী। টের পান না মাথা তাঁর কাজ করছে কি করছে না। লোকটি উঠে দাঁড়ানর পর, সুমি নিচু হয়ে প্রণাম করে তাঁকে। উঠতে গিয়েই হঠাৎ তার কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পান রজনী। কিন্তু কোনো ব্যাপারটাই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয় না। সুমি কাঁদছেই বা কেন!

খানিকটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতন কনকপ্রভাই কথা বলেন।—আসলে তো ওদের ভাব ভালবাসা ছিলই আগে থেকে। কদিন আর ফেলে রাখবে! আমিই আজ রাধাবল্লভের মন্দিরে গিযে সিঁদুর দিইয়ে এনেছি। একটু থেমে কনক আবার বলেন—চল বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি ঠাকুরঘরে আবার পিদিমটা জ্বালিয়ে রেখে এসেছি।

—তাহলে আস-সি বাওয়া। পোবে কোনোদিন দেখা হোবে।

তিনটি মূর্তি সামনে থেকে সরে যায়। এগিয়ে যায় দালান দিয়ে। বাইরের ঘরের দরজার দিকে নয়, খিড়কির দিকে। একটা মিষ্টি গন্ধ ওড়ে বেড়ায় রজনীর নাকের সামনে। তিনি তাকিয়ে আছেন, চোখ

খোলা অথচ কোনো কিছুই আর দেখতে পান না। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে বাইরে। হয় তো সেই জন্যই একটা ঝাপসা অন্ধকার ঘিরে ফেলছে ক্রমশঃ। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বোধহয় বাইরে। সেই সঙ্গে এলোমেলো হাওয়াও।

রজনী দাঁড়িয়েই থাকেন। নড়তে পারেন না। পা দুটো যেন এখনও আটকান। কি ভাবে তাঁর চোখের ওপর একটু একটু করে ভেসে ওঠে শালিখ পাখিটার মরে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য। খুব অবাক লাগে তাঁর, কেন ওই দৃশ্যটা তার এখনই এমন ভাবে চোখের ওপর এসে পড়ল ভেবে। কিন্তু কিছুতেই কাটাতে পারেন না ছবিটাকে।

অন্ধকার নেমে আসে রজনী চাটুয্যের বাড়িতে। দিনটা শেষ হয়ে যায়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগলো না। যদিও খুব নিঃশব্দে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল, তবু এই ঘনবসতি মধ্যবিত্ত বাঙালী পাড়ায় তা খবর হয়ে যেতে খুব কম সময় নিল। মফঃস্বল শহর, পাশাপাশি কাছাকাছি গায়ে গায়ে বাড়ি। ছাদে উঠে পড়শী মহিলাদের খোসগল্প আড্ডা চলে। কখনও সরবে, কখনও ফিসফিস করে। তার ওপর এমনই একটা মুখোরোচক খবর। মণির মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

হ্যাঁ, খবর কিংবা ঘটনা বলতে ওইটুকু। কিন্তু তা বললে হবে কেন! গেরস্থ বাঙালীর বাড়ি থেকে ভরদুপুরে ঘরের বউ তার কোলের বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল, সারা পাড়ায় তার প্রতিক্রিয়া, আলোচনা, ব্যাখ্যা হবে না! মুখে মুখে মুহূর্তে মুহূর্তে খবরটি রং পাল্টে রঙীন ও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো। কেন গেল, কোথায় গেল, অন্য কারো কাছে চলে গেল কি না, বড় মেয়েটাকে কার কাছে রেখে গেল, আগে থেকেই কারুর সঙ্গে তলে তলে সম্পর্ক ছিল কি না, স্বামীটারই বা কি ব্যাপার···চাপা আলোচনা, জোয়ারের আগে নদীর জলে অন্তঃস্রোতের মতো চলতে লাগলো পাড়ায়।

ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন গৌরাঙ্গবাবুর স্ত্রী। আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন উল্টোদিকে চন্দ্রাদের বাড়ির দোতালার বারান্দায় টবে ঝুলন্ত মানিপ্ল্যাণ্টের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন চন্দ্রার মা আর কাকীমা। কর্তারা এই সময় সব বাইরে। কিন্তু ক্রিসমাসের ছুটিতে ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে—ঘুম নেই কারো চোখে—গল্প করছে, খেলাধুলো করছে কিংবা বই পড়ছে। ছেলেপুলেদেরও দিব্যি জ্ঞানগম্যি হয়েছে

আজকাল। অনেক কথা সামনে বলা যায় না। অথচ এমন একটা খবর শোনার পর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা না বললে কি পারা যায়। ছাদ কিংবা নির্জন বারান্দাটুকু ছাড়া উপায় কি।

গৌরাঙ্গবাবুর স্ত্রী সুধা খানিকক্ষণ কাপড় নাড়াচাড়া করার আছিলায় অপেক্ষা করলেন। যদি চন্দ্রার মা কিংবা কাকীমা একবার গলা তুলে ডাকেন। দুটো চারটে কথাবার্তা বলা কিংবা শোনা যায়, যদি নতুন কোনো তথ্য জানা যায়। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললে অনেক সময় হঠাৎ কিছু আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে। সামান্য ছোটখাট কোন ঘটনা, যা হয়তো কখনই গুরুত্ব পায় নি, বলা যায় না, হঠাৎ একটা কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে।

কিন্তু না, চন্দ্রার মা গীতাদি কিংবা কাকীমা তপতী কেউ লক্ষ্যই করলেন না সুধাকে। নিজেদের কথাবার্তায় মশগুল। অথচ সুধা নিশ্চিত জানেন ওঁদের আলোচনা এবং তার বিষয় মণির মা-র গৃহত্যাগ। একটা চাপা অথচ সচকিত ভাব মাঝে মাঝে ভ্রু কুঁচকে মনযোগ দিয়ে একজন আর একজনের কথা শুনছেন, কখনও হাতের আঙুল নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছেন, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠছেন, আবার সতর্ক হয়ে ঘরের দিকে তাকাচ্ছেন। কোনো সন্দেহ নেই সুধার, এই দুপুরবেলা বারান্দায় দাঁড়ানো দুই জায়ের মুখে আলোচিত হচ্ছেন, সেই ঢলঢল চেহারা ফর্সা রং স্বাস্থ্যবতী মহিলা—পূরবী, মণির মা এবং তাঁর সাংসারিক জীবন।

অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েন সুধা। নিশ্চয়ই খবরাখবর বেশি আছে গীতাদি আর তপতীর কাছে। তা নয়তো এতো গভীর ভাবে আলোচনা করার কি হ'তে পারে! প্রায় ডাকতে যাচ্ছিলেন সুধা, একটু গলা উঁচু করে। কতোটুকুই বা দূর আর! তার ওপর নিঝুম দুপুর। একতালা থেকে দোতালায় কাউকে ডাকার মতো চেঁচালেই তো শোনা যাবে চন্দ্রাদের বাড়ি থেকে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন সুধা। কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও ভাবলেন—এতোক্ষণ ধরে গীতাদি আর তপতী কথা বলে চলেছেন, কিন্তু একটা শব্দও তো তাঁর কানে এসে

পৌঁছাল না। তার মানেই রহস্য বেশ ভাল রকম দানা বেঁধেছে। মণির মা-র বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার না। গোলমেলে ব্যাপার জড়িয়ে আছে।

কি হ'তে পারে! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুধা ভাবলেন। মণির মা, পূরবীর ত্রিশের মতো বয়স হবে। এ পাড়ায় এসেছেন বছর চারেক হয়ে গেল। ছোট ছেলেটা তখনও হয় নি, মণির বয়সই ছিল চার সাড়ে চার তখন। দেখতে শুনতে পূরবীকে এ পাড়ার মধ্যে ভালই বলতে হবে। নাক চোখ মুখ কোন্‌টা ভাল, আলাদা করে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারায় একটা আলাদা চটক আছে। সুন্দর গড়ন শরীরের। দুটো বাচ্চা আছে না বলে দিলে বোঝা যায় না। গায়ে পড়া ভাব না থাকলেও কথাবার্তায় ভদ্রমহিলা খারাপ না। তিন চার দিন আগেই প্রায় সন্ধ্যের সময় সুধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মণির মা-র। টুকটাক দু একটা জিনিসপত্র কিনে ফিরছিলেন সুধা। একটু পিছন থেকেই পূরবী, ও বৌদি, ও বৌদি বলে ডেকেছিলেন সুধাকে। তাকাতেই সুধা দেখলেন হাত নেড়ে পূরবী ডাকছেন। কৌতূহলী হয়ে সুধা এগিয়ে গেলেন। সুন্দর দেখাচ্ছিল পূরবীকে। হলুদ রং তাঁতের শাড়ির ওপর কালো ব্লাউজ গায়ে। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরছে কোথা থেকে। সুধা কাছে আসতেই বললেন —বৌদি, আপনার কাছে খুচরো পয়সা আছে সত্তরটা। এই রিক্সাকে দেব, ওর কাছে চেঞ্জ নেই। আপনাকে বাড়ি গিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক আছে, বলে সুধা পয়সা দিয়েছিলেন। একসঙ্গে বাড়ির দিকে আসতে আসতে সুধা জিগ্যেস করেছিলেন—কোত্থেকে ফিরছেন?

—এই কাছেই, ব্যানার্জি পাড়া থেকে। পূরবী উত্তর দিয়েছিলেন, —আমার এক ভাগ্নী থাকে, দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? মণির মা প্রশ্ন করেছিলেন।

দু হাতের জিনিসপত্র তুলে দেখালেন সুধা। —আমার কথা আর বলবেন না। এই যে, ছেলের পেনসিল কাটার কল, ওনার জন্য ব্লেড,

কাল সকালের পাঁচরুটি এই সব আর কি। কাজকর্মে ছাড়া আমার কি আর কোথাও যাওয়ার উপায় আছে!

একই গলিতে ছুটো বাড়ি আগে মণিদের বাড়ি। গেটে ঢুকতে ঢুকতে পূরবী বলেছিলেন—বৌদি আসবেন একদিন সময় করে।

সুধা এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন—দেখি ভাই, আসবো।

—আপনার পয়সাটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মণির মা বলেছিলেন।

—ঠিক আছে ঠিক আছে, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সুধা ঢুকে গিয়েছিলেন বাড়িতে।

ছাদ থেকে নেমে এসে সুধা ভাবলেন, আশ্চর্য, এই সেদিন, অথচ কিছু বোঝেন নি তখন। নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে মতলব কষছিল পালাবার তখন থেকেই। তা নয়তো একদিনের মধ্যেই একটা ঘরের বউ কি আর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে! জামাকাপড় গয়নাগাঁটি সব গোছগাছ করেছে নিশ্চয়ই!

শীতের ছোটবেলা। রোদ থাকলেও তেজ কমে এসেছে মোটে সাড়ে তিনটের মধ্যেই। কাজকর্ম শেষ করে স্নান খাওয়া-দাওয়া সারতে দেরি হলেও, যতোটুকু পারেন গড়িয়ে নেন সুধা। খানিকক্ষণ শুয়ে না থাকলে শরীর ঝরঝরে লাগে না কি গ্রীষ্মে কি শীতে। অথচ আজকের ছুপুরটা অন্যরকম ভাবে কেটে গেল। শোওয়ার ইচ্ছে কিংবা সুযোগ কোনোটাই যেন হল না। সেই বেলা বারোটা নাগাদ রত্না এসে খবরটা জানানোর পর থেকেই কি এক নিঃশব্দ ছটফটানি আর অস্থিরতায় কাটিয়েছেন সুধা। চাপা সূক্ষ্ম এক আলোড়ন অনুভব করছেন নিজের মধ্যে। অথচ তা যে কেন নিজেও ঠিক জানেন না।

খুব তাড়াহুড়ো করে রত্না ছুটে এসেছিল। মনে হচ্ছিল রান্নাবান্না মাঝপথে সব নামিয়ে রেখেই যেন চলে এসেছে। সুধাকে খবরটা দেয়া যেন ভীষণ জরুরী। অল্প বয়সী মেয়ে, বিয়ে হয়েছে বছর তিন-চার। ছোট বাচ্চাটাকে পিসীশাশুড়ির কাছে রেখে রান্নার হাত মুছতে মুছতে রত্না এসে হাজির।

—ও সুধাদি, সুধাদি, কোথায় গেলেন, শুনেছেন খবর?

রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন সুধা। রত্নার গলা পেয়ে চমকে উঠলেন।

—কি ব্যাপার রত্না, কি হয়েছে? —রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন সুধা। তার মধ্যেই রত্না হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একই সঙ্গে হাসি আর রহস্য মাখিয়ে বললো—জানেন না কিছু? কতো বড ঘটনা ঘটে গেল পাড়ায়!

—কি জানবো, কোন্ ঘটনা? বিস্মিত হলেন সুধা।

—পূরবীকে চেনেন তো? ঐ যে আমাদের বাড়ির দোতালায় থাকে, মণির মা···

—হ্যাঁ, চিনবো না কেন, কি হয়েছে পূরবীর?

—বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, এই একটু আগে। আধঘণ্টাও হয় নি বোধহয় এখনও।

—সে কি, কেন? কি হয়েছিল, কোথায় গেল?

—অতশত জানি না বাবা।

বিমূঢ় হ'য়ে রইলের সুধা কয়েকটা মুহূর্ত। পুরোপুরি যেন মাথায় ঢুকলো না কথাটা। তারপরেই মনে হল, ছেলেমেয়েরা বাড়িতে রয়েছে, একটু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কৌতূহলের প্রথম ধাক্কাটা তখনও কাটে নি। কিন্তু রত্না তার মধ্যেই একটু যেন চাপা গলায় আড়াল করে বলতে আরম্ভ করল—কিছুদিন ধরেই আঁচ করছিলাম। ওপর নীচে থাকা তো, মনে হচ্ছিল কর্তাগিন্নীর মধ্যে একটা গোলমাল চলছে। কিন্তু এতোটা যে একেবারে বাড়িঘর ছেড়ে চলেই যাবে, তা, অবশ্য বুঝি নি।

—কি করে বুঝলে একেবারে চলেই গেছে?—রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন সুধা।

—ও মা, তা আবার বুঝবো না! রত্না পেছন পেছন ঢুকলো।—সকাল থেকেই তো ঠুকঠাক আওয়াজ, জিনিসপত্র গোছাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। তারপর মণির বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই তাড়াহুড়ো। আমার তো কান খাড়াই রয়েছে। মণিটা তো প্রায়ই আমার ঘরে এসে টুবাইকে নিয়ে খেলা করে। ওর বাবা বেরিয়ে যাবার পরেই একবার

জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁরে, তোর মা কি কোথাও বেরিয়েছে? মেয়েটা তো ছোট আর সরল, বললো—এখনও বেরোয় নি, একটু পরেই যাবে। আমি আবার জিগ্যেস করলাম—কোথায় রে? মেয়েটা খেলতে খেলতে বললো—ধানবাদ। আমি বললাম, সে কি রে, তুই যাবি না মার সঙ্গে? বললো, না, আমি ওপরের দিদার কাছে থাকবো।

সুধার হাতে খুন্তি ধরা, কিন্তু নড়ছে না। রান্নার গ্যাস নিবিয়ে দিয়ে একমনে কথা শুনছেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন মিলিয়েও নিচ্ছিলেন রত্নার ধারণা ঠিক কি না। অস্ফুট স্বরে বললেন—তারপর?

রত্না আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো সুধার কাছে। বললো, তারপর আর কি? মেয়েটাকে আর কিছু জিগ্যেস করলাম না। খানিকক্ষণ পরেই শুনি ওর মা বাড়িওলাকে বলছে, মাসিমা, আমি বেরুচ্ছি, চাবিটা আপনার কাছে রেখে দিন। মণির বাবা এলে একটু দিয়ে দেবেন। শুনি, বাড়িওলা জিগ্যেস করলেন, তা কিছু বলতে হবে না, তুমি কখন ফিরবে কিংবা কিছু? তারপরেই সুধাদি, একদম স্পষ্ট শুনলাম মণির মা বললো—ন্‌না। যদি কিছু জিগ্যেস করে বলবেন আমি বেরিয়ে গেছি। তারপরেই সিঁড়িতে চটির শব্দ শুনে আমি তো রান্নাঘরে চলে গেলাম। আমাদের বারান্দার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুধু মেয়েকে ডেকে বললো—মণি তুই এখানে রয়েছিস? আমি বেরুলাম। ব্যস, আর কিচ্ছু না। আর মেয়ে তো মা'র দিকে তাকিয়েও দেখলো না। সুধা স্থির হয়ে রইলেন, নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন কয়েকটা মুহূর্ত রত্নার দিকে। ওর চোখ উত্তেজনায় উজ্জ্বল। যেন এতো বড় একটা খবর প্রথম ও সুধাকে জানাতে পেরে মনে মনে নিজেকে গর্বিত মনে করছে।

—তারপর? সুধা হাত ধুতে ধুতে জিগ্যেস করলেন।

—তারপর আর কি?—রত্নার উত্তেজনা তখনও কমে নি। তড়বড় করে বললো—মেয়েটা তো এখনও রয়েছে আমার ঘরেই। বলেছি দুপুরে আমাদের ওখানেই ভাত খেতে। মেয়েটা রাজী। খেতে খেতে দেখি যদি আর কিছু জানতে পারি। অবশ্য খবর তো দেখছি এর

মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দ্রার কাকীমাও উলের প্যাটার্ন তোলার ন.ম করে একবার ঘুরে গেল ওপরে।

সুধা আর কোনো কথা বলছিলেন না। ঠুকঠাক হাতের কাজকর্ম সারছিলেন। রত্না চলে গেল। বললো—চলি এখন সুধাদি, রাজ্যের কাজকর্ম সব পড়ে রয়েছে। পরে আসবো।

—এসো। সুধাও বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

ব্যাপারটা চেপে বসেছে মাথায় সেই তখন থেকেই। সংসারের কাজকর্ম সারতে সারতেই সুধা অনুভব করেছেন বেশ কয়েকবার আনমনা হয়ে পড়েছেন। দরজার আওয়াজ পেলেই সচকিত হয়েছে কেউ এলো কি না। প্রতি বারই খবর দেওয়ার মতো কেউ না এলেও এই বিকেলের মধ্যেই আরও কয়েকজন ঘুরে গেছে। সুধা লক্ষ্য করেছেন তিনি নিজে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করার আগেই ঠিকে ঝি রাধার মা, অমলেন্দুবাবুর স্ত্রী মিতা কিংবা রঞ্জনের মা পারুল সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে সুধাকে মণির মা-র খবর জানিয়েছে। মাঝে রত্নাও আর একবার ঘুরে গেছে। কোনো আলোচনার বিষয় এবং বিশেষ কোনো গুরুত্ব এতোদিন না পেলেও হঠাৎ এই কয়েক ঘণ্টাব মধ্যেই আজ মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছে মণির মা। সুধা ভাবলেন, আপাততঃ কয়েকদিনের জন্য এ পাড়ার অনেকেরই কথাবার্তা ভাবনা চিন্তার অনেকখানি ঐ মহিলা দখল করে নিয়েছেন।

নতুন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে অনেক। ভদ্রমহিলার নাকি বিয়ের আগেও কি সব ব্যাপার হয়েছিল। মণির বাবার সঙ্গে এই বিয়ের পিছনেও আছে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। প ঞ্জাবীদের মতন দেখতে একটা লোকের সঙ্গে এখনও নাকি তলে তলে ভদ্রমহিলার সম্পর্ক আছে। হয়তো তার কাছেই চলে গেছে। কোলের ছেলেটা বোধহয় ওই লোকটারই। আরও অনেক কিছু। মণির বাবা-মা-এর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের ব্যবচ্ছেদ। ভদ্রলোক নাকি ইন্‌পোটেণ্ট্।

রোদ পড়ে এসেছে প্রায়। উঠোনে শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় তুলে আনছিলেন সুধা। হিম পড়বে একটু পর থেকেই। বারান্দায়

উঠতেই চোখ পড়লো ঘরের দিকে। মেয়ে শিখা আর পাশের বাড়ির সোমা। প্রায় সমবয়সী দুজন। চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স। বাইরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে ঘনিষ্ঠ হয়ে কিছু আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। সুধা ধরে নিলেন ওদের আলোচনার বিষয় কি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলেন পাড়ার সব বয়সীদের কাছেই মণির মা আজ এক অন্য ব্যাপার। একটা ছোট্ট ঘটনায় ভদ্রমহিলা সকলের চোখেই নতুন ভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছেন। সুনাম দুর্নাম যাইহোক, ভদ্রমহিলা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। একজনকে নিয়েই সকলে ভাবছে আলোচনা করছে, তিনি হচ্ছেন মণির মা।

দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো সুধার মাথায়। অসম্ভব রাগে শরীর কাঁপতে লাগলো। তারই প্রথম ধাক্কাটা গিয়ে পড়লো মেয়ের ওপর। চোয়াল চেপে, কঠিন গলায় বারান্দা থেকে ডাকলেন—শিখা এদিকে আয়।

সন্দেহ আর আশংকা একসঙ্গে মুখে নিয়ে মেয়ে এসে দাঁড়ালো। পিছনে সোমা, মুখে ভয়। ভ্রু কুঁচকে উঠলো সুধার, নাকের পাটা ফুলে উঠলো। সামলাতে পারলেন না নিজেকে। অনেকদিন যা করেন নি, তাই করে উঠলেন।

হাতের জামাকাপড়গুলো ফেলে দিলেন বারান্দার মেঝেয়। চুলের বেনী ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন মেয়েকে। ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠলেন—কি কথা আলোচনা করছিলি এতোক্ষণ? ফুসফুস গুজগুজ এতো কি কথা আমি জানি না ভেবেছিস!—ঠাস্ করে চড় কষালেন মেয়ের গালে। চুলের গোছো ধরে ঝাঁকিয়ে আবার বললেন—যতোসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে সারাক্ষণ ঘোঁট পাকানো হচ্ছে!

হাঁফাতে লাগলেন সুধা। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই স্থির হয়ে গেলেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখে। মেয়ে কাঁদলো না, চিৎকার করলো না। ঠোঁট চেপে খর চোখে তাকিয়ে রইলো মা-এর দিকে।

আগুনের হল্‌কা ঝলসে উঠলো আবার সুধার মাথায় কানে মুখে। মেয়ের জামার হাতা ধরে আবার টেনে আনলেন নিজের দিকে।

এলোপাথাড়ি চড় কষাতে কষাতে বললেন—চোখে চোখে তাকিয়ে আবার গরম দেখাচ্ছিস! একটা নষ্ট মেয়েছেলে ঘর সংসার ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তাই নিয়ে আবার আলোচনা।

—তবু তো পালাতে পেরেছে, তোমাদের মতন…

—কি, কি বললি! যতো বড মুখ নয় ততো বড় কথা!—উন্মাদ আক্রোশে ফুঁসে উঠে খামচে ধরতে গেলেন সুধা মেয়েকে।

ছিটকে সরে গেল শিখা। মায়ের হাতে ধরা জামায় টান লেগে ফ্যাঁস্ করে ছিঁড়ে গেল খানিকটা। অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সোমা। আতংকিত চোখ মুখ। ঘাড় শক্ত করে মেয়ে সোজা তাকালো মায়ের দিকে।

—ঠিকই বলেছি।—চাঁছাছোলা গলায় বাঁকা মুখে, ঠোঁটে ঘৃণা ফুটিয়ে বললো—মণির মা-র ক্ষমতা আছে সাহস আছে, তাই অমন মেনিমুখো স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেছে। অশান্তি করে নি। বারো মাস তিরিশ দিন বাবার আর তোমার মতন শেয়াল কুকুরের ঝগড়া খেয়োখেয়ি করে নি। তোমার এতো রাগ কেন আমি জানি না! বাবা তোমায় কিছুই দিতে পারে না। তোমার নিজেরও তো সাহস বলতে এই কাঁচকলা, এদিকে ইচ্ছে আছে ষোল আনা। ঝাল ঝাড়ছে আমার ওপর, আমি কিছু বুঝি না, না?

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধা। অতর্কিতে কতকগুলো উলটো চড় এসে পড়েছে তাঁর গালে। সতেরো বছরের মেয়ে শিখা ঘৃণায় ওলটানো ঠোঁট আর বাঁকা মুখের মধ্যে থেকে কতকগুলো ধারালো ছুরির ফলা ছুঁড়ে দিয়েছে সুধার দিকে। তিনি অপমানিত উন্মুক্ত রক্তাক্ত। গজ গজ করতে করতে মেয়ে ছেঁড়া জামার কোণ ধরে ছাদে উঠতে লাগলো।—মণির মা নষ্ট মেয়েছেলে আর উনি সতী-সাবিত্রী! চব্বিশ ঘণ্টা টগবগ করে ফুটছে। পাতানো ভাইদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করলে কি হবে, পাত্তা দেয় না তো কেউ। ক্ষমতা থাকলে নিজেও যাও না চলে। পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ। হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে একেবারে…

সন্ধ্যা নামছে। ধোঁয়াশা আর অন্ধকার চেপে বসছে বাইরে রুক্ষ গাছের মাথায়। কাঁচা ড্রেনের মশা ঠাণ্ডার সঙ্গে ঘরে ঢুকে আসছে খোলা দরজা জানালা দিয়ে। আলো জ্বালা হয় নি ঘরের।

মাটিতে আটকে যাওয়া নিশ্চল পা দুটো টানলেন সুধা। বুকে তখনও দুবদুব। দৃষ্টি ঘোলাটে। একটু লুকোবার আশ্রয়ের জন্য ঘরের দিকে এগোলেন টলতে টলতে। পরিচিত নিশানায় হাত দিয়ে আলো জ্বাললেন স্যুইচ টিপে। দরজা ভেজিয়ে দিলেন। জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন নিজের মুখোমুখি।

কত বয়স হল সুধার! চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। দুহাতের তালু মুখের ওপর ঘষে তাকালেন প্রতিবিম্বের দিকে। কিছু রেখা, কয়েকটা অনিবার্য ভাঁজ। তবু কালো চুলের গোছার মধ্যে রুপোলি তার নেই একটাও। স্ফীত গলা আর কাঁধ, ঢিলে বুক, তবু তা শুষ্ক নীরস হাওয়াহীন বেলুন নয়। অন্তর্বাসহীন শাড়ির ওপরেও নম্র অস্তিত্ব। প্রতিবিম্বের শরীর জরীপ করে নীচে নামছিল সুধার দৃষ্টি। তিনিও দুই সন্তানের জন্মদাত্রী। অবধারিত কিছু মেদ ওপর পেটে। সন্তান ধারণের দাগ আরও নীচে শাড়ির আড়ালে। একটু পাশ ফিরে দাঁড়ালেন সুধা। পিছনে ঢেউ তুলে নেমে গেছে ভারি নিতম্ব। এখনও মোটামুটি মানানসই সুধা অথচ পরিত্যক্ত অব্যবহৃত। মেয়ে ভুল বলে নি। নিষ্ফল উত্তেজনায় ফুঁসছেন সুধা অনেকদিন। নির্জীব উদাসীন ঠাণ্ডা একটি আধবুড়ো পুরুষের সঙ্গে শুয়ে থাকেন রাত্রে প্রতিবাদহীন জীবন আঁকড়ে। মনে মনে হাজারবার চাইলেও সুধা কোনোদিন খবর হ'তে পারেন নি। হিংসুটে সামাজিকতা, ক্রুর সংস্কার শাণিত লোকচক্ষুকে প্রশ্রয় দিয়ে, এখন কি তিনি নিজেই হন নি তার শিকার! অন্তরে বিষ, দৃষ্টিতে ঘৃণা জমিয়েছেন কার জন্য! মণির মা-দের, না নিজের জন্য!

বাইরের দরজায় আওয়াজ শুনলেন সুধা। নিশ্চয়ই আবার কেউ আসছে। রত্নাও হ'তে পারে, অথবা পাড়ার অন্য কেউ। ভাবতে ভাবতেই গলা পেলেন সোমার মা-এর।

—সুধাদি, ও সুধাদি, কোথায় গেলেন সব? হ্যাঁরে শিখা, সোমা কি তোদের এখানে!

সুধা বুঝতে পারলেন সোমার মা আসছে মেয়েকে খোঁজার অছিলায়, আসলে পাড়ার মনির মা-র কেচ্ছ গাইতে।

কোনো উত্তর দিলেন না সুধা। এই সব মহিলাদের আসল চেহারা যেন দেখতে পেলেন সামনের আয়নাটার মধ্যে। সরে এসে দুম্ করে দরজাটা আটকে দিলেন।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এখন ধোওয়া আকাশে তাজা চাঁদ। তেঁতুল গাছের ঝাঁকড়া পাতার ফাঁক দিয়ে ছোপ ছোপ জ্যোৎস্না পড়েছে উঠোনে। ভেজা মাটিতে সোঁদা গন্ধ। 'ই স্যাঙাতের সঙ্গে বসে বিড়ি টানছিল ভেলকো। ঘরে বাপ হেঁচ্‌কি তুলছে। সময় ঘনিয়ে এসেছে। পাড়াতুতো এক পিসী ঠোঁট ফাঁক করে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিচ্ছে—ভেলকো একটু আগেই দেখে এসেছে।

সন্ধ্যে প্রায় হবো হবো, সেই সময় অশোক একবার এসেছিল। দেখেশুনে গিয়েছিল। রিকসায় ওঠার মুখে ভেলকোর হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলেছিল—এটা রাখ এখন। মনে হচ্ছে রাত নটা নাগাদ এলেই হবে। দেখিস বাপু, তখন কোনো ক্যাণ্টার করিস্‌না যেন।

—ভেলকোর সে রকম কাদামাখা মন নয় অশোকদা। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিল। আবার বলেছিল—তবে, সেই গাড়িটা নিয়ে এসো।

—সে তোকে বলতে হবে না। রিকসা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিল অশোক।

আর ভেলকো তখনই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। একটা আধুলি তারকার দিকে বাড়িয়ে বলেছিল—আবে, দুটো পুরিয়া লিয়ে আয় তো ঠাকুরের কাছ থেকে।

তা কখন শেষ হয়ে গেছে পুরিয়া। কোত্থেকে মেঘ এসে জলও ঢেলে গেল খানিকটা। এদিকে বাপের হেঁচ্‌কি তোলা বন্ধ হলো না এখনও। কমেছে, তবে, ভেলকোর পুরিয়ার আমেজে মনে হল—আভি

তক্ খতম নহি হুয়া। (সরেস মেজাজের সঙ্গে হিন্দী বাতচিত দারুণ খাপ খেয়ে যায়। এসেও যায় আপনা আপনি।)

নিম গাছের কাটা গুঁড়িটায় বসেছিল ভেলকো। হাঁটুর ওপর পাজামা গুটিয়ে ফটিককে জিগ্যেস করলো টাইম কটা? ফটিক ঝিমাচ্ছিলো। বাঁ কব্জি দুবার ঝাড়া দিয়ে ঘড়িতে চোখ রাখলো। নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা। কানের কাছে তুলে শোনার চেষ্টা করলো। বললো, হবে আট সাড়ে আট।

শালা, ফেক্ দে না উস্‌কো। বিরক্তির সঙ্গে বললো ভেলকো।

তিনজনেই চুপচাপ বসে রইলো আবার। পরিষ্কার আকাশ। তেঁতুল গাছে সামান্য শব্দ তুলে বাতাস আসছিল। দুটো নেড়িকুকুর একটানা ঘেউ ঘেউ করে চলেছিল দূরে কোথাও। উঠোনের শেষদিকেই কাঁচা দেয়াল ঘরের মাথায় টালি। টিমটিম করে হ্যারিকেন জ্বলছে। ভেলকো বার বার তাকাচ্ছে ওদিকে। একটু আগেও চাপা গোঙানির আওয়াজ আসছিল। এখন সেটা থেমেছে। তবে হাপর টানার মতন কিছুক্ষণ পরে পরে হেঁচ্‌কি তোলাটা যে এখনও বন্ধ হয়নি সেটা বুঝতে পারছে। কেননা, বন্ধ হলেই নন্দপিসীর অন্ততঃ একবারের মতো গলা ছেড়ে মড়াকান্না তা জানান দেবে। সেই অপেক্ষাতেই বসে থাকা। তারপর অশোকদা আর মোড়ের মাথায় অশোকদার গাড়িটা এসে গেলেই —ব্যস, ফিনিস্।

ট্যাংরায় অশোকের কারখানায় কাজ করে তারকা। ফটিকও করতো, কিন্তু দু আড়াই মাস করে ছেড়ে দিয়েছে। আর পারে নি। ভেলকোর করার কথা ছিল কিন্তু প্রথম দিন কারখানায় ঢুকেই পচা আঁশটে গন্ধে ওর নাড়ি উঠে এসেছিল। বেশি দূর এগোয় নি, তার আগেই নাকেমুখে হাত চাপা দিয়ে তারকাকে খিস্তি করে জিগ্যেস করেছিল—কিসের কারখানা বে।

তারকার সব গন্ধ সয়ে গেছে ততোদিনে। ওই বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাতাসকেই দিব্যি টেনে নিতে পারছিল বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে। থ্যাবড়া

নাকেমুখে অনেকগুলো কাটাকুটো রেখা ফুটিয়ে পানের ছোপ ধরা মুড়কি দাঁত ছড়িয়ে হেসেছিল। ছোট করে বলেছিল—আয় না, ছাখাচ্ছি।

উৎকট গন্ধে বিকৃত মুখ, তার সঙ্গে সংশয় আর একটা গা গোলান অস্বস্তি নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ভেলকো হাঁটছিল তারকার পিছনে। চোখের দৃষ্টিতে নিজের থেকেই ফুটে উঠেছিল একরকম সন্দেহ। এ কোন্ জায়গা রে শালা! পা ফেলছিল সাবধানে। এমন বমি উঠে আসা জায়গায় মানুষ কাজ করে কিভাবে!

চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বড় জায়গা, মাথার উপর ঢেউ খেলান টিন। ছাদের টিন আর পাঁচিলের মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা। একট ই মাত্র পাকা ঘর, ঘেরা জায়গার মধ্যে। সামনে রাস্তা আছে। কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ি ছাড়া আর কিছু যায় না সে রাস্তা দিয়ে। ধাপার দিক থেকে লোকজনের যাতায়াতের একমাত্র উপায়ও ওই কর্পোরেশনের গাড়ি। ধাঙড় আর ড্রাইভারের সঙ্গে যাত্রীদের খোলাখুলি অলিখিত চুক্তি। তারকার সঙ্গে ভেলকো ওই জঞ্জাল ফেলা হলুদ গাড়িতেই গিয়েছিল।

পাঁচিলের একধারে দুখানা বিশাল উনুন। কাঠের আগুনের ওপর বসানো অতিকায় দুখানা ড্রামের মধ্যে টগবগ করে কি ফু ছিল। কাপড়কাচা সোডার মতন গন্ধ। আরও কয়েকটা লোক কাজ করছিল। উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ফুটন্ত ড্রামের মধ্যে নেড়েচেড়ে দিচ্ছিল।

তারকা একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে, ভেলকোকে ডেকেছিল—আয়, দেখে যা।

ভেলকো আর উঠে দেখতে পারেনি। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ওর পা আটকে গিয়েছিল। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো সাদা সাদা রঙের মতন জিনিসগুলো যে এক একখানা হাড়, ভেলকো তৎক্ষণে বুঝে নিয়েছিল।

—আমায় বাইরে দিয়ে আসবি চল। পাথরের মতন দাঁড়িয়ে ভেলকো তারকাকে ডেকেছিল।

—এতেই ভড়কে গেলে দোস্ত!—খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠেছিল তারকা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝেও নিয়েছিল ভেলকোকে বাইরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু দেখাতে পারবে না। নেমে এসেছিল টুল থেকে। পাশের লোকটা তখন ড্রামের মধ্যে ফুটন্ত সোডার ভেতর থেকে সিদ্ধ করা হাড় একটা ঝুড়িতে তুলে রাখছিল। গরম ধোঁয়া উঠছিল হাড়ের গা থেকে।

মুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল ভেলকো। আর তারকা নেমে এসে বলেছিল—ঘাবড়াচ্ছিস কেন গুরু? ওই তো ছাখ, ওই ঘরে বসে অশোকদাও কাজ করছে। সপ্তায় ছুদিন আর্টিস্টবাবুও রং তুলি নিয়ে—

আর বলতে পারে নি তারকা। হঠাৎই গায়ে হাত দিয়ে বুঝেছিল—ভেলকোর জামা ঘামে ভিজে উঠেছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল।

—সে কি রে, ঘেমে নেয়ে উঠেছিস যে, চল চল।—ভেলকোর হাত ধরেছিল তারকা। ওকে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলেছিল—ধুস্ শালা, আমারই ভুল হয়েছে শুধু মুখে তোকে আনা। একটু চাপিয়ে না এলে—

বাইরে এসে কারখানা ছেড়ে একটু তফাতেই রাস্তার পাশে বসেছিল ছুজন। নিজের ঠোঁটে বিড়ি জ্বালিয়ে ভেলকোকে দিয়েছিল তারকা। একটু সামলে নিয়ে ভেলকো জিজ্ঞেস করেছিল—এটা কি হাড়ের কারখানা নাকি বে? মানুষের হাড়?

—তো কি হয়েছে? বিরক্ত হয়েই জবাব দিয়েছিল তারকা। প্রশ্নটা সোজাসুজি এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল—তিন চারশ' টাকা দিয়ে ডাক্তারবাবুরা কেনে জানিস?

এতক্ষণ পরে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল ভেলকো। আর বাকী খানিকটা তারকা বুঝিয়েছিল।

ঘাটের মড়ার কি অভাব আছে শহরে! কর্পোরেশনের ধাঙড় আর ডোমরাও মাঝে মধ্যে জঞ্জালের তলায় লুকিয়ে-চুরিয়ে ঝেড়ে

আনে হু চারটে বডি। তাছাড়া এজেন্ট্ আছে দশ বারোটা। হাসপাতালের ডোমরাও খোঁজ খবর না করা মড়া সুযোগ পেলে হাপিস করে দেয়। মেডিকেল কলেজ সরকার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি দর দেয় না। বাইরে বেচতে পারলে একশ' টাকার ওপর দাম পাওয়া যায়। তারপর হাত পা মাথা পীস করে কেটে নিযে কষ্টিকে ফোটালেই হাড় মাংস আলাদা। হাড়ের ওপর পাউডার দিয়ে ঘষলেই চকচকে। লাল নীল দাগ কেটে রঙীন বাকসয় ভরে, বিলেতে পর্যন্ত মাল সাপ্লাই হচ্ছে। বেঁচে না হোক মরেও বিলেত যাচ্ছে, শালা, কম কথা! শুধু লাইসেন্স পেতেই অশোকদাকে আড়াই হাজার টাকা বাঁহাতে দিতে হয়েছে। সতেরোটা লোক এখন কাজ করে কারখানায়।

ভেলকো কোনো কথা বলে নি। চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। একটু পরে তারকাই নিজে থেকে বলেছিল—একটা লোক চলে যাচ্ছে, যদি কাজে লাগিস তো বল—অশোকদাকে বলবো।

—কোথায়, তোদের এই নরকের কারখানায়?—মুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল ভেলকো। আর মুহূর্তের মধ্যে যেন দপ করে জ্বলে উঠেছিল তারকা। উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হু চারটে কাঁচা শব্দের সঙ্গে বলেছিল—ঠিক আছে, তবে তোর স্বর্গে গিয়েই মারা যদি পারিস! আমাকে আর বাপের ঢ্যামনামি শোনাতে আসিস না।

রাগে গরগর করতে করতে উঠে চলে গিয়েছিল তারকা। যেতে যেতে আবার বলেছিল—ও সব স্বর্গ নরক শোনাস না। খেটে খাই বে, হাত পাতি না। সব পয়সাই এক মিষ্টি।

আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে কর্পোরেশনের ময়লা টানা গাড়িতে চার নম্বর পুল পর্যন্ত চলে এসেছিল ভেলকো। তারপর পার্কসার্কাস থেকে ট্রেন ধরে বারুইপুর। বাড়িতে বাপ তখন আগের দিন ভেলকোর লুকিয়ে রাখা পান্তাগুলো নুন দিয়ে গিলে বারান্দায় বসে ঝিমচ্ছিল। ওই ঝিমুনি আর ডিগডিগে চেহারায় পুঁটলির মতো ফুলে ওঠা পেট দেখে দূর থেকেই ভেলকো বুঝেছিল—তার গতরাতে লুকিয়ে রাখা

ভাতের সন্ধান বুড়ো পেয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি কিছু জিগ্যেস করতে গেলেই হাড়গিলে বুড়ো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে 'খানকির বাচ্চা' বলে ভেলকোকেই তড়পে উঠবে।

দাঁতের ওপর দাঁত পিষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভেলকো। আর কি আশ্চর্য, ঠিক তখন থেকেই আজীবন হাড় জ্বালানো ওই বজ্জাত বাপের জিরজিরে চেহারার ওপর থেকে, ভেলকোর মনে হচ্ছিল, চামড়াটা আস্তে আস্তে খসে যাচ্ছে। মাথার চুল আর চামড়া উঠে গিয়ে বেরিয়ে আসছে সাদা খুলিটা। কোঁচকানো বুকের চামড়া সরে গিয়ে পাঁজরা, কাঠি কাঠি হাত পায়ে দড়ির মতন পাকানো পেশীগুলোর ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে রডের মতো লম্বা লম্বা হাড়গুলো। কোনোমতে এই সবগুলো নিয়ে তারকার কারখানায় ফেলতে পারলে নগদ···

একটা বর্ষার রাত ভেসে উঠেছিল ভেলকোর চোখের সামনে। বারো বছর বয়স তখন। একটানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছিল রাস্তাঘাট, ওদের উঠোন বারান্দা। বাপের পাত্তা নেই ছদিন। কাঁচা দেয়ালের ফাটল দিয়ে হিলহিলিয়ে একটা কালো সাপ উঠে আসছিল। বাইরে গম্ভীর মেঘের গর্জনের সঙ্গে বাতাস উঠছিল গাছে শব্দ তুলে। টালির চালের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছিল। আর সন্ধ্যে থেকে বমি করতে করতে ওর মা-র ছোটখাট শরীরটা তখন ছেঁড়া আর ভিজে মাদুরের ওপর স্থির হ'য়ে গিয়েছিল। বাপ এসে ঢুকছিল কোনমতে দেয়াল হাতড়ে। উজবুকের মতো ভেলকো তখন চিৎকার করে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল বাপকে। পারে নি, তার আগেই কোঁকের ওপর লাথি খেয়ে উলটে পড়েছিল ভিজে মেঝের ওপর। তার বাপও টাল সামলাতে না পেরে চিৎপটাং হয়ে পড়েছিল মাটির দাওয়ায়।

বুড়োর সেই পান্তা ভাতের ঝিমান চেহারাটা দেখে আর একবার চোখ কড়কড় করে উঠেছিল ভেলকোর। আর চামড়ার তলায় সেই সাদা সাদা হাড়গুলোর কথা মনে করে তখনই ঠিক করে

ফেলেছিল এখন থেকে রোজ একটু করে ইঁদুর মারা বিষ মেশাতে হবে, বুড়ো যা মুখে দেবে তাতেই। তারপর অশোকদার গাড়িতে একবার তুলে দিতে পারলেই ...

কয়েকদিন পরে অবস্থা খারাপ দেখেই ভেলকো তারকার সঙ্গে কথা বলেছিল। যাতে জানাজানি না হয় সে কথাও বলেছিল তারকাকে। তারকা আশ্বস্ত করেছিল, সে সব কিছু ভাবতে হবে না তোকে। একটা কাগজে টিপছাপ দিবি, আর অশোকদার গাড়ি এসে তুলে নেবে। কেউ শুধালে বলবি, সৎকার সমিতির গাড়ি দাহ করতে নিয়ে গেছে। তারপর গলায় কাছা আর চাবি নিয়ে কদিন ঘুরবি, ব্যস ল্যাঠা চুকে যাবে।

মোড়ের মাথায় পিটুলি গাছে একটা তেরছা জোরাল আলো পড়েই নিভে গেল। সঙ্গে গাড়ির আওয়াজ। অশোকদার ভ্যান গাড়ি এসে গেছে। চাঁদের আলো যেন আরও বেড়েছে। তেঁতুল গাছের ছায়া এখন সরে গেছে ঘরের কাছে। গাড়ির আওয়াজে সচকিত হল তিনজনেই।

—সশালা খাবি খাচ্ছে এখনও! চিবিয়ে বলে উঠলো তারকা।

ফটিক হাই তুলে বললো—কেয়া গাড়ি আ গিয়া।

গাড়ি রেখে অশোক এসে পড়লো ওদের কাছে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বললো, কি রে সব বসে আছিস কেন, তুলে দে।—মাল টসকায় নি এখনও। তারকা বললো।

—কি বলছিস কি, চল্ তো দেখি। অশোকের পিছনে তিনজন এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

হ্যারিকেনের আলো কখন নিবে গেছে। ঘর অন্ধকার নিঃশব্দ। পকেট থেকে মোমবাতি বের করে ধরালো অশোক। বুড়ি নন্দপিসী ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ছোট বাটিটার গঙ্গাজলও কখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। চোপসানো গাল হাঁ করা মুখ আর পচা মাছের মতো স্থির চোখে ভেলকোর বাপের ডিগডিগে চেহারাটা কাঠের মতন পড়ে ছিল মাটিতে।

ঘরের মধ্যে পায়ের আওয়াজ, আলো আর সামনে মড়া দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো বুড়িটা। অশোক হাত ধরে তুলে দিল। বললে, যাও মা, বাড়ি যাও, অনেকক্ষণ আগেই ও ওপারে চলে গেছে। বলেই পাশে তাকালো অশোক। তাড়া দিয়ে বললো—নে, নে, তোল। তাড়াতাড়ি কর। আমি তুবার হরিবোল দিয়ে দিচ্ছি।

তারকা আর ফটিক তুজনে ধরাধরি করে তুলে নিল ভেলকোর বাপের বডিটা। সবাই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মোড় পর্যন্ত যেতে যেতে অশোক আরও কিছু টাকা ধরিয়ে দিল ভেলকোর হাতে। গাড়ির কাছাকাছি এসে বললো, তোকে আর যেতে হবে না সঙ্গে, পুকুরে-টুকুরে একটা ডুব দিয়ে নিস।

গাড়ির পেছনে দরজা খুলে বডিটা ঢুকিয়ে দিল। আর তখনই সেই নাড়ি উঠে আসা পচা গন্ধটা ভেলকোর নাকে এসে লাগলো। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল। গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেল। এঞ্জিন গর্জন করে চলে গেল সামনের দিকে।

ভেলকো ঠিক বুঝতে পারলো না ওর কিরকম লাগছে। শুধু চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল একটা নরকের ছবি। বিশাল ড্রামের মধ্যে কষ্টিক সোডায় সেদ্ধ হচ্ছে বড় বড় হাড়, তার গা থেকে খসে খসে পড়ছে ছাই রঙের মাংস। একটা বমি ঠেলে আসা তুর্গন্ধ। তাড়াতাড়ি ওর নাক-মুখে উঠে এলো নিজের হাত তুখানা। আর একটা গন্ধ পেলো সেখানে, কতকগুলো করকরে নোটের গন্ধ—যেন একইরকম অনেকটা। তবু সরিয়ে নিতে পারলো না হাতটা।

এমনভাবেই রাতটা কেটে যাবে কিনা, যাওয়া উচিত কিনা ভাবছি। অবশ্য শুধু এই রাতটাই কি। নাকি এ জীবনের বাকি রাতগুলোকেই অনিবার্য অনিদ্রা অধিকার করে নেবে—এমনই এক প্রস্তুতির সূচনা। কি জানি! অস্থির বিদ্যুৎ চমকের ঝলকানি টের পাচ্ছি মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে, মাথায়। সুষুম্নাকাণ্ডের স্রোতে শিরশিরিয়ে উঠছে রানার কথা, প্রশ্নগুলো। সাতচল্লিশ বছর বয়সে ঠিক এভাবে ছেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ভাবতেও পারি নি।

রুমা, ঘরে কি করছো একা একা? তুমি কি ঘুমুতে পেরেছো? মনে হয় না। তবে আমাকে যে তুমি ঘরে ডাকতে পারছো না তা বুঝতে পারছি। আমরা কেউই আর কখনও কাউকে ডাকতে পারবো কি না সন্দেহ। রাত বেড়েছে, বড্ড চুপচাপ সবকিছু। তোমার মধ্যেও নিশ্চয়ই সেই বিকেলবেলা হঠাৎ বাদাম খেতে খেতে রানার ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসা, তারপর ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বাবা-মার সামনে নিজেকে ভাষায় প্রকাশ করা—এসবই তোলপাড় করে চলেছে। আমারও ঠিক তাই। আজই টের পেলাম রানা যে শুধু বড় হয়েছে তাই নয়, ওর চিন্তা-ভাবনার গতি-প্রকৃতি কতো আলাদা। ওই বয়সে আমাদের ভাবনা-চিন্তার কোনো মিল নেই! কিন্তু এমনভাবে আমাকেও ভাবিয়ে তুললো!

আমি কি উঠে চলে আসবো ঘরে? দরজা খোলা রেখেছো?

আসলে আমি খেয়াল করি নি কিছুই। সেই যখন তুমি উঠে চলে গেলে—জানি না তারপর কতোটা সময় কেটেছে।

তখন কটা বেজেছিল, এখনই বা রাত কটা। উঠে গিয়ে তুমি শুয়ে

পড়লে কি না, দরজা বন্ধ করেছো কি না, কিছুই জানি না। শুধু তুমি চলে গিয়েছিলে। ছোট্ট এই মাত্র একটি ঘটনা। সেই মুহূর্তে আমরা কেউ কোনো কথা বলি নি। তোমার উঠে চলে যাওয়ার জন্য অল্প যেটুকু নড়াচড়া শাড়ির শব্দ, তাছাড়া আর কিছু এখনও পর্যন্ত ঘটে নি। মনে হচ্ছে সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে তখন থেকে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে, কি বলো তো, রুমা। আচ্ছা, সত্যি কি আমরা কখনও কিছু শুরু করেছি! এখনই এসব মনে আসছে আজ।

কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। বড় অস্থির এই অন্ধকার এবং নৈঃশব্দ্য। কি করা যায় বলো তো এখন।

তুমি ঘরের মধ্যে। মাঝখানে দরজাটা ভেজানো। ধরে নিচ্ছি ছিটকিনি আটকানো নেই। আমি বাইরে হেলানো বেতের মোড়ায় বসে আছি। একটু আগেও ঝিরঝিরে বাতাস ছিল প্রথম শীতের আমেজ মাখানো। এখন পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে সমস্ত হাওয়া থমকে দাঁড়িয়েছে গাছের স্থির পাতায়। আর কখনও তারা আন্দোলিত হবে না। এখন কি শুক্লপক্ষ নাকি কৃষ্ণপক্ষ? কি জানি। অবশ্য জানি না কতো দিন পরে আজ এখনই পক্ষ তিথি এসবের কথা ভাবছি। আসলে তো সত্যিই আমার খেয়াল পড়ে না শেষ কবে আমি রাতের আকাশ কিংবা চাঁদ দেখেছি। দরকারও হয় নি এমন কিছু। আর ফুরসৎ পাওয়ার তো কথাই ওঠে না। নিয়মের দড়ি আর সময়ের খুঁটিতে বাঁধা নিটোল গোলাকার জীবনযাপন করেছি। রুমা, কাছাকাছি কথা-বলা দূরত্বে তুমি নেই। থাকলে এখনই এই "গোলাকার জীবন" শব্দটা আমার মনে এলো—তা তোমায় জানাতে পারতাম। কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে কিনা অথবা এ কথায় তোমার কি প্রতিক্রিয়া হতো—আমি তা সঠিক বুঝতাম না, যেহেতু আমরা কখনই পরস্পরকে সঠিক বুঝি নি, বোঝা যায়ও না বোধহয়। তবু নিজের সম্বন্ধে আমার এক ধারণার কথা তোমায় জানাতে পারতাম।

আচ্ছা রুমা, ঠিক কতোদিন কতো বছর একটানা এরকম চব্বিশ-ঘণ্টার বৃত্তে সীমাবদ্ধ জীবনযাপন করছি, তোমার ধারণা আছে?

আমার তো কিছুই মনে পড়ে না। দরকারও হয় নি। অথচ আজ সেই বিকেলে রানা আসার পর থেকে, অনেকক্ষণ বসে থাকা এবং শেষ-পর্যন্ত নিঃশব্দে তোমার আমার উঠে যাওয়ার পর থেকেই—সময় আর হিসেব-নিকেশের এক তাড়না চাগাড় দিয়ে উঠছে আমার মধ্যে। মনে হচ্ছে আমার এই সাতচল্লিশ বছর বয়সের ভাসা ভাসা অস্বচ্ছ ব্যাপারটা —যাকে এতোদিন জীবন বলে এসেছি, জীবন বলেই জানতাম, যার আকার একটু আগেই গোল বলেছি—তার কোথায় টোল পড়েছে। এলোমেলো হয়ে ছিঁড়ে গেছে কিছু অর্বাচীন বোধ বিশ্বাসের সুতো।

কেন বলো তো এতোদিন ব্যাপারটা এভাবে মনে করতে হয় নি? এখন তো মনে হচ্ছে, আরও অনেক আগেই এরকম একটা ভাবনা-চিন্তা বোধ মাথায় আসা উচিত ছিল। জীবন বলতে এতোদিন যা যাপন করে এসেছি, তা কি? জীবন? নাকি একটা জীবিত অবস্থা! সাতচল্লিশ বছর বয়সের এক পুংলিঙ্গের মানুষ শুধুমাত্র তার জৈবিক বেঁচে থাকার বিভিন্ন উপকরণের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সময় পার করেছে। লেখাপড়া করে ডিগ্রী পেয়েছে, দেখতে শুনতে ভাল আলাপী এক যুবতীর সঙ্গে প্রেম-বিবাহ-সন্তান উৎপাদন করেছে (অনেকটা বীজগণিতের এ প্লাস বি হোল কিউব-এর মতো); দু বেলা চেম্বার রোজগারে বাড়ি করেছে, এল আই সি ব্যাংকে টাকা গাড়ি, রাজনীতির স্পষ্ট গন্ধ বিপজ্জনক মাটি ছেড়ে, অথচ তাদের সমর্থিত সামাজিক সাংস্কৃতিক সভা সংগঠনে যোগ দিয়েছে, সময়মতো ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেশার, ইসিজি করিয়েছে তার জীবিত অবস্থাকে সুরক্ষিত আর দীর্ঘ করতে।

কিন্তু রুমা, বলো তো এতোদিনে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? একটি নিস্তরঙ্গ পাড় বাঁধানো কালো জল সরোবর। সিঁড়ি ভাঙ্গা পরিষ্কার দুটি ঘাট, চারিধারে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলা গাছগাছালি। এই তো একটি সুস্বাস্থ্য সুদর্শন সুখী সাতচল্লিশ বছর পার করে দেওয়া মানুষের জীবনের বেনামী জীবিত অবস্থা। আজই প্রথম, বিকেলে সেই শান্ত সরোবরের জলে কয়েকটা ঢিল পড়লো। ছোট ছোট ঢেউয়ে টালমাটাল। নিরাপত্তার সুতোয় ঘেরা দেওয়া নিটোল গোল জীবিত অবস্থা কিভাবে ছিঁড়ে

গেল। তখন থেকেই, রুমা, বেশ অনুভব করছি সেই সীমাবদ্ধ বৃত্তের আকৃতি পালটাচ্ছে তোবড়ানো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এখনও তো জানি না এর গতি-প্রকৃতি ভাব প্রতিক্রিয়া কোন্‌মুখী। আবার এর সঙ্গেই ভাবছি, ভাবতে হচ্ছে, তুমি অর্থাৎ আমার স্ত্রী, তোমার ভূমিকা কিরকম। তুমিও নিশ্চয়ই ভাববে, আমার এই সাতচল্লিশ বছরের জীবিত অবস্থায় বিগত তেইশ বছর ধরে আজকে সেই উঠে চলে আসার মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার এক ধরনের ভূমিকা ছিল। কিন্তু তারপর থেকে যতোখানি সময় পার হয়েছে ইতিমধ্যে অবস্থার কিছু পরিবর্তন, তোমার ভূমিকার কিছু অদলবদল, না হলেও হওয়ার প্রস্তুতি নিশ্চয় চলেছে।

আজই এই রাতের অন্ধকারে বারান্দায় বসে বসে মনে হচ্ছে, রানার বাইশ বছরের ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা সবই ভীষণ অন্যরকম। মনে পড়ে যাচ্ছে রানা যেন অনেকদিন থেকেই একটু আলাদাভাবে বেড়ে উঠছিল। অথচ আজ বিকেলেও ওর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল খুব স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ওর এই বাইশ বছর বয়স—এলে মেলো এবড়ো-খেবড়ো আবার স্পষ্ট তাজা। বরাবরই তো ও একটু বেশি কৌতূহলী ভাবপ্রবণ আবার কখনও জেদী। কতো ঠাট্টা করেছি মাঝে মাঝে ওর ছেলেমানুষি নিয়ে, আবার অস্বস্তিতেও পড়েছি কতোবার। তোমার কি মনে আছে রুমা, নিশ্চয়ই থাকবে,—ওর যখন বছর বারো বয়স, তখন একদিন।···ঘরে তুমি জামাকাপড় পরছিলে। রানা কোত্থেকে কি দরকারে হঠাৎ ঘরে ঢুকে তোমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তোমার তখন পেটিকোট আর ব্রা পরা ছিল। তুমি ব্লাউজ গায়ে দিতে যাচ্ছিলে। রানা একটা বোকা বোকা হাসিমুখ নিয়ে তোমার বুকের দিকে তাকিয়ে ফস্‌ করে জিজ্ঞেস করে বসলো—মা, তোমার সাইজ কতো গো?

তুমি ওর প্রশ্নটায় হঠাৎ ঘুরে একটা চাপা হাসি আর বিব্রত মুখে বললে—যা বেরো বলছি, পাগল কোথাকার!

আমি তখন হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকছিলাম। দেখলাম রানা একটা লাটাই হাতে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি দুহাতে

মুঠো করা শাড়ি মুখে চেপে হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে ঘটনাটা বললে। আমি বিশেষ কিছু ভাবি নি। বোধহয় শুধু মনে হয়েছিল —ছেলেটা এখনও সত্যিই ছেলেমানুষ!

বাবা হিসেবে সেদিন আমার আরও কিছু তলিয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল কি না জানি। কিন্তু রুমা, আজ যে এখন আমার গাছের গুঁড়ি ধরে নাড়ানোর অনুভূতি হচ্ছে। সাতচল্লিশ বছরের আমাকে এই নিঝুম রাতে সমালোচনা করে বলতে ইচ্ছে করছে···কি বলবো —এতোদিন ধরে একধরনের খোকা খোকা আদরামি আর ন্যাকামি মাখিয়ে নিজেকে, নিজের সংসারের এক চলচলে তেল চুকচুকে চেহারা আর চরিত্র কল্পনা করে এসেছি। নীল রঙের সুখী স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হয়েছে এই প্রায় হাফ-সেঞ্চুরির আপাত-নিরাপদ জীবদ্দশা। দেখতে শুনতে ডালপালাওয়ালা বড় গাছ। শিকড় ছড়িয়েছে ভুসভুসে মাটিতে, রোগা পলকা। ওপরের ভাব গম্ভীর চাকচিক্য, বাইফোকাল চশমার নিচে প্রতিষ্ঠিত চোখের দেখানো ব্যক্তিত্বের তলায় তলায়, রুমা, বলো তো আসলে কিভাবে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত নীরস পাণ্ডুর হয়ে গেছি! হয়ে গেছি, তাই কি? নাকি আর কোনোরকম হওয়ার ছিল না। আমাদের সাতচল্লিশ বছর এইভাবেই কাটে আদিখ্যেতা খোকামি আর নিরাপদ সুষ্ঠু ভবিষ্যত ভাবনার দৌরাত্ম্যে। যে ভাবনায় আমাদের ছেলেরা ডাক্তার এঞ্জিনীয়র চারটারড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ ছাড়া আর কিছু হয় না। বিলেত আমেরিকাবাসী ছেলে ছাড়া মেয়েদের বিয়ে হয় না। এসবের বাইরে আর কিছু ভাববার তো দরকার হয় নি এই আজ বিকেল পর্যন্তও। কিন্তু রুমা, সব যে গোলমাল হয়ে গেল তারপরেই। বাইশ বছরের রানাদের সঙ্গে সাতচল্লিশ বছরের আমাদের (সেই আমাদের মধ্যে অবশ্য, রুমা, তুমি এবং তোমার ধ্যান-ধারণার কাছাকাছিরা বাদ) জীবনযাপন ভাবনা-চিন্তার এতো ফারাক! কি বিরাট দূরত্বে আমি বাস করে আসছি, আমারই জন্ম দেওয়া খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা ছেলের থেকে!

তোমার হয়তো মনে পড়বে, রানা বোধহয় আরও দু একবার ওর

নিঃশব্দ চোখের তাকানোয় ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ...লেকে লিলিপুলের কাছে তুমি ড্রাইভিং শিখছিলে। আমি তোমার পাশে। পিছনে রানা আর বাপ্পা। টালিগঞ্জ বস্তীর একটা ন্যাংটো ছেলে ঝুপ করে জলে পড়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে আস্তে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে রানা লেকের জলে ছুট্টে গিয়েই ডাইভ। বাচ্চাটাকে জল থেকে তুলে রানা নিজে ঝাঁজির মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমরা ছুটে যাওয়ার আগেই বস্তীর দু একজন লোক একটা গাছের শুকনো লম্বা ডাল বাড়িয়ে ধরেছিল। জল খেয়ে কাদা মেখে শেষে কোনমতে রানা বাচ্চাটা শুদ্ধ উঠে এসেছিল। আমরা কাঁপতে কাঁপতে দেখেছি। জলের নিচে কাঁচে ওর পায়ের তলায় কেটে রক্ত বেরুচ্ছিল। লোক জমে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। আমরা রানাকে নিয়ে ভিড় কাটিয়ে চলে আসতে চাইছিলাম। রানা আমাকে খুব অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে বললে—বাবা, ছেলেটাকে দেখবে না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কি না?

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। কোনো কথা না বলে, সেই বাচ্চাটা আর দুজন বস্তীর লোকশুদ্ধ গাড়িতে তুলে সোজা শিশুমঙ্গল হাসপাতালের দিকে গাড়ি চালিয়েছিলাম। মনে আছে রুমা? সেই ঘটনার পরে দিন তিনেক রানা আমার সঙ্গে খুব সহজ ব্যবহার করে নি। শুধু তাই না, ওর পা কাটার জন্য আমি যে ওষুধপত্র দিয়েছিলাম, ও সেগুলোও নিয়ম করে খায় নি। তোমাকে সেকথা বলেছিলাম একদিন রাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা রুমা, তুমিও জানো না, তোমাকেও বলি নি—এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে রানা বোধহয় অজ্ঞান্তেই একটা পুরনো খামে আমার নামের পাশে লিখেছিল 'হিপোক্রাট'। পরে আবার সেটা কেটে দিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে সেটা আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল। কাটাকুটির মধ্যে থেকে, আমার মনে হয়, আমি বোধহয় ঠিক শব্দটাই আবিষ্কার করেছিলাম। ওর ব্যবহারে অবশ্য কোনো অস্বাভাবিকতা না দেখে আস্তে আস্তে আমি ভুলে গিয়েছিলাম

ব্যাপারটা। আমরা বোধহয় এভাবেই অনেক কিছু একচোখ বুজে ভুলে যেতে চাই।

এতোদিন পরে কেন জানি না আজ মনে পড়ল সেই পুরোনো ব্যাপারটা। আজকের বিকেলটা রুমা, এখনও মনে হচ্ছে প্রহেলিকা! কি করলাম এতোদিনে!

তুমি আজ হুপুরবেলা একটু তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরেছিলে। পরের দিকে ক্লাস ছিল না। চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ রোজকার মতো তুমি যখন চায়ের ট্রে নিয়ে এলে—তখনও তোমার ঘুম চোখ ফোলা ফোলা। মুখে চোখে সগু জলের ঝাপটা দেওয়া। আমার তখন টুকটাক হু একটা কাজ চিঠিপত্র লেখা শেষ। বেশ লাগছিল তোমার কপালের ওপর লেপ্টে থাকা কয়েকটা ভিজে চুল আর আটপৌরে শাড়ি পরা চেহারাটা দেখে। মনে মনে তোমার তেতাল্লিশ পেরিয়ে চুয়াল্লিশে পরা বয়সটা হিসেব করে, চায়ের প্রথম চুমুকের পর একটা রসিকতা করার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। ভাবছিলাম বলবো, হ্যাঁ গো, কি ব্যাপার বলো তো? তুমি কি আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র, যোগাসন-টোগাসন চালিয়ে যাচ্ছ নাকি? বয়স কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে দেখে!

মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম তোমারও কি উত্তর হতে পারে। এমনিতে তুমি একটু কম কথা বলো যদিও, তাও তোমার চাপা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রসাস্বাদনের ব্যাপারটা তো আমি জানি। ভেবেছিলাম, তুমি আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বিছানায় বসবে। তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে খুব সরু একফালি হাসির সঙ্গে বলবে—কেন, কি হল আবার আজ হঠাৎ!

এরপর আমাদের খুব সাংসারিক ঘর-গেরস্থালির কয়েকটা কথাবার্তা হতো। রানা-বান্নার সম্বন্ধে কিছু। হয়তো পারুলদি কিংবা অশোক কিংবা নিরঞ্জনবাবু…কেউ একজন আসতেন। এটা ওটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ সময় যেতো। আমি আড়ামোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে চেম্বারে যাওয়ার জন্য উঠতাম, তুমি কলেজের হু' একটা খাতাপত্র

দেখতে, হয়তো আমাকে জিগ্যেস করতে, ফিরতে দেরি হবে কি না। একটা টেলিফোন আসতে পারতো—

কিছুই হল না। না, প্রাত্যহিক প্রায় অভ্যস্ত একই ধরনের কোনো ঘটনা আজ বিকেলে ঘটে নি। সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে—রুমা, আমি এখনও ঠিক ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। বড্ডো আচমকা। কতো সময় কেটে গেল তারপরে। উঠেছিলাম কি আর? ও হ্যাঁ, শুধু একবার ঘোরের মধ্যে টালমাটাল গোড়া ধরে ঝাঁকানো আমি হাতড়ে এই বারান্দায় এসে বসেছিলাম। তাও হয়ে গেল কি জানি কতোক্ষণ। তুমি এখন কি করছো, কি করবে কি জানি। আমায় ডাকছো না, ডাকতে পারছো না। আমিও তোমায় ডেকে কিছু বলার কথা ভাবতে পারছি না। মাঝে মাঝে ফাঁকা চোখের সামনে হঠাৎ ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি হচ্ছে, মাথায় ঘূর্ণী। আমার এতো বছরের জীবিত অবস্থায় ঠিক এরকম পরিস্থিতি কখনও আসতে পারে, কারুর আসে কি না—ভাবিও নি। অথচ আজ বিকেলের পরে যতো সময় যাচ্ছে, মনে হচ্ছে—ঠিকই তো, ঠিকই তো। ভাবনার উনুনে শুধু ছাই, আঁচ নেই এতোটুকু। জীবন ব্যাপারটা আসলে কি, রুমা! একবার মনে হচ্ছে সহজ সরল, আবার ভাবছি বড়ো দুর্ভেদ্য জটিল। কোনো ভাবনাটাকেই যে নিজের বোধ আর বিশ্বাস থেকে বলবো ঠিক, তা পারছি কই? রানা সব কিছু এমন ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে কি প্রমাণও করে দিয়ে গেল কিছু? তোমায় কি বলবো—চোখে আমার ভুল চশমা পরে ফেলার অনুভূতি হচ্ছে। কি হল, কি করলাম সাতচল্লিশ বছর ধরে মস্তিষ্ক ফুসফুস হৃৎপিণ্ড ব্যবহার করে।

তুমি ট্রে নিয়ে ঢোকার একটু পরেই রানা এলো। আমার কাপে তুমি চা ঢালছিলে। আমি তোমায় বলতে যাচ্ছিলাম···। খুব সহজ-ভাবে রানা ঘরে এলো—একটা ছোট ঠোঙা থেকে বাদাম নিয়ে চিবোতে চিবোতে। সাধারণতঃ বিকেলবেলা ওরকম সময় ছেলেরা আসে না। তবু অবাক হই নি। ভাবলাম ও আলমারি থেকে কোনো বই কিংবা ক্যাসেট রেকর্ডারটা নিতে এসেছে। হয়তো পয়সা-কড়িও চাইতে পারে।

তুমি আমি দুজনেই একবার তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সামান্য একটু প্রশ্ন জেগেছিল যখন দেখলাম ও একটি চেয়ার টেনে নিয়ে আমাদের কাছেই বসছে। তুমি মুহূর্তের মধ্যে শুধু একবার সোজা ওর দিকে তাকিয়ে উল বুনতে বুনতে বলেছিলে—কি রে।

রানা বসেছিল। বাদাম খেয়ে চলেছিল এবং সেই সঙ্গে কথা বলতেও শুরু করেছিল। আর তারপর থেকেই দেখা গেল আমরা ক্রমশঃ কিরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি ওর কথা আর তার ধরন-ধারণে। আমি কিন্তু ওর প্রথম কথা—বাবা, তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, শোনার পরেও নিজের প্রতিক্রিয়াটুকু যথাসম্ভব চেপে রেখেছিলাম। চায়ের কাপে সশব্দ চুমুক এবং সিগ্রেটের টান বন্ধ না করে চালিয়ে গেছি।

কিন্তু কতোটুকু সময়, কটা সেকেণ্ড! রুমা, মনে করতে পারো তখন তুমি কি ভাবছিলে! কি ছিল সেই মুহূর্তে মনে! কৌতূহল, আশংকা, বিরক্তি? আমার তো রানার আর দু' চারটে কথা শোনার পরেই বুকের মধ্যে দুরমুশ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ছাইদানির খাঁজ থেকে লম্বা সিগ্রেটটা আর তোলা হয় নি।

আমি চা-এর কাপ হাতে নিয়েই ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—কি কথা রে, বল না!—স্নেহ আর স্মার্টনেস একসঙ্গে বেশ ভাল মিশিয়ে কথাটা বলেছিলাম। তুমি কি ভাবছিলে জানি না, তবে গভীর দৃষ্টি দিয়ে রানাকে নিরীক্ষণ করছিলে। একবার বললে—চা খাবি?

ও তোমার কথার উত্তর দেওয়ার ফুরসৎ পায় নি। ঠোঙার সব বাদামগুলো আগেই মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর ঠোঙাটা দুমড়ে মুচড়ে ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিতে দিতেই আচমকা—, বাবা, তোমার তো পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হতে চললো, তাই না?

বড্ড সোজাসুজি রানা প্রশ্নটা করেছিল। বাবাকে ছেলে এরকম প্রশ্ন করতে পারে সেটা আমার মাথায় আসে নি। ফলে যা হওয়ার তাই হল। আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম রানার গলায় তাচ্ছিল্য ছিল না। এবং মুহূর্তের মধ্যে আমি যেরকম ভেবে ফেলে-

ছিলাম—না, রানার কথা কিংবা মুখের ভাবে অসম্মান করার প্রাক্-মুহূর্ত্ত অভিপ্রায়ও মনে হয় না ছিল বলে। বরং খুব বেশি স্বাভাবিক স্পষ্টতা ছিল। অথচ কেন জানি না, কি এক অজানা কারণে আমার বুকের মধ্যে একটা নিরেট রবারের বল ড্রপ খেতে শুরু করলো। মুখ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছিলাম। রানাকে কিছু একটা উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—তোমার ভ্রু বাঁকা, বিরক্তির ঈষৎ দু একটা রেখা সবে তোমার কপালে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে।

মুখে হাসি টেনে রাখার চেষ্টা করতে করতেই আমি বললাম—হ্যাঁ, তা ধর পুরো পঞ্চাশ না হলেও কাছাকাছি তো এসে পড়লাম।

এ্যাশট্রে থেকে এবারও সিগ্রেটটা টেনে নিতে পারলাম। একটু স্মার্ট হওয়া উচিত। তাই সিগ্রেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে হাতের রেখায় চোখ রেখে বললাম—তা হঠাৎ আজ তোর আমার বয়স জানার কি দরকার হল রে ?

—না বাবা, ঠিক আজই যে হঠাৎ দরকার হল তা নয়···। একটু টান রেখে রানা থামলো। ও আমার চোখের দিকে তাকিয়েই, হাসি-লজ্জা একসঙ্গে মুখে রেখে কথা বলছিল। মনে হল পরের কথাগুলো বলার জন্য মনে মনে একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। তাই মুখটা নিচু করেছে। আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম ও কি বলতে চায়। সেই সঙ্গে ওর মুখ নিচু করে রাখার সুযোগে আর একবার দেখেও নিচ্ছিলাম ভাল করে।

একটা ডোরা কাটা পাজামা পরেছিল রানা। সঙ্গে হাফহাতা বুশশার্ট। চুলগুলো ওর চিরকালই এলোমেলো থাকে। দেখেছি, মাঝে মাঝে ওর চেহারা খুব রুক্ষ দেখালে, তুমি ওকে সস্নেহে শাসন করো। বুড়ো ছেলের মাথায় তেল দিতে গিয়ে কান ম'লে দাও। ও হাসে। সপ্তায় কিংবা দশদিনে বড়জোর একবার দাড়ি কামায়। আজ বিকেলে কথা বলার সময় ওর গালে থুতনিতে কয়েকদিনের বেড়ে ওঠা নরম দাড়ি ছিল। ওর চোখ ভাসা, ভ্রু দুটো তোমার মতো বেশ টানা টানা। সামান্য ঐটুকু সময়ের মধ্যে আমি ভেবে যাচ্ছিলাম অনেক কিছু।

ওর উচ্ছ্বাস এমনিতে কম। কখনও লাজুক লাজুক। চোখে-মুখে পাকা ছাপ পড়ে নি একেবারে। দেখলে মনে হয় না ও এম, এ পড়ে। তোমার মনে আছে রুমা, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পর রানা পড়া-শুনোতেও কিরকম অদ্ভুতভাবে বাঁক নিয়েছিল। সায়ান্সে ভাল রেজাল্ট করার পর আমরা চেয়েছিলাম ও ডাক্তারি পড়ুক। কিন্তু ইকনমিক্স ছাড়া ছেলে আর কিছু পড়বে না বলে কিরকম গোঁ ধরেছিল। আর সেবারই ফট্ করে রানা একটা কথা বলেছিল, তোমার মনে আছে? হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে সেইকথা—"আচ্ছা, বাবা, তোমাদের পছন্দ করা লাইনে আমায় ঢোকাতে চাইছো কেন?" কোনো দ্বিধা না করে রানা খাওয়ার টেবিলে কথাটা বলেছিল। তারপরেই হেসে ফেলেছিল। বলেছিল—তোমাদের যেন এখনও সব চোখে সবুজ চশমা পরা। ডাক্তার এঞ্জিনীয়র ছাড়া ছেলেরা বুঝি মানুষ হয় না!– "নে, নে, খুব হয়েছে, ওঠ্ এবার ওঠ্"—তুমি বলে উঠেছিলে কথাটা এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। রানা হাসতে হাসতে উঠে পড়েছিল টেবিল থেকে। বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল—বাবা, মা, আমি কিন্তু আজকেই ফর্ম আনতে যাচ্ছি···।

—দেখো বাবা,—আমি যেন পরিবেশ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। রানার ডাকে মুখ তুলে দেখলাম ও কথা বলতে শুরু করেছে —আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমাদের একটা কথা জিগ্যেস করবো। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ জরুরী বলে মনে হয়েছে। তোমার প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, জীবনের এতোটা সময় কাটিয়ে তুমি আসলে করেছোটা কি? কি রাখছো। ভালো খাওয়া-দাওয়া, ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা-পয়সা, ফিয়াট গাড়ি কেনা হয়েছে, আমাদের বাড়িটাও···

—তুই কি বলতে চাইছিস, কি জানতে চাইছিস, ভণিতা না করে স্পষ্ট সেটাই বল না।—রুমা, তুমি। দেখলাম—বিরক্তি আর রাগের স্পষ্ট এক টুকরো অসহিষ্ণু ঝাঁজ চিড়বিড়িয়ে উঠলো তোমার গলায়। বাঁকা ভ্রু উঁচু, দৃষ্টি খর—সোজাসুজি রানার মুখের ওপর পাতা।

আমার নিজের কিন্তু রুমা তখন ঠিক রাগ হচ্ছিল বলবো না। কি যে হচ্ছিল তাও ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না ; তবে প্রথমে একটু অবাক আর তারপরেই নিজের সচেতন (!) মানসিকতা অনুযায়ী অনিবার্য-ভাবে মাথায় এলো—রানা কি তলে তলে নকশাল হয়েছে ! কথাবার্তায় সেইরকম গন্ধ মনে হল। তক্ষুনি কিছু বললাম না। বলা যায়ও না বোধহয়। এই বয়সে পৌঁছে হঠাৎ ছেলের মুখ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন—ব্যাপারটার আকস্মিকতায়, সত্যি বলছি, একটু হতভম্বগোছের হয়ে গিয়েছিলাম। পরিস্থিতিটা ভীষণ অভাবনীয়। নিজের ঘরে বৌ-ছেলের সামনেই বসে আছি তো, নাকি মঞ্চে ! নাটক নাটক পরিবেশ।

রানার কিন্তু কোনো অস্বস্তি বা সংশয় ছিল না। সরলভাবেই তোমার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর যেন হঠাৎ বাধা পাওয়ার আহত গলায় আস্তে আস্তে বললো—মা, তুমি রাগ করছো আমি এসব জিগ্যেস করছি বলে!—ও মাথা নামিয়ে আবার বললো—তাহ'লে থাক, আমি তোমাদের আর কিছু বলবো না!

আমি একটু সপ্রতিভ আর উদার হওয়ার চেষ্টা করলাম। বুকের মধ্যে দ্রুততালে ঢুবঢুব, তবু মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম—এখন আমার কিছু বলা উচিত। নয়তো অনেক কিছু অস্পষ্ট থেকে যাবে। রানার এসব কথা জিগ্যেস করার উদ্দেশ্যটা জানা হবে না। বাবা হিসেবেও নিজেকে পুরোনপন্থী মনে হবে। বলা যায় না, ছেলেকে ঠিকমতো ফেস্ করতে পারি নি, পরে এটা ভেবে এ-ধরনের হীনমন্যতা আসতে পাবে।

আমি গম্ভীর হ'য়ে বেশ কিছু দামী দামী কথা বলবো বলে তৈরি হ'য়ে নিলাম। অল্প কিছুক্ষণের নীরবতা এবং আমার ভারি গলা বক্তব্যকে জোরালো করবে—এটুকু ভেবে নিয়েই যথাসম্ভব নিজেকে ধীরস্থির রেখে বললাম—দেখ রানা, তুই যে জিগ্যেস করলি এতোটা বয়স পার করে এতোদিনে সত্যি কি করেছি, এর একটা যুৎসই উত্তর তোকে আমি দিতে পারতাম। (রুমা, সত্যি কি পারতাম? সাতচল্লিশ বছর পার করা নিজের জীবন সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ বিশ্বাস, আমি কি রানাকে

জানাতে পারতাম ?) কিন্তু তুই তো আমার ছেলে, তাছাড়া তোর এই বয়সে জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই বা কতোটুকু ? তবু, তুই যখন জিগ্যেসই করলি, তখন শুধু এইটুকু তোকে এখন বলতে পারি (রুমা, আমার কি গলা কেঁপেছিল তখন ? আমতা আমতা করেছি ?)—একজন মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যা যা করা উচিত—তাইই করেছি এবং তার জন্য সারাটা জীবন ঠিক পথে সোজা থাকার চেষ্টা করেছি। মেরুদণ্ড কখনও বাঁকা হয় নি। (এ ছাড়া রুমা, আর কি বলা যেতো ঐ সময় ?)

কথাগুলো বলে ফেললাম। একটু থেমে থেমে অথচ একটানা, গলায় আবেগ দায়িত্ববোধ ব্যক্তিত্ব সব একসঙ্গে মিশিয়ে। আর বেশ একটু আত্মতৃপ্তি অনুভব করলাম। মনে হল রানার প্রশ্ন, এই পরিস্থিতি আর আমার কথা কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ খুব সুন্দর মানিয়ে গেছে।

তোমার আর রানার মুখের দিকে তাকালাম। তোমার বিরক্ত বিব্রত অস্বস্তি মেশানো মুখ নিচু। আর কি কি তোমার মধ্যে ঘটে যাচ্ছিল জানি না। সবচেয়ে আশ্চর্য রানার মুখ—হাসি হাসি সহজ, বিশ্বাস অবিশ্বাস ধরা যাচ্ছে না। অথচ ওর সোজা ভাসা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে কি একটা ছিল—রুমা, টের পেলাম আমার বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডাকছে। থামছে না। গম্ভীর মেঘের গর্জন চাপা। আমার সবে বলে শেষ করা কথাগুলোর টেপ বাজছিল কানের মধ্যে। অস্বস্তিকর স্তব্ধ কয়েকটা সেকেণ্ড রানা হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ বললো—আচ্ছা বাবা, তোমরা, মানে তুমি আর মা তো বেশ একটা এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু করেছিলে, তাই না ? আমি যতোটুকু জানি, তোমাদের বিয়ের ছ' মাসের মধ্যেই তো আমি জন্মেছিলাম, তখন তুমি—

—রানা ! একটা লিকলিকে নরম সরু চাবুক, আমার মনে হল রুমা, সাঁই করে হিসহিসিয়ে উঠলো তোমার গলায়। আর আমার··· কি ভাবে বলবো, মনে হল হঠাৎ কোত্থেকে মুখের মধ্যে কতোকটা নোনা

জল কুলকুল করে ছাপিয়ে উঠলো, স্পাইনাল কর্ডের নিচে থেকে ওপরে একটা বরফগলা জলের ঠাণ্ডা স্রোত উঠতে লাগলো। হাতের তালুতে ঘাম। বিহ্বল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই বেরুল না মুখ দিয়ে। তোমার গলাই কানে এসেছিল।

—তুই কি প্রকৃতিস্থ! তোর কি খেয়াল আছে কাদের সামনে বসে কথা বলছিস?

রানা খুব সংযত। শুধু সামান্য একটু আহত গলায় বলেছিল—মা, আমি কি ভুল কিংবা অন্যায় কিছু বলেছি? আমার তো বাইশ বছর হ'য়ে গেছে, তোমাদের ভালবাসি আর তোমাদের সঙ্গে ফ্র্যাংক্‌লি কথা বলতে পারবো না? তুমি এতো রাগ করছো, উত্তেজিত হচ্ছো এখনই, আমার কিন্তু আরও অনেক কথা বলার আছে।

রুমা, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তোমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিলে, আবার ধপ্ করে বসে পড়লে। আমার রগের দু'পাশে ঘামের অস্তিত্ব অনুভব করলাম। সামনে একটা অপরিচিত সরল মুখ—যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে আমারই রক্তকণিকা। স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে ওঠা গলায় কি ভাবে বেরিয়ে গেল—তুই আর কি বলবি?

—না, এভাবে কথা বলা যায় না।—রানা সামনে দু'পা ছড়িয়ে এগিয়ে বসার ভঙ্গিতে বলেছিল।—আমার কনফিউশন, গোলমালের কথা সোজাসুজি যদি তোমাদের কাছেও বলতে না পারি···আমার তো মনে হয় বাবা-মা-ছেলে এই সম্পর্কের আগেও, আপাততঃ আমরা এখানে তিনজন এ্যাডাল্ট মানুষ কথা বলছি, সেই সম্পর্কটাই বেশি—

—তুই বলে ফেল, যা তোর বলার ইচ্ছে।

ঠিক কোনোদিকেই না তাকিয়ে আমি একটা বিপন্ন অস্তিত্বের মতো কথাগুলো বললাম। যেন ডুবতে ডুবতে খড়কুটো হাতে ধরেছি। রানা একটু উৎসাহিত হল। সামান্য একটু চুপ করে থেকেই বলতে আরম্ভ করলো।

—বাবা, আমাদের জন্মের পর থেকেই তোমার লাইফ খুব

স্ট্যাটিক হ'য়ে যায় নি? আমি তো আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তোমার একটা রুটিন বাঁধা ঘটনাহীন জীবন দেখে আসছি। তোমার অনেক ব্ল্যাকমানি আছে আমি জানি—কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, আমাদের দেশের সিস্টেমই ব্ল্যাকমানি ইন্‌ডাইরেক্টলি জমাতে সাহায্য করে। কিন্তু তুমি শুধু টাকা রোজগার করো খাও ঘুমোও—ব্যস্‌, এই-ই হ'য়ে গেল তোমার কাজ তোমার জীবন—আর কিছু না? এ তো রোলিং স্টোন, দিনগত পাপক্ষয়। বরং তার চেয়ে আমি তো বলি—

একটানা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত রানা, একটু কেশে নিয়েছিল। দেখেছিলাম ওর চোখে মুখে ভয়ঙ্কর আত্মবিশ্বাস। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। আবার বললো—হ্যাঁ আমার তো মনে হয়, তোমার চেয়ে মা-র জীবনের ভাইট্যালিটি অনেক বেশি।...মা তো এক্ষুনি আবার রাগ করবে, মনে মনে আমার স্পর্ধাকে অভিশাপ দেবে। রাগ কোরো না মা, আমি কোনো অভিযোগ করছি না।

রানা আবার উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালো।—তুমি তো দিনের পর দিন চেম্বার বাড়ি আর টাকা এই নিয়ে রয়েছো, কোথায় কতো ইন্টারেস্ট হল, কোন্‌টা কোত্থেকে তুলে কোথায় রাখবে এইসব। মা তো তবু এই বয়সেও সন্দীপ লাহিড়ীর সঙ্গে দিব্যি...আচ্ছা থাক..., ক্লাবে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে, বিকলাঙ্গদের স্কুলে বহু টাকার বাইরের জিনিসপত্র আনিয়ে দিয়েছে। একটা ক্লাস অবশ্য হিংসের জ্বালায় পিছনে মা-র অনেক কুৎসা করে, তা করুক, করবেই। এদের চরিত্র কেন্নোরে মতন, সামনে মাকে দেখলে গলে যায়। কিন্তু এসবে কিছু এসে যায় না। মা বাড়িতে রান্না করে না? আমাদেরও তো ভালবাসে, মা একটা জায়গায় থেমে যায় নি।

রানা একটু চুপ করেছিল, মনে আছে রুমা? একটু পরে আবার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তুমি আর আমি এরপর পাকাপাকিভাবে চুপ করে গিয়েছিলাম। কথা বলা কিংবা উঠে যাওয়া কোনোটারই বোধহয় আর শক্তি ছিল না। তোমার আমার নিঃশব্দ

প্রতিটি মুহূর্তে নিশ্চয়ই প্রমাণ করছিল—রানা একটাও মিথ্যে কথা বলছে না। শুধু নিজেকে খুলে ধরার এক প্রবণতা ওকে পেয়ে বসেছে আজ। ও কিছু বলছিল, কিন্তু আমার অন্তত: আর কানে কিছু ঢুকছিল না। শুধু সশঙ্কিত হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করে যাচ্ছিল—রানা খুব সহজভাবে আবার কি একটা ধ্বস নামানোর মতো কথা বলবে, সেই অপেক্ষায়।

অনেকক্ষণ পরে যখন ওর গলা আবার শুনলাম, ও বলছে—তোমরা এরকম চুপচাপ বসে থাকলে আমি একলা আর কি কথা বলবো? আসলে আমি খুব খোলাখুলি কথা বলছি বলে তোমরা সহ্য করতে পারছো না। রাগ করছো আমার ওপর। কিন্তু তোমরা তর্ক করো না আমার সঙ্গে, শুধরে দাও অনধিকার চর্চা করলে। আমার আসলে বাবা, তোমার ওই রুটিন বাঁধা টিপিক্যাল ছাঁপোষা জীবন একদম ভাল লাগে না, সেইজন্যই এসব কথা বলে ফেললাম। তুমি কিছু করো। আমি জানি তোমার নিজেরও হয়তো এরকম জীবন ভাল লাগে না, অথচ তবু তুমি একটা আর্টিফিশিয়াল শো-অফ্ মেনটেইন করে যাও। কিন্তু কেন? তোমার লাইফটা রেসট্রিক্টেড হ'য়ে যাচ্ছে না?···ন্-না, আমার ভাল লাগছে না, আমি বোধহয়···আমি বোধহয় একটু বেশি বলে ফেললাম···বাবা, মা, আমি কি তোমাদের···

বড় ক্লান্ত লাগছে। বোধহয় ভোর হ'তে আর দেরি নেই। রুমা, কি করছো ঘরে এখন! রানার কথাগুলো যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না মাথা থেকে। ওর শেষের দিকের কথাগুলো মনে আছে? ও যেন তখন একটা চাপা অস্থিরতার মধ্যেও স্থিতু হ'তে চাইছিল।

ও যখন বুঝে ফেলেছিল আমরা আর কোনো কথা বলবো না, আমার শূন্য দৃষ্টি দেওয়ালে আর তোমার দু' হাতের মধ্যে রগ চেপে ধরা মাথা নিচু, তখন বলেছিল—কি জানি, তোমাদের সঙ্গে এতো কথা বলে ফেলা ঠিক হল কি না। তারপর স্বগতোক্তির মতন বলেছিল—কিন্তু না বলতে পারলেও যে নিজের মধ্যে অশান্তি চলছিল···তোমরা এখন আবার, কি জানি এরপর নিজেরা হয়তো শরীর খারাপ করবে।

একটু পরেই রানা আবার বললো—বাবা ওঠো। আমার ভাল লাগছে না। যদি ভুলভাল কিছু বলে থাকি, তোমরা আমাকে পরে বোলো। আজকে এ্যাটমসফিয়ারটা বড্ডো টেইন্স হয়ে গেছে। তুমি চেম্বারে যাবে না?

আমি তক্ষুনি উত্তর দিতে পারি নি। দিশেহারা ভাবের মধ্যে একটা বড় শ্বাস চেপে নিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম—দেখি। কিন্তু তাও পারলাম না। বুঝলাম আশঙ্কার একদলা শ্লেষ্মা আমার গলায় জড়িয়ে গেছে। বাইরে হেমন্তের ছোট হ'তে শুরু করা বেলা পড়ে আসছিল। আবছা অন্ধকার নেমে এসেছিল ঘরের মধ্যে। কাছাকাছি আমি বসে থাকলেও তোমার ঝাপসা চেহারা সেই মুহূর্তে খুব অচেনা মনে হচ্ছিল। সামান্য দূরত্বের মধ্যেই আমরা দুজন যেন দুটি গ্রহের আলাদা মানুষ। কাছাকাছি পাশাপাশি থাকাথাকির মধ্যেই কবে থেকে আমরা দুটি নিরাপদ অথচ বিপরীত অবস্থানের দিকে যাত্রা করেছি। চোখে এক ন্যাকামি চশমার আবরণ ছিল, রানা একটু আগেই খুলে নিয়েছে সেটা চোখ থেকে। এক ঝাঁক সাদা পায়রার মতো আলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দু'চোখের ওপর। সহ্য করতে পারছিলাম না।

রানা উঠে গিয়েছিল ঘরে আলো জ্বালানোর জন্য। ওর স্যুইচে হাত দিতে যাওয়া দেখেই আমি মুখে চাপা দেওয়ার মতো কিছু একটা অজুহাত খুঁজে পেতে চাইছিলাম। দরকার হল না। লোডশেডিং চলছিল, আলো জ্বলে নি। ও বিরক্ত হয়ে তোমার কাছে গিয়েছিল আবার। গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিল—কি গো মা, ওঠো। একটু থেমে আবার বলেছিল—কয়েকটা টাকা দাও আমায়, একটু বেরুবো।

তুমি কোনো কথা বললে না। চাবির গোছা খুলে টেবিলের ওপর রেখেছিলে। রানা চাবি নিয়ে আলমারি থেকে টাকা বের করেছিল। ট্রে-র পাশে চাবি রেখে বলেছিল—আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে একটু দেরি হলে চিন্তা কোরো না। মুডটা খারাপ হয়ে গেল···সিনেমায় যেতে পারি···।

রানা বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। দুটি পাথরের মূর্তি হ'য়ে আমরা বসেছিলাম।

রুমা, এই সাড়াশব্দহীন নিথর স্তব্ধতা কাটিয়ে আমরা কি কয়েকটা কথা বলতে পারি না! আমি জানি, তুমি ঘুমোওনি, তুমিও জানো, আমি জেগে আছি। আমি দু'একবার উঠবো উঠবো করছি, ভেবেছি তোমায় ডাকবো, কিন্তু তারপর আর কিছু পাচ্ছি না। কি বলবো, কিভাবে শুরু করবো। তোমার কি ধরনের উত্তর হ'তে পারে। অথচ বড় দীর্ঘ একটা রাত, তবু শেষ হতে চললো। পূব আকাশ ফিকে হয়েছে, খড়ি ওঠা ভাব। এইমাত্র দু' একটা কাক বেরিয়ে পড়লো কা কা করে। ঠিক এসময়েই একটা হাওয়া আসে, ভোরের হাওয়া। একবার উঠে তোমায় ডেকে আনবো বাইরে, অনেকদিন পরে একটা নতুন সকাল দেখার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু অবশ ভাবটা কাটাতে পারছি না কেন!

সংশয় কিংবা আমার ভূমিকা

জায়গাটা অদ্ভুত শান্ত আর নির্জন। হাইওয়ের ধাব দিয়ে হেঁটে আসার সময় বহুদূর থেকে পাথর ভাঙ্গার শব্দ পাচ্ছিলাম। কোনো স্টোনচিপ্‌স ব্যবসায়ীর ইজারা নেওয়া পাহাড়ে কাজ হচ্ছিল। বাসটা তেমাথার মোড়ে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বেঁকে গেছে উড়িষ্যার দিকে। এখানে আমাদের আর দেখার কেউ নেই।

শুক্র শনি ছুটি। রবিবার যোগ করে তিনদিন। এসপ্ল্যানেড থেকে ভোর সাড়ে ছটার বাস। সাড়ে চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই মাটির চেহারা পাথুরে, রং লালচে। ন্যাশনাল হাইওয়েব দুপাশে আধা জঙ্গল। মাথা উঁচু করা শাল গাছ। ইউক্যালিপটাসের গন্ধ। কি সব জানা অজানা পাখির কিচিরমিচির। রাস্তা কখনও ঢালু কখনও উচু।

বাহারাগোড়া। বলা যায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জংশন।

তিনকামরা বাংলো। রাস্তার ধারেই। হাইওয়ে থেকে আড়াআড়ি নুড়ি ছড়ান লাল পথ সোজা উঠে এসেছে বাংলোর বারান্দার সামনে। গাড়ি দাঁড়ায়। পুরো চত্বব ঘিরে কাঁটাতারেব বেড়া। পাশাপশি ঝাউ কিংবা ইউক্যাল্গিপটাস দাঁড়িয়ে থাকে বোগা লম্বা পিরামিডের মতো। ছাঁটা ঘাসের সবুজ তোয়ালে মাঝখানে, আপাতত হলদেটে ভাব এসেছে পৌষের রোদে পুড়ে। ঘরের সামনে খোলা চওড়া বারান্দায় গোটা পাঁচেক বেতের চেয়ার, নিচু টেবিল একটা। দুধারে মরসুমী ফুলের গাছ, লম্বা ডাঁটার মাথায় ফুটফুটে রঙীন ফুল, কীটপতঙ্গ নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে দোলে। সারবন্দী ছোট গাছের মধ্যে .-একটা টগর কিংবা হাসনুহানা।

বাংলোর পিছন দিকে কুয়োতলা। নীলকান্ত পরিবার নিয়ে থাকে।

চিঠি পেয়ে বাসস্টপ থেকে খুচরো মালপত্র বয়ে এনেছে। রাজু গেজেটেড অফিসার বলে খাতিরযত্ন করে। ঘরদোর গুছিয়ে রেখেছে ঝকঝকে তকতকে করে। পুরু গদির ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। টেবিলের ওপর কাঁচের গ্লাসে জল দিয়ে ফুল রেখেছে একগোছা। একটা বড় জলের জাগ।

মামু আমাদের চেয়ে বছর দশেকের বড়। বাংলোয় ঢুকে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়েছিল। হাত পা এলিয়ে বলেছিল—তোমরা চলে যাও ভাগনা। আমি আর ফিরব না এখান থেকে, নীলকান্তর সঙ্গে থেকে যাব।

রাজু জামাকাপড় ছাড়ে নি। কটকটে রোদ্দুরে ছাঁটা ঘাস জমির ওপর সটান শুয়ে বললো—এখন মনে হচ্ছে বটে মামু। দুদিন পরেই বোর হয়ে কলকাতা পালানোর জন্য ছটফট করবেন। দু' তিন দিনের বেশী ভাল লাগে না এসব জায়গা।

আমি ঘরে ঢুকে জামাকাপড় পালটে নিয়েছিলাম আগেই। হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে বেরিয়ে এলাম। হাতে সদ্য ধরান সিগারেট। বারান্দা থেকে নেমে নুড়ির ওপর পা দিতেই তলায় চিড়বিড় করে উঠল। আলতো পা ফেলে ঘাসের ওপর রাজুর পাশে বসে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম—নীলকান্ত, একটু তেল দিয়ে যা।

রাজুর পরনে কালো জাপানী স্ট্রেচ্ প্যান্ট, কমলা রঙের পুলওভার। নির্দ্বিধায় আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে টানতে টানতে বললো—মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এসব জায়গায় এলে। কি চুপচাপ! একটু থেমেই আবার স্বগতোক্তির মতো বলে—আহ্, কি আরাম। মাইরি, এটুকুই শান্তি। ধুলো নেই, নোংরা নেই, চেঁচামেচি হই-হই গোলমাল নেই, স্টেটবাসের ধোঁয়া নেই। তা নয় শালা, রোজ সকাল থেকে কোথায় আউটডোরের রুগী তাড়ান, অপারেশন, প্লাস্টার···তিনটে বেড খালি, বত্রিশজন ওয়েটিং···নিজেকেই অসুস্থ মনে হয়।

ও চেঁচিয়ে গেয়ে উঠল—শালপিয়ালের বনে বনে কেমন যেন কাঁপন লাগে আ—হা···

আমি ওর কোমরের কাছে ধুলো পায়ে ঠেলা মারলাম।—যা না, জামাপ্যান্ট ছেড়ে আয়। তেল মাখব আজ।

মামু এসে পড়েছিল। গায়ের রঙের সঙ্গে ছোট্ট কালো প্যান্ট মিশে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মামু একটা কপ্‌নি এঁটেছে। খালি গা, হাড়গুলো অধিকাংশ স্পষ্ট। প্রায় ছ' ফুট উচ্চতার মামুর পা দুটোকে লোহার রড ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছিল না। আগে আর কখনও খালি গায়ে মামুকে দেখিনি।

হাতে তেলের বাটি নিয়ে আপাতগম্ভীর মুখে মামু আমাদের সামনে রাখল। ডন বৈঠক শুরু করে দিল। মুখ টিপে চুপচাপ দেখছিলাম। মামুর কাণ্ডকারখানার সঙ্গে আমাদের বহুদিনের পরিচয়। আমার এক নিজের মামার মারফত আলাপ। প্রায় বছর বারো আগে যখন আমরা সবে কলেজে ঢুকেছি, সেই থেকে মামু আমাদের বন্ধু।

হাসি চেপে জিগ্যেস করলাম—তেলের বাটি আপনি নিয়ে এলেন কেন?

—কি করব ভাগনা। মামু বডি বিল্ডিং থামাল। ঘাসের ওপর বসে বললো—নীলকান্ত আমাকে তোমাদের চাকর-বাকর ভেবেছে। তেলের বাটটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, বাবুদের দিয়ে এসো ত।

মামুর কথা বলার ভঙ্গি এবং মুখে এমন একটা নিরাশ গোবেচারি ভাব ছিল যে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। মামু বললো—ওর দোষ নেই। দোষ আমার। একেই ছিঁচকে চোরের মতো চেহারা তার ওপর পচা বেগুনের মতো মুখ।

রাজু উঠতে যাচ্ছিল। মামুর হাবভাব দেখে আর কথা শুনে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। আমি দম আটকে কাশছিলাম। এর মধ্যেই পালোয়ানী কায়দায় বুকে তেল ডলতে ডলতে মামু বললো—হাসছ ভাগনা। কথাটা কিন্তু আমাকে হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়।

হাসি থামাতে পারছিলাম না। চোখের সামনে পচা বেগুনের উপমা ভাসছিল। এই জন্যেই মামুকে এবার ধরে আনা। বললো—আমি নিজে দাড়ি কামাতে পারি না। বেদানার মতো তোবড়ান গাল

যে। মুখের ভেতর থেকে জিভ দিয়ে ঠেলা মেরে যখনই রেজার চালাতে যাই তখনই কেটে যায়। তা দুঃখের কথা আর কি বলব ভাগনা—

ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামু। হাতে পায়ে তেল ঘষে। রোদ্দুর মাথার ওপর। হাইওয়ের ওপর দিয়ে ভারি ট্রাক চলে যায় এক আধটা, বহু দূরে তার মিলিয়ে যাওয়া গর্জন আমাদের কানে বিনবিন বাজে। আমরা ছাড়া বাংলোয় আপাতত আর কোনো অতিথি নেই। নীলকান্ত, সম্ভবত আমাদের রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। দুটো শালিক পাখি অনেকক্ষণ থেকেই খানিকটা তফাতে বসে ক্যাটর ক্যাটর করে কি সব বলাবলি করছিল। রাজু গায়ের পুলওভার খুলে সেটাই আবার ঘাসে পেতে শুয়ে পড়েছিল। মামুকে তাড়া দিলাম—কই বলুন।

—পরশুদিন একটা সেলুনে গেছি দাড়ি কামাতে।—একটা ঢোক গিলে নিজের হাসি চেপে মামু বললো—ভেতরে ঢুকতে যাব, এমন সময় একজন আমাকে দেখেই সামনে থেকে বলল—"হয়ে গ্যাছে।" একটু হকচকিয়ে গেলাম। ভাবলাম কয়েক সেকেণ্ড। আমাকেই বলছে ত? ঠিক তখনই আবার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ক্ষুর হাতে এক ভদ্রলোক বললেন—"দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বললাম ত হয়ে গ্যাছে।" আমি আরও অবাক। কেসটা ধরতেই পারছি না। এলাম সেলুনে, দাড়ি কামাব। বলে, হ'য়ে গ্যাছে। চলেও আসতে পারছি না, খারাপ দেখায়। এমন সময় ভেতরের সেই ভদ্রলোক পর্দা ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে আবার আমায় জিগ্যেস করলেন—"আপনার কি চাই?" আমি আমার আলকাতরার বুরুশের মতো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললাম—"দাড়ি কামাব।"

—"ও, ভেতরে আসুন।"

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে তখনও। শেষে যখন দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে বেরিয়ে আসছি, তখন জানতে পারলাম—ঐ সেলুনের জন্য একটি নাপিত কর্মচারী খোঁজা হচ্ছিল। আমাকে তারই একজন ক্যাণ্ডিডেট মনে করেছিল।

মামু মুখ ঘুরিয়ে ল্যাংপ্যাং করে উঠে যেতে যেতে বললো—এখন বলো। তোমাদের নীলকান্তর কোনো দোষ নেই।

আমি আর রাজু হাসতে হাসতে ওলোট-পালোট খাচ্ছিলাম। যদিও জানতাম ওগুলো সবই মামুর বানানো, তবু শুধুমাত্র নিজের চেহারা নিয়েই এরকম প্রত্যক্ষ রসের গল্প হয়তো মামুই বলতে পারে।

পাশাপাশি তিনখানা ঘরের শেষেরটা আমাদের। দুটো সিঙ্গল খাট জোড়া লাগিয়ে নিয়েছিলাম তিনজনের জন্য। দুপুরটা অস্বাভাবিক রকম নিঝুম, স্তব্ধতা ঢুকে থাকে কানের মধ্যে। জিওলজিক্যাল সার্ভের দু একটা জিপ যাতায়াত করছিল। আমাদের ঘরের পিছনে নিমগাছের ডালে একটা কাক বসে ডিমের খোলা ভাঙছিল। তার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা হাঁটতে হাঁটতে সুবর্ণরেখার ওপর জামশোলা ব্রিজে বেড়াতে যাওয়ার কথা। বাংলো থেকে মাইল দেড়েক। রাজু খাটের কোণে হেলান দিয়ে বসা, আমি আধশোয়া। দরজাটা বন্ধ। মামু পাড়াগাঁয়ের হরিকীর্তনের খোলুঞ্চি হাতে বোল তুলতে তুলতে কিভাবে মিষ্টি চোখে বালবিধবার দিকে তাকায়, সেই নাচ এবং অভিনয় দেখাচ্ছিল।

বাইরে শব্দ। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।— অ্যাক্সিলারেটরের চাপে দুবার গোঁ-গোঁ আওয়াজের পরেই আবার চুপচাপ। দরজা খোলা হল, লোক নামছে। মামুর নাচ বন্ধ হয়েছিল। দুটো লম্বা পা যেলে বন্ধ দরজায় কান পাতল। চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। তারপর নিঃশব্দে হাসি মুখে ফিরে এলো বিছানার কাছে।

—কি বুঝলেন মামু! রাজু চাপা গলায় জিগ্যেস করে।

মামু সে কথার উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হেসে ঘাড় দোলালো। বিছানায় শুতে শুতে হঠাৎই আবার উঠে বসে বললো—যাই বলো ভাগনা, আশেপাশে দু-একটি মহিলা-টহিলা না থাকলে, এসব জায়গায় বেড়াতে আসার কোন মানেই হয় না। একদম ড্রাই হয়ে যায়। একটু শাড়ির খসখস, চুড়ির টুংটাং কিংবা মিষ্টি সরু গলায় সঙ্গে একটু কোমর ঘুরিয়ে চলে যাওয়া…

কথার সঙ্গে নিজের শুকনো কোমরটাকে ঘুরিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে মামু বললো—আর কি আছে ভাগনা জীবনে!

মামুর পোজ দেখে আমরা হেসে ফেলি।—মহিলা এসেছে আপনাকে কে বলল ?

—ইনটুইশন ভাগনা, ইনটুইশন। দরজা খুলে ছাখো।

—যাহ্, সেটা বড় হ্যাংলামি মনে হবে।

—তবে ধৈর্য ধরো, সব বুঝতে পারবে।

মামু টানটান শুয়ে নিশ্চল পাখার দিকে তাকিয়ে রইলো। পায়ের পাতা নাড়াল খুটখুট করে।

—মামু, একটু দেখুন না মুখ বাড়িয়ে কারা এলো। রাজু উসকে দেয়।

—যারা এসেছে, আমাকে দেখে তারা আর শান্তিতে থাকতে পারবে না। বলা যায় না, এ বাংলো ছেড়ে চলেও যেতে পারে। মামু পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

রাজু মুখের লালিত্য বাড়াবার জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের ভাঁজে মুখ রাখল। আমার কান বাইরে। কৌতূহলের খিদেকে সঙ্কোচের বেড়ায় আটকে বসে রইলাম বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটাও যে একটু বেগড়াল না, তা না। এখন থেকে কথাবার্তায় সচেতন হতে হবে। দিব্যি ছিলাম তিনজনে। হইচই গান গল্পকুচো গালাগালমন্দ সবই চলছিল। রাজু আমার কলেজ জীবনের প্রথম থেকেই বন্ধু। পাশ করেছি একসঙ্গে। এখন ছিটকে গেছি দুজনে দু জায়গায়। আমার থেকেই রাজুর সঙ্গে মামুর আলাপ। মামু একটা প্রাইভেট এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে স্কিল্ড মেকানিকের কাজ করে। সেখানেও মামু নিজস্ব অনিবার্য জনপ্রিয়তায় সকলের গুরু। বিয়ে করার কথা বললে মামু বলে—দেখ ভাগনা, যিনি আমাকে বিয়ে করবেন, তিনি চাইবেন আমার স্বামীর একটি ছোট্ট গাড়ি থাকবে, ফুটফুটে বাচ্চা হবে একটি, লোকজনের সঙ্গে একটু ঘাড় দুলিয়ে আলাপ করিয়ে দেব···এইসব। শ্বশুরমশাই দেখবেন, আমার সামাজিক

প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, মালকড়ি কিরকম আমদানী হয়। আর শাশুড়িঠাকরুন চাইবেন—আমার জামাইটির বেশ গোপালভোগ আমের মতো মুখখানা হবে, ছুটিছাটায় আসার সময় একটি কেজি তিনেক রুই কি কাতলা নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামবে···তা এখন বলো, এর কোনোটাই কি আমার পক্ষে সম্ভব! বেশ আছি ভাগনা। অবশ্য বলা যায় না কিছুই। বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে একটা প্রতিপদের বান আসে, সেটা না পেরুলে—

বাইরে মালপত্র নামান চলছে। নীলকান্তর গলা পাচ্ছি। পাশের ঘরের দরজা খোলা হল। বারান্দা থেকে কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া হল ঘরের ভিতরে। কি হতে পারে। আওয়াজে ভারি মনে হয়। সাধারণত বিছানা নিয়ে এসব বাংলোয় কেউ আসে না। কজন এসেছে! জনা দু-তিনের বেশী মনে হয় না। মহিলা-টহিলা আদৌ আছে কি-না কে জানে! যে পরিমাণ মালপত্র টানা হ্যাঁচড়া হচ্ছে, হয়তো দেখব ছাপরা জেলার গুটিকয়েক অধিবাসী ছাড়া—

—এই বাবুরাম, ফ্লাস্কটা নামান হয়নি। ইধার সে দে দেনা।

ঝিরঝিরে মোলায়েম হাওয়া বয়ে গেল যেন এক ঝলক। নাহ্, মামুর ক্ষমতা আছে। শুধু যে মহিলা কণ্ঠ তাই নয়। ভাষাটি বাংলা, গলাটিও মিষ্টি। (সত্যি, নাকি সেটা পরিবেশের শুষ্কতার গুণ?) নিশ্চয়ই বয়েস এমন কিছু বেশী হবে না। এতক্ষণে ওরা জেনে গেছে পাশের ঘরে আরও কয়েকজন বাসিন্দা আছে। একবার বেরিয়ে দেখলে কেমন হয়। যাক, দরকার নেই। রাজু আর মামু যথেষ্ট পেছনে লাগার সুযোগ পাবে।

রাজু ঘুমিয়ে পড়েছে। মামু উঠে বসল। আমি একটু গড়িয়ে নিতে যাচ্ছিলাম। বললাম,—কি মামু, আপনি ঘুমোননি এখনও?

—আমি ত না হয় ঘুমুইনি। তুমি যে ভাগনা শুতেই পারোনি এখনও।—মামু হাঃ হাঃ করে হাসল। গায়ের চাদরটা জড়িয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, খবরাখবর পেতে আর দেরী হবে না।

শীতের বেলা ছোট। মিষ্টি রোদের তাপ এর মধ্যেই অভিমানী শিশুর মতন গাছপালার আড়ালে সরে যেতে আরম্ভ করেছে। একটু পরেই কনকনে অথচ ফুরফুরে হাওয়া বইবে, এলোমেলো অজস্র পাখি উড়বে। লম্বা গাছের ছায়ারা আরও লম্বা হয়ে হেলে পড়েছে বাংলোর দেয়ালে। নীলকান্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঝাঁঝরি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ফুল-গাছে জল দিতে। রাজু এবার প্রথম থেকেই মহুয়া খাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। উপায়ও নেই তাছাড়া। মামুর অ্যালকোহল অ্যালার্জি। খেলেই গা চুলকোয় সারারাত। কি ভাল রোগ! রাতে আমাদের আটপাত্তি খেলার প্রোগ্রাম আছে। দশ পয়সা কার্ড। আমি জানি, মজা করার জন্য মামু সঙ্গে ছুটো অচল সিকি এনেছে। বাইরে মহিলা কণ্ঠের হাসি শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম। সঙ্গে মামুর গলা।

—আসলে ঘরে আমার ছুজন ভাগনা আছে। তারাই ত এঞ্জিন, আমি হচ্ছি বগি। আপনারা বলুন, ওদের ডেকে আনছি।

—তাড়াতাড়ি আসুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাজু চিনি ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়েছিল। মামু ঘরে ঢুকে আগে নিঃশব্দে হু হু করে হাসল খানিকক্ষণ। চাপা গলায় বললো—চলো ভাগনা, মাটিতে দাগটাগ কেটে দিয়েছি, এবার তোমরা খেলবে। মিস্টার এবং মিসেস রায় বেশ জমাটি লোক বলে মনে হচ্ছে।

রাজু তেলহীন অবাধ্য চুলে চিরুনি বোলাল। আমি একটু ক্রীম মাখলাম। গায়ে শাল জড়িয়ে তিনজনেই বাংলোর বারান্দায় এলাম। নীলকান্ত লম্বা পাইপ টেনে ফুলগাছে জল দিচ্ছে। ফুলগুলো এখন অনেক তেজী আর ডাঁটো। গাছের ছায়া হাইওয়েতে পৌঁছেছে। বাংলোর বারান্দা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, ন্যাশনাল হাইওয়ে তেত্রিশ আর ছয় বাহারাগোড়া বাসস্টপের কাছে প্রথমে ইংরেজী 'ভি'-এর মতন মিশে তারপর 'ওয়াই'-এর মতন কলকাতার দিকে চলে গেছে।

মিসেস রায় ছুটো কাপ, একটা ফ্লাস্কের ঢাকনা আর ছুটো কাঁচের গ্লাসে এর মধ্যেই পাঁচজনের চা ছেঁকে ফেলেছেন। মামুই এখন হোতা। চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে আলাপ করিয়ে দিল ওঁদের সঙ্গে।

জামশোলা ব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণে হাঁটছিলাম। হাইওয়েতে সন্ধ্যা নামার প্রস্তুতি। ব্রিজের অনেক নিচে নিরাসক্ত সুবর্ণরেখার গিলে করা জল ঝিরঝির বয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ ফ্যাক্টরি থেকে বেরুন কঙ্কাল ট্রাক সারি সারি দাঁড়িয়েছিল রাস্তার পাশ ঘেঁসে। ব্রিজের পরেই গুমটি ঘর, আড়াআড়ি শালের খুঁটি দিয়ে পথ রুদ্ধ। চেকপোস্ট। বিহার-উড়িষ্যার সীমানা।

মিস্টার রায় আর মামু একটু এগিয়ে। হাইওয়ে ছেড়ে বাঁদিকের এবড়ো-খেবড়ো (নিচু) জমিতে নামলেন। পিছন ফিরে ডাকলেন—এই আপনারা সাবধানে নামুন। এগিয়ে একটা সুন্দর বাংলো আছে সুবর্ণরেখার ধারে।

মিসেস রায় গল্প করতে করতে একটু পিছনে আমাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন। বললেন—আর কতবার যাবে ঐ বাংলোতে? অন্যদিকে চল।

—আহা, এসোই না। ওঁদের সঙ্গে ত এই প্রথমবারই যাচ্ছি।

পা টিপে টিপে নেমে গেলাম। পাঁচজনের দলটা এখন কাছাকাছি। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর খানিকক্ষণ সময় কেটে গেছে। বাংলোয় বসে না থেকে একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে কুচো ভাবনা চিন্তা টুকরো কাগজের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। মিসেস রায়কে জিজ্ঞেস করলাম—আপনারা আগেও এদিকে এসেছেন বুঝি?

—বাব্বা, একবার? মিসেস রায় রঙীন ঠোঁট আর ভ্রু কাঁপিয়ে বললেন—কম করেও আগে পাঁচবার। নীলকান্তকে জিজ্ঞেস করবেন, ওখানেই তো উঠেছি প্রত্যেকবার।

রাজু বললো—আমিও ধরুন এই নিয়ে তিনবার এলাম। ওই হাতীবাড়ি বাংলোতেও ঘুরে গেছি।

এক্সেলেন্ট জায়গা! আমার ত মনে হয় আমি বাহারাগোড়ার প্রেমেই পড়ে গেছি। আর মিস্টার রায়ের যা প্রোফেশন, এর চেয়ে বিউটিফুল স্পট আর কোথায়!

—সেই ত হয়েছে আমার মুশকিল। মিসেস রায় বললেন—ঘরবাড়ি রইল পড়ে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কতদিন এরকম ভাল লাগে বলুন। একটু থেমে মিসেস আবার বললেন—তবু ত এবার আপনাদের সঙ্গী পেয়ে গেলাম। কয়েকবার এত বোর হয়েছি ভাবা যায় না। আপনাদেরই দেখছি ওঁর খুব ভাল লেগে গেছে। নয়ত বিশেষ কারুর সঙ্গে ওঁর ভাব-সাব হয় না। আর মামু ত··· মিসেস রায় শব্দ করে হেসে উঠলেন—রিয়্যালি আ ট্যালেণ্ট্। এক্সেলেণ্ট্!

আমি যোগ করলাম—মামু না থাকলে, এবার আমরাও আসতাম না।

মাটিটা এদিকে একদম লাল। ছড়ানো-ছিটানো পাথরের টুকরো। জঙ্গল ঘন নয়। পাশাপাশি অসংখ্য শালগাছ পুঁতে কৃত্রিম জঙ্গল বানানো। গাছের গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দিগ্‌ভ্রম হয়ে যায়। বোঝা যায় না ঠিক কোনদিকে চলেছি। বললাম—মিস্টার রায়, আমরা ঠিক দিকে যাচ্ছি ত?

—আসুন না, এদিকের খুঁটিনাটি আমার চেনা।

মিসেস রায় বললেন—এসব দিকে ওর একেবারে বেড়ালের মতো চোখ আর কুকুরের মতো নাক।

মিসেস-এর উপমা শুনে ছোট্ট হাসলেন মিস্টার রায়। রাজু সিগ্রেটে টান দিয়ে মামুকে বলল—আপাতত আমরা তাহলে বগি, এঞ্জিন মিস্টার রায়। কি বলেন মামু?

সবাই হেসে উঠলাম একসঙ্গে। একটু দূরেই হাতীবাড়ি বাংলোর সাদা দেয়াল দেখতে পেলাম।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

মিস্টার রায় বিকেলবেলা নিজেই একবার বলেছিলেন ওঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভদ্রলোক এখনও যথেষ্ট স্মার্ট। এবং সপ্রতিভ। কথাবার্তায় বুদ্ধির ছাপ। গায়ের রং কালোই বলা চলে। চেহারায় তা সত্ত্বেও বেশ চটক আছে। চুলগুলো অধিকাংশ এখনও লম্বা এবং

প্রায়শই অবিন্যস্ত। মাঝে-মাঝেই হাত দিয়ে পিছনে টেনে তুলে দেন। ডোরাকাটা শার্টের ওপর ট্যুইডের কোট। পকেটগুলো এটা-সেটায় ভর্তি। পায়ে চটি পরেন সবসময়। যেখানেই বেরোন হাতে টর্চ নিতে ভোলেন না। এখন নেহাত সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সেইজন্য ক্যামেরাটা সঙ্গে আনেননি। নয়ত সবসময় ক্যামেরা ঝোলান থাকে কাঁধে।

ভদ্রলোক কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নাইরোবির ন্যাশনাল পার্কে জলজ্যান্ত তিনটে গণ্ডারের সামনাসামনি তোলা ছবি বিকেলবেলা আমাদের দেখিয়েছিলেন। রঙীন ফটোগ্রাফ। আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম ছবিটা দেখে। সেই মুহূর্তে ফটোগ্রাফি ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যিই একটা দারুণ শিল্প বলে মনে হয়েছিল। মিস্টার রায় বলেছিলেন—বন্য জন্তুদের সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যেরকম ধারণা, প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের ব্যবহার এবং চরিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ তার বিপরীত। অত্যন্ত নিরীহ উদাসীন এবং গম্ভীর। রাজুর দিকে তাকিয়ে পরে বললেন—আপনি বিশ্বাস করবেন না ডক্টর বিশ্বাস, আমাদের সামনে তিনখানা গণ্ডার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। আমি আর আমার একটি অস্ট্রিশ বন্ধু জাপানী গাড়ির মধ্যে বসে আছি। সন্ধ্যে নামব নামব করছে তখনও গাড়ির হেডলাইট জ্বালাইনি। গণ্ডারগুলো কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকক্ষণ দেখে আমি ফুল নার্ভ নিয়ে মন শক্ত করে গাড়ির দরজা খুললাম। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে নামলাম। অটোমেটিক ক্যামরা আমার। লেন্স-এ পড়লেই ছবি উঠবে। একটু দাঁড়ালাম দরজা খুলে রেখে। এক পা দু পা করে এগিয়ে গেলাম গাড়ির বনেটের কাছে। ওরা চুপচাপ। তাকাচ্ছেই না আমার দিকে। মাঝে মাঝে চোয়াল নাড়াচ্ছে, কি যেন চিবোচ্ছে। ছবি তুলে নিলাম পর পর পাঁচখানা। ওদের কোন কেয়ার নেই। আমার প্রাথমিক ভয়টা কেটে যাওয়ার পরেই, ডক্টর বিশ্বাস, হঠাৎ নিজেকে তিনটে বন্যজন্তুর ব্যক্তিত্বের সামনে এতো তুচ্ছ, ক্ষুদ্র মনে হল যে আপনাকে

বোঝাতে পারব না। আর একটু দাঁড়ালাম। পুরো মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকালও না। আমি, আমাদের গাড়ি, সবকিছুর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনটে গণ্ডার রাস্তার পাশে জঙ্গলে ঢুকে গেল। কোন ব্যস্ততা নেই, তাড়াহুড়ো নেই।

আমরা স্তব্ধ হয়ে মিস্টার রায়ের অভিজ্ঞতার গল্প শুনছিলাম। একটা ছোট শ্বাস ফেলে মামু বলেছিল—আসলে মিস্টার রায়, এখানেও সেই একই কথা—যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সাথে প্রেম চলে না। বন্য পশুদের আমরা ধরে খাঁচায় পুরতে যাই, খোঁচা-খুঁচি দিয়ে তাদের জান্তব প্রকৃতিকে উস্‌কে দিই। মজা করি। ন্যাচারালি ওরাও আমাদের খুব খারাপ চোখে ত্মাখে। কিন্তু ওখানে আপনি কোনো কুমতলব নিয়ে যাননি ওদের সামনে, বিরক্ত করেন নি। ওরাও আপনার উপস্থিতিকে কোনো পাত্তা দেয়নি। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কিংবা তোমরাও দাঁড়িয়ে থাকো—এইরকম একটা ভাব।

মামু কথার শেষদিকটায় এমন একটা উদাসীনতার ঢুলঢুল চোখ করেছিল যে আমরা সবাই হেসে ফেললাম। আর তখনই মিসেস রায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, হাতে পাউডারের পাফ এবং ছোট্ট আয়নাশুদ্ধ। মিস্টার রায়কে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—আচ্ছা, তুমি ত বলিহারী লোক। ভাল শ্রোতা পেয়ে খুব নিজের গুণকীর্তন শুনিয়ে দিচ্ছ। ওঁরাও কিছু বলতে পারছেন না, নতুন আলাপ বলে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর কখন বেরুব?

—এই ত চলো, চলো। ধীরে সুস্থে উঠলেন মিস্টার রায়। আমরাও উঠে পড়েছিলাম ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পালটে নেওয়ার জন্য। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট লাইটার তুলে নিলাম। মিসেস রায় আবার বললেন—দুটো দিন একসঙ্গে থাকুন না। ওর এসব গল্প শুনতে শুনতে ফেড-আপ হয়ে যাবেন। এই আমার যা অবস্থা হয়েছে বিয়ের তিনবছরের মধ্যেই।

কথাগুলো সব মনে পড়ে যাচ্ছিল।

মিসেস রায় চাঁপাফুল রঙের সিল্ক শাড়ি পরেছিলেন। কপালে চন্দনের কৌটার মতো ছোট্ট টিপ। চোখের ওপর পাতায় কাজলের রেখা একটু গভীর। অল্প টেনে তুলে দিয়েছিলেন বাইরের দিকে। ঠোঁটে গোলাপী রং। মুখের প্রসাধন চোখে পড়ে না। বেশ দোহারা গড়ন ভদ্রমহিলার, না রোগা না মোটা। গায়ের রং উজ্জ্বল, সুন্দর মিলে গেছে শাড়ির সঙ্গে। হাসলে ভদ্রমহিলার ঠোঁটের পাশ কিঞ্চিৎ বেশী দীর্ঘ মনে হয়। হাসতেও পারেন অপর্যাপ্ত। হয়তো সেটা বয়সেরই স্বাভাবিকতা। কেননা ভদ্রমহিলার বয়স মেরে-কেটেও তিরিশের বেশী হবে না। বললেন বিয়েও হয়েছে মোটে তিনবছর। ওঁর পক্ষে সেটাই এখনকার মোটামুটি বিয়ের বয়স।

কিন্তু মিস্টার রায়ের! পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছে এই বয়সের স্ত্রী, সুন্দরী বলা চলে নিঃসন্দেহে। স্বভাবেও খানিকটা বিপরীত নিশ্চয়ই মনে হয়েছে কখনও। মিস্টার বেশ কথা বলেন, থেকে থেকে চুপ করে যান। দৃষ্টির মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ছাড়াও কখনও উদাস, কখনও সিরিয়াস। অল্প অল্প হাসেন। আবার কখনও এমন সরব উচ্চকিত হেসেছেন মামুর কথা শুনে যে হঠাৎই কোথায় যেন এক টুকরো অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। চকিতে ব্রাজু কিংবা মামুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেছে। আবার ঠাট্টা ইয়ার্কিও যে না করছেন তা না। বেশ গায়ে গায়ে লেগে রয়েছেন মাঝে মাঝে।

মিসেস রায়ের মুখ থেকে কথা ফুরোয় না। কথা না বলে উনি থাকতে পারেন না। সেটাই কি ওঁর স্বাভাবিকতা নাকি অস্বাভাবিকতাকে আড়াল করার জন্যই। মনে হয় চলতি বাংলা ভাষার বহমান ঝরনা ভদ্রমহিলার মুখে। ওঁদের বাড়ির কথা, নিজের প্রাক্-বিবাহ কলেজ জীবনের কথা, বিয়ের পরে হাঙ্গেরি, জামাইকা, দারেসালাম কিংবা বাগদাদ বেড়ানোর কথা, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভদ্রমহিলা আমাদের জানিয়ে ফেলতে পেরেছেন। সেইসঙ্গেই লক্ষণীয়, আমাদেরও প্রত্যেকের জীবিকা, বাড়িতে কে কে আছেন, কোথায় থাকি, মামু কেন এখনও বিয়ে করেনি তাও জেনে নিয়েছেন। আমার একটু-আধটু

লেখালিখির মোষ তাড়ানর আকুতি আছে জেনে, ভদ্রমহিলা চোখ ঘুরিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছেন—দেখবেন, যেন আমার মধ্যে আবার কিছু আবিষ্কার করে বসবেন না। আপনাদের নিয়ে ভয় কম না। আমার যা হড়বড় করে কথা বলার অভ্যাস, হয়তো 'একটি বাচাল মেয়ে' নাম-টাম দিয়ে যা তা কিছু একটা লিখেই ফেললেন।

এসব কথায় আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করি। তবু আমার ভেতর থেকে কৌতূহলের কোন্ এক ফিচলেমি ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করে ফেললো—তাতেই বা আপনার ক্ষতি কি?

—তার মানে? এতো মহা বিপদ। আপনি সত্যি সত্যিই লিখবেন নাকি?

মিসেস রায় চোখ পাকিয়ে তাকান আমার দিকে। পরমুহূর্তেই হাসতে হাসতে মুখ ফিরিয়ে নেন। বলেন—যাকগে। আমার আর ভয় কি মশাই। মিস্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে চোখমুখ নেড়ে বলেন—ওরই চিন্তা। আমি এখন স্বনামধন্য কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার কাম শিল্পী শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যব্রত রায় মহাশয়ের পত্নী। সেই পত্নী যদি বাচাল হয়, তাহলে ওরই প্রেস্টিজে…

মিস্টার রায় হাসিমুখে মামুর দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখছেন মামু, আজকাল মেয়েরা কথায় কথায় স্বামীর নাম ধরে। অথচ আগে…

—কি আর করা যাবে বলুন। মামু বলল—ওঁরা যে এখনও হাতে খাঁড়া নিয়ে লকলকে জিভ বার করে আমাদের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না, আমার ত মনে হয় তাই যথেষ্ট। নয়তো ভাল মন্দ ছিঁচকে গম্ভীর…সমস্ত পুরুষজাতির ওপর ওঁদের যে কি অসীম ক্ষমতা, তা যদি এতদিনে পুরোপুরি উপলব্ধি করে ফেলতেন—

আমরা হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। তারমধ্যেই মিসেস রায় বললেন—ওরে বাব্বা। মামুকে আমার একটা চকোলেট খাওয়াতেই হবে। যা দিলেন না মামু…পারা যায় না।

হাতীবাড়ি বাংলোর সামনে বিরাট সাজান বাগান। রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে, সুবর্ণরেখার পাড়ে। মিস্টার ও মিসেস

রায় নামছিলেন, সঙ্গে রাজু। একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে মামুকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আমিও দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ থেকে নিজেদের মধ্যে দু একটা কথা বলব বলব করছিলাম। এবার সুযোগ পেয়ে বলেই ফেললাম—কিরকম বুঝছেন মামু? ব্যাপারটা কি বলুন ত। কিছু লক্ষ্য-টক্ষ্য করছেন?

মামু সোজাসুজি উত্তরটা দিল না। বলল—জানি ভাগনা, তোমার মাথায় ওইসব ব্যাপার ঘুরছে।

—দেখুন মামু, আমি বললাম—ভদ্রলোকরা থাকেন বম্বেতে, এদিকে বললেন গাড়ি ছিল টাটায়। এখানে এসেছেন টাটা থেকে গাড়ি নিয়ে। গাড়ির নম্বরটা কলকাতার। বম্বে থেকে বেরিয়েছেন প্রায় মাসখানেক আগে। বললেন, ঘুরছেন। এখান থেকে ঠিক কোথায় যাবেন তারও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তারপর দেখুন, দুজনের বয়সের পার্থক্য…ছবি-টবি যা দেখালেন…আমি ভাবছি, পয়সাওয়ালা লোকেরা এসব দিকে—

—মামু হল? রাজু চেঁচিয়ে ডাকল নীচের দিক থেকে।

—আসছি ভাগনা। গলা উঁচু করে মামু উত্তর দিল। আমার কথাটার খেই হারিয়ে গেল। বললাম, মামু, অন্ধকার হয়ে এসেছে, একেবারে জলের কাছে যাওয়াটা এখন কি আর ঠিক হবে?

—মিথ্যে বলোনি। ওদের ডেকে নিই ওপরে। কাল ভোরে ত আবার চাণ্ডিল যাওয়ার কথা। বরং বাংলোয় ফিরে খুচরো নিয়ে বসি।

ওদের আমরা আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু জায়গাটা খুব ফাঁকা আর সামনে নদী বলেই হয়তো ওদের স্বাভাবিক কথাবার্তা, হাসির টুকরো ওপর থেকেই আমাদের কানে আসছিল। গাছ থেকে নানা পাখির কিচিমিচি ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। হাওয়া দিচ্ছিল অল্প। শুক্লপক্ষ চলছিল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। হাইওয়ে দেখা যায় না এখান থেকে। ভারি ট্রাক চলে যাওয়ার শব্দ অথবা কচিৎ কখনও এক-আধটা গাড়ির হর্ন

শুনতে পাচ্ছিলাম। এসময় সব্জী ভর্তি বেঁটে গোরুর গাড়িগুলো সার বেঁধে দূর দুরান্তর গ্রামে ফেরে।

মামু মুখের কাছে হাত রেখে ওদের ডাকল—ভাগনা, আর নীচে নেব না। ওঁদের নিয়ে চলে এসো। আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

—তাই থাকুন, আমরা আসছি। মিসেস রায় উত্তর দিলেন। পরমুহূর্তেই মিস্টার রায়ের টর্চের আলো এদিক ওদিক গাছপালায় ঝিলিক দিয়ে উঠল।

মামু আমার সামনে এসে বলল—বাংলোয় ফিরে খারাপ লাগবে না। রাজু নীলকান্তকে ফিট করেছে। মহুয়া নিয়ে আসবে। দুটো খালি বড় বোতল আর পাঁচ টাকার নোট দিয়ে এসেছে।

আমি এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়েছি। রাজু এবং মামুর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে বটে, কিন্তু ওরা এই দুদিনের আলাপ পরিচয়ের ব্যাপারটাকে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চায় না। রাজু বলেই দিল—চেপে যা না। অনেক কিছুই হতে পারে। ও নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে ?

ওরা একটু আগেই বেরিয়ে গেল। এয়ার বোর্ন মিনারাল সার্ভের ক্যাম্প আর ইউক্যালিপ্টাস বাগানে বেড়াতে গেছে। আমি আগে গেছি ওখানে। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। শুক্লপক্ষের রাত্রে ইউক্যালিপ্টাস বাগানে আত্মহত্যা করার মতো পরিবেশ তৈরী হয়।

ওবেলা চাণ্ডিল থেকে ফিরতে বারোটা বেজে গিয়েছিল। পথে ধলভূমগড় স্টেশনের কাছেই খোঁজ নিয়ে আমাদের এক বন্ধুকে পেয়েছিলাম। সোমদেব। বছর চারেক প্র্যাকটিশ করছে। ধরে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু আমাদের কোনো উপায় ছিল না। আজ বাদে কাল কলকাতা ফিরে যাব। মিস্টার এবং মিসেস রায়ের অসুবিধা ছিল না হয়তো, কেননা ওঁরা আরও কয়েকদিন এখানে থেকে যাবেন।

আমি কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই বেরোইনি। কাল হাতীবাড়ি বাংলো থেকে ফেরার পথে একটা ছোট গর্তে পা পড়েছিল। গোড়ালিটা

মচকেছিল একটু। কিন্তু এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেনি। বরং অজুহাত হিসাবে ভাল কাজে লেগেছে।

আমার না যাওয়ার কথায় ওরা একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেও ছাড়েনি। প্রথমবারে মিসেস রায় ত বলেই বসলেন—কি ব্যাপার বলুন ত? গল্প উপন্যাসে যেরকম পড়ি যে এসব জায়গায় এলে পরিবেশের গুণে মন ছুঁক ছুঁক করে, আপনারও সেরকম কোন উদ্দেশ্য নাকি? কোনো সাঁওতালী মেয়ে কিংবা দেহাতী বলা যায় না বাবা কিছুই।

নিজের ঠাট্টায় নিজেই হেসে ঘরে সাজগোজ করতে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু বেরুবার সময় সত্যিই আমি যাচ্ছি না দেখে মিসেস রায় বেঁকে বসলেন।

—তাহলে আমরাও যাব না। একজন পায়ের ব্যথা নিয়ে ঘরে পড়ে রইল, আমরা চললাম বেড়াতে—এটা আমার খুব বাজে লাগছে। কি বলেন মামু?

মামু বললো—আমি আর কি বলব বলুন। আমার সাদা মনে কাদা নেই। ভাগনা বললো, আপনারা ঘুরে আসুন, আমি ওখানে আগেও গেছি। পায়েও ব্যথা রয়েছে, তাছাড়া একটু ডায়রি লিখব। আমি এর বেশী আর কিচ্ছু ভাবিনি। এখন আপনারা যদি বলেন, তাহলে আমি নতুন করে আবার কিছু ভাবতে পারি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম—কিছুই না। একটু রেস্ট পেলে পা-টা ঠিক হয়ে যাবে। সকালে ঘোরাঘুরি করলাম বলেই একটু বেড়েছে এবেলা। তাছাড়া এটুকু সময় একলা থাকতে আমার খারাপ লাগবে না।

রাজু সঙ্গে যোগ করে দিল—মহুয়াও রয়েছে এক বোতল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় মিসেস রায় বললেন—হুঁ হুঁ বাবা, দুষ্টের ছলের অভাব হয় না।

—আপনি শেষ পর্যন্ত আমায় এই কমপ্লিমেণ্ট দিলেন?—হেসেই তাকালাম।

—আহ্‌-হা, রাগ করলেন নাকি? মিসেস রায় নিচু হয়ে বললেন—দুষ্টু ছেলেই ত ভাল। দুবার চোখের পাতা নাচিয়ে বললেন—আসার সময় লজেন্স নিয়ে আসব'খন।

দুটো তুড়ি দিয়ে টা টা বলে বেরিয়ে গেলেন। মামু একটু পিছনে ছিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিঃশব্দে একটা চোখ ছোট করে আমার দিকে তাকাল। প্রায় ফিসফিস করে বললো—পারি নাঃ, ভাগনা। যা কচি ঢপটুকু দিয়েছ…

আমি ভাবলাম মিসেস রায় কি বলতে চাইলেন! 'দুষ্টু' বিশেষণটায় একটু যেন ভাল লাগার প্রশ্রয় আর 'লজেন্স আনব' ব্যাপারটায় 'এখনো অনেক শিশু, আরও বড় হও খোকন' এই ধরনের যেন একটা খোঁচা আছে, ভদ্রমহিলা কোন্‌টা মীন করলেন। স্মার্টনেস? রসিকতা! ঢলানি! ভাবা দরকার।

আঁধার নামতে দেরী আছে একটু। নীলকান্তর গাছে জল দেওয়া শেষ। একটু আগেই কেওনঝাড়ের বাস কলকাতার দিকে চলে গেল। সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা হবে। এই সময়টা অগুণতি চড়ুই পাখি বাগানে একসঙ্গে হুটোপুটি করতে করতে পোকামাকড় খায়। গাছের পাশে যেখানেই একটু জল জমে, সেখানেই ছোট ছোট ডানা ঝাপটিয়ে গায়ে জল লাগায়। সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরোয় মাটি থেকে। আর একটু বাদেই ঝাউগাছের মাথায় কাঁচা কুমড়ো ফালির মতো চাঁদ দেখা দেবে। সেই সময় ওরা ইউক্যালিপ্টাস বাগানে…নাহ্‌, বোধহয় গেলেই পারতাম।

আজ দুপুরে সবাই অল্পবিস্তর ঘুমিয়েছে। মিস্টার রায় ছাড়া। আমি বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠেছিলাম। দেখি উনি বাংলোর পেছন দিকে নিমগাছ তলায় বসে ম্যাপ দেখছেন। সকালে চাণ্ডিল যাওয়ার সময় ওঁদের গাড়িতেই আমি ম্যাপটা দেখেছিলাম। পূর্ব ভারতের সব রাস্তার মানচিত্র। থাকতেই পারে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, ম্যাপ সঙ্গে না থাকলে চলবে কি করে? ড্রাইভারটিকে রাঁচী পাঠিয়েছেন। গাড়ির কিছু পার্টস আনতে হবে বললেন। ভগবান

জানে! ভদ্রলোকের গাড়িটিকে একটি চলমান রান্নাঘর বললে খুব অত্যুক্তি হয় না। চাল ডাল নুন তেল মশলাপাতি থেকে শুরু করে হেন জিনিস নেই যা ভদ্রলোকের গাড়িতে নেই। সেই সঙ্গে প্রচুর বিদেশী ম্যাগাজিন, হ্যাজাক লাইট, ত্রিপল, স্টিলের খুঁটি···নানা কিছু। ভাল কথা, ভদ্রলোক খুব রসুন খান। অসুখ-বিসুখ থেকে নাকি দূরে থাকা যায় এবং যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। পরখ করে দেখলে হয়। সবচেয়ে যেটা আমি চিন্তা করেছি মিস্টার রায় এখনও কোনো ছবি তোলেননি। অথচ ছবি তুলে, স্লাইড বানিয়ে কপিরাইট বিক্রি করাই ওঁর পেশা এবং উনি যে যথেষ্ট টাকা পয়সা রোজগার করেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। একবার জিগ্যেস করে ফেলেছিলাম,—মিস্টার রায়, আপনি ছবি-টবি তুলছেন না?

—নাহ্, এবারের ট্যুরটা মেইনলি সার্ভে করার জন্য। মিস্টার রায় অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—স্পট দেখে যাচ্ছি, পরের বার ছবি তুলব। আপনারা নারকেল খেতে ভালবাসেন?

প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলেন রায়মশাই। কথা আর এগোয়নি। মিসেস রায়ের সঙ্গেও কথা হচ্ছিল নানা বিষয়ে, কাল হাতীবাড়ি থেকে ফেরার পথে। কলকাতার মেয়ে। মাণিকতলায় বাড়ি। সিটি কলেজ থেকে পাশ করেছেন বি-এ। এম-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর থেকেই বম্বে। ভদ্রমহিলার দু-একটা কথায় এড়িয়ে যাওয়ার ভাব লক্ষ্য করেছি। কখনও যেন উদাসীন। কথায় কথায় একবার বললেন—এই তো দেখছেন আমাদের জীবন।

আমি বললাম—কেন, খারাপ কি? দিব্যি আছেন, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—মেয়ে হলে বুঝতেন। একটু থামলেন। বললেন—কোনো মেয়ের জীবনই এইভাবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। কথাটায় আমি বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম। হয়ত না জেনে ওঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন দুর্বল জায়গা ছুঁয়ে ফেলেছি। হয়তো কোন ব্যথা আছে। ওঁদের এখনও বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। এতদিনে হয়ে যাওয়া

উচিত ছিল। কোনো শারীরিক গোলমাল···হঠাৎই অন্য একটা সম্ভাবনার প্রশ্ন বিদ্যুতের মতো খেলে গিয়েছিল আমার মাথায়।

ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা স্বামী-স্ত্রী-ই তো! প্রথম যখন ভদ্রমহিলাকে দেখি, ওঁর সিঁথিতে, কপালে সিঁদুর ছিল না। হাতে শাঁখা কিংবা লোহা···না, ওগুলো আজকাল কোন ব্যাপার না।

আচ্ছা ওঁরা কি এমন কিছু কাজে লিপ্ত আছেন যাতে এইভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান কিংবা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপার আছে! এবং সেইসব যোগাযোগের ওপরেই ওঁদের পরবর্তী কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হয়। এসব কাজে আবার একজন মহিলার প্রয়োজনীয়তা···· ভদ্রমহিলার বাড়ি কলকাতায় অথচ কলকাতায় গিয়ে ওনারা কোথায় থাকবেন, তার কিছু ঠিক নেই। মনে পড়ছে, ভদ্রমহিলা কয়েকবার অন্যমনস্ক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি? আমি অবশ্য বেশ কয়েকবার সামনে পিছনে পাশ থেকে ভদ্রমহিলাকে দেখেছি। সেটা স্বাভাবিক। রাজু কিংবা মামু আমাকে দু-একবার কনুই দিয়ে গোঁতা মেরেছে। হাতীবাড়ি থেকে ফেরাব পথে যখন আমার পা মচকেছিল, মিসেস রায় আমাব হাত ধরেছিলেন। আমি কি তখন একটু চাপ···নিশ্চয়ই না। আমার ডান পায়েব গোড়ালিতে তখন ব্যথা কবছিল। একটু আস্তে হাঁটছিলাম। মিসেস রায় আমার সঙ্গে আসছিলেন। ওরা একটু এগিয়ে। মামু তখন মানুষেব মুখশ্রী অভাবের তাড়নায় ক্রমশ কিভাবে খারাপ হয়ে যায়, সেই বর্ণনা দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে হেসে উঠছিল জোরে। মিস্টাব রায় হাসির মধ্যে একবার পিছন ফিরে বলে উঠলেন—এই, আপনারা দারুণ মিস্ করছেন।

মিসেস রায় বললেন—ছাখো না, মাঝখান থেকে আমি ঝুলে গেলাম। এদিকে বেচারির পায়ে লেগেছে, ছাড়তে পারছি না। ওদিকে মামুকেও মিস্ করছি। একটু আস্তে চলো না।

—আপনি এগিয়ে যান না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললাম।—আমার কোনো অসুবিধে হবে না। এমন কিছু লাগেও নি।

—থাক, হয়েছে। মিসেস রায় বললেন—এতটা যখন সঙ্গে সঙ্গে

এলাম, বাকীটুকুর জন্য কেন আর শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদটুকু হারাই? আস্তে আস্তেই চলুন।

রাস্তাটা মোটেও দীর্ঘ না। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই ওনারা এভাবে সময় নষ্ট করবেন কেন? আমরা এসেছি তিনটে দিন পুরোপুরি বেড়াতে, উপভোগ করতে। ওঁরা এসেছেন কাজে। কাজটা কি করছেন বুঝতে পারছি না। মিস্টার রায় অবশ্য কৈফিয়তের মতো একবার বলেছিলেন —বেড়াতে বেড়াতে চোখের দেখাটাই আমার আসল কাজ।

হয়তো সেটাই ঠিক। ওঁর চোখ যা যা দেখছে, আমরা দেখছি না।

কিন্তু আমিই বা এসব ভাবছি কেন! আমাকে এতো সব ভাবতে হচ্ছে কেন?

এখন বাংলোয় আর কেউ জেগে নেই। আমি ছাড়া। নীলকান্তর পোষা নেড়ি কুকুর দুটো শেষ চেঁচিয়েছে তাও প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। নীলকান্ত নিজে ত বোধহয় সবার আগেই ঘুমিয়েছে। কুকুর দুটো আমাদের বেশী চিনে ফেলেছে। আশা করা যায় চেঁচামেচি করবে না। বারান্দার ছোট আলোটা মিস্টার রায় রোজ শোওয়ার আগে নিবিয়ে দেন। আজও দিয়েছেন। হয়তো জানালার ফাঁক দিয়ে চোখে আলো পড়ে।

মামুর নাক ডাকছে। এক গ্লাস খেয়েই কাত। রাতে আজ স্পেশাল মেনু ছিল। পরামর্শটা মিসেস রায়-এর। খিচুড়ি, ডিম ভাজা আর নারকেল ভাজা। ভালই রেঁধেছিল নীলকান্তর বউ। রাজু মহুয়ার পরেও আধখানা ট্যাবলেট চাপিয়েছে। জিগ্যেস করায় বললো—মণিকা। (নিশ্চয়ই ম্যানড্রেক্সকে আদর করে বললো। কোথায় পেল কে জানে, ইদানীং আর বিশেষ দেখি না।) আমি মহুয়া খেয়েছি প্রায় দু গ্লাস। কিন্তু আমার যে আজ কোনো কাজ হবে না, আগে থাকতেই মনে হচ্ছিল।

ইউক্যালিপ্টাসের বাগান থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই মিস্টার রায়কে আমার অস্থির মনে হচ্ছিল। উনি নিজে অবশ্য বুঝতে

দেননি। মহুয়াও খেলেন না। বললেন—কাল মাথা ধরেছিল। তাস খেলার সময় সারাক্ষণ ছিলেন। নিজে খেলতে জানেন না, তবু। মিসেস খেলেছেন এবং যথারীতি আড়াই টাকার মতো হেরেছেন। আজ আমিও প্রায় টাকা চারেক হেরেছি। অধিকাংশটাই নিজের দোষে। উলটো-পালটা তাস টেনেছি এবং ফেলেছি। মামু আর রাজু দু-জনেই আমার বোকার মতো খেলা দেখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকিয়েছে।

আমার মধ্যে এক অদৃশ্য মাকড়সা আজ জাল বুনে চলেছে দ্রুতগতিতে। আমার ভাবনা-চিন্তার অনেকগুলো ছোট বড় হাত পা গজিয়েছে। কেবলই এদিক ওদিক প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত হচ্ছে। মিস্টার এবং মিসেস রায়ের সব কিছুর মধ্যেই আমি অস্বাভাবিকতার অস্তিত্ব অনুভব করছি। বেশ বুঝতে পারছি এক অদম্য কৌতূহল, অপ্রতিরোধ্য অজানা আসক্তি অনিবার্যভাবে আমাকে বাইরে টানছে।

ওরা কে, ওদের কি সম্পর্ক, ওরা এখন কি করছে!

বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম। পা টিপে টিপে। গভীর ঘুমে রাজু আর মামু আচ্ছন্ন। দরজার ছিটকিনি খুলি। সামান্য শব্দে খুলে যায়। এক ঝলক ভ্রু কোঁচকান ঠাণ্ডা আমার কপাল থেকে পা পর্যন্ত নিঃশব্দে জরিপ করে নিল। পরোয়া করি না। নিঃসাড়ে বারান্দায় বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিলাম।

অন্ধকার বাংলো নিঃশব্দ। লম্বা ঝাউগাছ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। স্তব্ধতার প্রতীক। মরসুমী ফুলের গাছগুলোও আর জেগে নেই। কানে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ। শুক্লপক্ষের চাঁদ অনেক আগেই ফিরে গেছে। হাইওয়ের ওপর টুপিয়ে পড়া অন্ধকারের মাঝে দু-একটা সাদা আলো। কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

আমি এগিয়ে যাই পাশের ঘরের দিকে। আমাকে জানতে হবে। মিস্টার এবং মিসেস রায় ঘুমোচ্ছেন কিংবা···

আছেন ত! অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়ে থাকেন। হতেও পারে। কি হতে পারে?

গুপ্তচরবৃত্তি, স্মাগলিং···? নাকি অন্য কিছু। অনেক কিছুই সম্ভব। ওঁদের সব কিছুর মধ্যেই আমি অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছি। অনেক ছোটখাট গরমিল, কথার মারপ্যাঁচ এড়িয়ে যাওয়া। ওঁদের ব্যক্তিগত জীবন, বয়সের তফাত। দাম্পত্য জীবনের হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিকতা, যা নির্ঘাত অন্য কিছুকে আড়াল করার জন্যই। কি সেই অন্য কিছু।

জানালায় কান রাখি। শব্দ নেই। চোখ রাখি কাঁচে। অন্ধকার। এগিয়ে যাই বন্ধ দরজার কাছে। আবার কান পাতি। নাহ্, কোন শব্দ পাচ্ছি না, দেখা যায় না কিছুই।

বসে পড়ি ঝুপ করে মেঝেয়। আরও নীচু হই। দরজা আর মেঝের মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক। শুয়ে পড়ি মেঝের ওপর। চেষ্টা করি চোখ অথবা কান লাগানর। যদি কিছু অস্বাভাবিকতা বুঝে ফেলতে পারি।

অসম্ভব। হচ্ছে না কিছুই। কিছু বুঝতে পারছি না। এভাবে হয় না।

উঠে দাঁড়াই আবার। হাঁটু দিয়ে আস্তে চাপ দিই দুটো দরজার মাঝখানে। একটু ফাঁক। দৃষ্টির রেখা অন্ধকার ভেদ করে না তাড়াতাড়ি কান লাগিয়ে দিই। চেপে, আরও চেপে। আরও—

পেয়েছি। শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঠিক, কোনো ভুল নেই।

ওই শব্দ কিসের!

খুব শান্ত ধীর টানা টানা স্বাভাবিক শব্দ। ওঁরা শ্বাস নিচ্ছেন। সারাদিন ঘোরাঘুরির ক্লান্তি নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। বেশ জোরে নিটোল আওয়াজ আসে আমার কানে। একবার শ্বাস টানছেন, আবার ছাড়ছেন, আবার—

সময় কেটে যায়। চকিত বিদ্যুৎ ঝিলিক অবশ্য করে আমার মাথা। অজান্তে একবার কেঁপে ওঠে সারা শরীর। টলে গিয়ে সরে আসি দরজা থেকে।

রাত ঘুমোচ্ছে। ও ঘরে মাম্, রাজু। এ-ঘরে মিস্টার আর

মিসেস রায়। আমি ঘুমোই নি, ঘুমোতে পারিনি। জেগে আছি। এই নিশুতি রাতে অন্ধকারে আমি কেন জেগে থাকি !

বরফ গলা হিমপ্রবাহ নামে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই শ্লথ গতিতে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি ঘুমন্ত বাগানের প্রান্তে। শিয়াল ডাকে দূরে কোথাও। জঙ্গলের এ-পার ও-পারে এক বিরাট আকাশের ছাদ ঘিরে দাঁড়ায় আমাকে। অন্ধকার নিশ্ছিদ্র। বাতাস এখনও বহেনি। আমার অসংখ্য ছায়াদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকি আরও কিছুক্ষণ।

আমার লুকোনো অস্তিত্বের প্রতিটি পৃথক সত্তাতে কি চমৎকার দেখতে পাই ! আলো ফোটার আগেই আমি দেখে ফেলি নিজেকে। বুঝে ফেলি আমার ভূমিকা।